দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি

(প্রথম খণ্ড)



উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩

প্রথম উদ্বোধন সংস্করণ
শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ তিথি
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০/4 June 2003

প্রথম পুনর্মুদ্রণ
মাঘ ১৪১০

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০, দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বাসুদেবানন্দজী মহারাজ এক পরম ঋদ্ধিমান সন্ন্যাসী ছিলেন। আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদ ও চিন্তাধারায় তিনি কেবল অনন্যই যে ছিলেন তা নয়, তাঁর সেই উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী ও বাক্‌শক্তিবলে তাঁর ভক্তমণ্ডলী ও শিক্ষার্থিগণের মধ্যে অতি নিপুণভাবে তিনি সঞ্চারিত করে গেছেন। এ হেন সাধক সন্ন্যাসীর দিনলিপির মধ্যে ধরে রাখা তাঁর আন্তর বাণী যে অপূর্ব এক চিত্তাকর্ষক সম্পদ হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদামণি ও স্বামী বিবেকানন্দ ভাব পরিমণ্ডলে পরিগণিত হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অত্যন্ত আনন্দের কথা, পূজ্যপাদ মহারাজের কিছু শিক্ষার্থী-ভক্তবৃন্দ তাঁর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের গোটা বছরটির প্রতিটি দিনের রোজনামচা—স্বাধ্যায় ও উপাসনা এই দুই শিরোনামাঙ্কিত পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে (১৩৬১ বঙ্গাব্দের রাসপূর্ণিমা তিথিতে) গ্রন্থকারে প্রকাশ করে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাশ্রিত ভক্তমণ্ডলীর অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। তাঁরা গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন—'দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি' (প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশনার পর প্রকাশক ও অন্যান্য উৎসাহী ভক্তগণ যাঁরা এই প্রকাশনার উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, গ্রন্থখানির সর্বস্বত্ব রামকৃষ্ণ মঠের অনুকূলে সমর্পণ করেন।

দুর্ভাগ্যের কথা, এই অমূল্য গ্রন্থটি দীর্ঘকাল ব্যাপী বাজারে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায়, এর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী অনবহিত থেকে যান। আমরা তাঁদেরই সাধনপথের দিগ্‌দর্শনে সাহায্যকল্পে এই গ্রন্থটির মূল অবয়ব অক্ষুণ্ণ রেখে পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, সর্বস্তরের অধ্যাত্ম-সন্ধানী মনের আগ্রহ তৃপ্ত করে তাঁদের সাধনপথে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে এই গ্রন্থটি।

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

ওঁ নমঃ ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গোড়ার কথা

১৯৫২ সালে পূজ্যপাদ স্বামী বাসুদেবানন্দ মহারাজ স্বাধ্যায় হিসাবে প্রতিদিন সকালে যে সব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং যে সব স্তোত্র ও সঙ্গীত তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত হইত তাহার সারাংশ এবং জীবনবেদের যে সব বিচিত্র মহান অভিজ্ঞান ও উপাসনা তাঁহার মানসলোকে উদ্ভাসিত হইত তাহার কথঞ্চিত তিনি আমাদের জন্য দিনপঞ্জীতে গ্রথিত করিয়া রাখিতেন। এই গ্রন্থ সেইগুলিরই অনুবৃত্তি। তৎকালে ও তৎপরবর্তী কালে ইহা আমাদের ক্লাসে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং আমাদের অনেকেই ইহার সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুলিপি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রধানতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এবং স্বামিজীর উপদেশাবলী নিজের ভাষায় সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। প্রাত্যহিক জীবনের সাধনোপযোগী বহু প্রাচীন ও আধুনিক সঙ্গীত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তা'ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ, মাহাত্মা গান্ধী, রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি মনস্বীগণের বহু অভিজ্ঞানও তিনি এখানে স্বীয় ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

সেই জন্য আমরা কথামৃত, লীলা প্রসঙ্গ এবং স্বামিজীর বক্তৃতাবলীর সংগ্রাহকদের এবং অন্যান্য প্রাচীন ও নবীন মনস্বীগণের গ্রন্থ সংগ্রাহকদের যথাযোগ্য প্রণাম, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ব্যক্তি ও পরিবারের নৈতিক শান্তিপূর্ণ জীবন গঠনে এই গ্রন্থে প্রচুর উপকরণ পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থ-বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কিয়দংশ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তলীলাধাম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (কাশীপুর উদ্যানবাটী) প্রদত্ত হইবে এবং অবশিষ্টাংশ লেখকের পরবর্তী পুস্তক মুদ্রণে ব্যয়িত হইবে।

এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রন সত্ব উক্ত মঠের কর্তৃপক্ষদের এতদ্বারা সমর্পিত হইল।

প্রকাশক ও বিদ্যার্থীরা

সুচীপত্র

স্বাধ্যায়

উপাসনা

দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি

স্বাধ্যায়

॥ সংসার বাস ॥

আজ কথামৃত পড়া হলো। সংক্ষেপে ঠাকুর যা বলছেন, তা হচ্ছে 'সংসারে বাস করবে পিঁপড়ের মত; বালি ও চিনিতে মেশান থাকলে, পিঁপড়ে চিনিটা বেছে খায়।' আবার বলছেন, 'সংসারে বাস করবে রাজহংসের মত, দুধে জলে মেশান থাকলে রাজহাঁস জলটা বাদ দিয়ে দুধটা খায়।' সংসার ভালয় মন্দয় মেশান, তার ভালটাই কেবল বেছে নিতে হয়। আবার বলছেন, 'সংসারে বাস করবে পানকৌড়ির মত। পানকৌড়ি জলে থাকে, কিন্তু গা ঝাড়া দিলেই সব জল পড়ে যায়।' আবার বলছেন, 'সংসারে বাস করবে পাঁকাল মাছের মত। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু তার গায় পাঁক লাগে না।' ১।১।৫২

॥ নিত্য ও লীলা : : জ্ঞান ও ভক্তি ॥

কথামৃত পাঠ চলছে; কখন জ্ঞান, কখন ভক্তির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে; এখন কোনটাকে জোর করে ধরা যাবে? তাঁর কথার সার হলো, 'নিত্য ও লীলা একই সত্যের দুটো দিক্। এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দই লীলার জন্য ভক্তের ভাবানুযায়ী নামরূপ ধারণ করেন। তিনি কিন্তু স্বরূপে সুমেরুর মত অটল অচল, তিনিই আবার নিজ মায়ায় সচল প্রতীয়মান হন। শ্রীরামপ্রসাদের গানে আছে,—"কে জানেরে কালী কেমন? ষড় দর্শনে না পায় দরশন!"—নিত্যে জ্ঞানের উৎকর্ষ, কিন্তু লীলায় ভক্তির উৎকর্ষ। "সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে শ্যামা, এমনি মেয়ের মেয়ে। যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে।"—জ্ঞানিগুরু মহাদেব মায়ের পাদপদ্ম ধারণ করে আছেন। এ মূর্তি জ্ঞান ও ভক্তির মহা সমন্বয়। শিব নির্বিকার—মা ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু।' ২।১।৫২

॥ ধ্যান ও জপ ॥

আজ শ্রীশ্রীমায়ের কথা পড়া ও আলোচনা হলো। ভক্ত জিজ্ঞাসা করছেন, 'ধ্যান হয় না, কী করি?' মা বলছেন, 'ধ্যান না হয় জপ কর। কিছু না করলে কুণ্ডলিনী জাগেন না। অভ্যাস করতে করতে মনে ধ্যান জপ স্বাভাবিক হয়ে যায়। যে ধ্যান জপ স্বাভাবিক তাই হলো উত্তম, ভগবানে ঠিক্ ঠিক্ ভক্তি হলে, তবে ধ্যান জপ হয় স্বাভাবিক, নইলে জোর কোরে বেশী করতে নেই, তাতে খারাপ হয়। আগে নির্জনে দিন কতক বেশ কোরে ধ্যান জপ কোরে তারপর যেখানে খুসী থাক, তা হলে আর সাধনের কোন ক্ষতি হয় না। চারা গাছ বেড়া দিতে হয়। নির্জনে সাধন ভজন খুব দরকার।' ৩।১।৫২

॥ গৃহস্থ ও ব্রহ্মচর্য ॥

আজও শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করা হচ্ছে—বিষয়টি স্বামীকে অবজ্ঞা কোরে স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য পালন করা চলে কি না? মা বলেছিলেন, 'যদি ঈশ্বরের জন্য হয়, তা হলে নিশ্চয় করা উচিত। ওতে ভগবান, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই কল্যাণ করবেন। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ। বিধবাদের এত সংযমের ব্যবস্থা কেন? তাদের মন ঈশ্বরমুখী করবার জন্য। তিনি আমাতে ৺ষোড়শী পূজা করলেন কেন?—মনকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মমুখী করবার জন্য। এ সম্বন্ধে স্বামীর বা স্ত্রীর যদি আন্তরিকতা থাকে, তিনি অপরের মনের মোড়ও ফিরিয়ে দেন।' ৪।১।৫২

॥ গঙ্গামাহাত্ম্য ॥

আজ খুব ঠাণ্ডা জল-বাতাস, তবুও মঠের গঙ্গার ধারে বসে আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচিত হচ্ছে। তিনি ৺গঙ্গা বড় ভালবাসতেন, বলতেন, 'গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। গঙ্গার ধারে বাস করলে নাস্তিকও আস্তিক হয়ে যায়। যতদূর গঙ্গার হাওয়া যায়, ততদূর দেশ পবিত্র হয়ে যায়, লোকের মনে সহজে ভক্তি ভাব জেগে ওঠে।' সাংসারিক কথা বেশী হলে তিনি গঙ্গা-জল ছড়িয়ে দিতেন। অসৎ কথা বললে বলতেন, 'একটু জিবে গঙ্গাজলের ছিটে দাও।' তারপর দেখ এ স্থান কিরূপ—একদিকে গুরুবিগ্রহ, আর

একদিকে গঙ্গা। গঙ্গা-গর্ভস্থভূমি বিষ্ণু ভূমি, এখানে কারুর অধিকার নেই, গঙ্গাগর্ভ সংসারের বাইরে, বৈকুণ্ঠ সদৃশ বিষ্ণুভূমি—এ কথা শাস্ত্র বলছেন।

স্বামিজী যখন আমেরিকা গেলেন, সঙ্গে গঙ্গাজল। বলতেন, 'দু এক ফোঁটা পান করলেই ও দেশের সমস্ত রজোগুণ দূর হয়ে, "হর হর গঙ্গা মহাদেব" ধ্বনির সহিত হিমালয় চিত্তে ভেসে উঠতো।' ৫।১।৫২

॥ আত্মজ্ঞান ॥

স্বামিজীর বই পড়া হচ্ছে। বিচার চলছে—সকলে আত্মজ্ঞান লাভ করবে কি না? তাঁর সিদ্ধান্ত, 'একটা সরল রেখা অনন্ত কাল ধরে বাড়ালে একটা বৃত্তাকার হবে। আত্মস্বরূপ ভুলে গিয়ে পরমাত্মার অনুসন্ধান করতে গেলে ফিরে সেখানেই আসতে হবে। ঔপনিষদাত্মা আমি, আমিই আবার অজ্ঞান হেতু নিকৃষ্ট দেহাত্মা, আবার ঘুরে ফিরে আমিই সেই বিশ্ববিধাতা ভগবান। আমার আত্মা ও জগৎকে বুদ্ধি যখন নিজ সসীম দেশকাল সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে দেখে, তখনই আমি জন্ম মৃত্যুর অধীন জীব এবং এই জগৎ চিরনশ্বর দৃশ্য —সচ্চিদানন্দকে এরূপ অসম্পূর্ণ ভাবে জানা মানে মায়িক জগৎ।' ৬।১।৫২

॥ নৈতিকতার ভিত্তি ॥

স্বামিজীর কথা আলোচনা চলছে—নৈতিকতার ভিত্তিটা কী? তিনি নির্দেশ করছেন, 'চরিত্রবল মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে প্রবল করে। যা তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক, সেই সব অভ্যাসই হচ্ছে নৈতিকতা। আর যে সব অভ্যাস আত্ম-জ্ঞানের পরিপন্থী, ঐ সব কু-অভ্যাসই দুর্নীতি। যা স্বাস্থ্যহানিকর অভ্যাস তাও দুর্নীতি। যা মনকে কুৎসিৎ করে, সে সব অভ্যাসও দুর্নীতি। কারণ, সুস্থ দেহ ও মন ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা বা ভোগলিপ্সাও দুর্নীতি। কারণ অজিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মবিদ্যার পরিপন্থী। ভোগ ত্যাগ করাই সর্বনীতি সার। ভোগ স্বার্থ থেকে ওঠে। যে নিঃস্বার্থ ত্যাগী সেই জিতেন্দ্রিয় হতে পারে।' ৭।১।৫২

॥ তপস্যা ॥

আজ শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামীর কথা আলোচনা হচ্ছে—তপস্যা কাকে বলে? মহারাজ যা বলতেন, তার তাৎপর্য—কায়-মনোবাক্যে সত্য রক্ষা করা, কায়-

মনোবাক্যে কাম ক্রোধাদি দমন এবং কায়মনোবাক্যে ভোগবিলাস ত্যাগ। এই তিনটী রক্ষার জন্য যাবতীয় কষ্ট সহ্য করার নাম হলো তপস্যা। বার বৎসর যারা এই তিনটে ব্রত পালন করতে পারে, অন্ততঃ কিছুও যদি পালন করতে পারে, তাদের কিছু অনুভূতি হবেই, আর যদি সম্পূর্ণ ভাবে পারে, তবে সাক্ষাৎ ঈশ্বর দর্শন হয়।

'কিন্তু আর এক রকমের শারীরিক কৃচ্ছ্রতা আছে, যার পালনে অনেক বাসনার পূরণ হয়, কিন্তু ঈশ্বর দর্শন, আত্মস্বরূপ জ্ঞান হয় না। যেমন শীতকালে জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে জপ করা, দীর্ঘকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা, ঊর্ধ্ববাহু ইত্যাদি ইত্যাদি।' ৮।১।৫২

॥ তর্ক না বিশ্বাস ॥

স্বামিজীর কথার আলোচনা চলছে—তর্ক ভাল, না বিশ্বাস ভাল? স্বামিজী বলছেন, 'তর্কের দাঁড়াবার স্থান নেই, বিশ্বাসের ভিত্তি পাহাড়ের মত। এই পৃথিবীর ইতিহাস মাত্র কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী লোকের। বিশ্বাস ভেতরের দেবত্বকে জাগিয়ে তোলে। তুমি যা খুসী তাই করতে পার; তুমি সর্বশক্তিমান। যখন তুমি তোমার আত্মশক্তির কথা ভুলে যাও, তখনই তুমি জীবনে ব্যর্থ হও। আত্মার মহিমা যখন যে ব্যক্তি বা জাতি ভুলে যায় তখন আসে তার মৃত্যু। আমাদের ভেতর যে দেবত্ব রয়েছে, কোন সঙ্ঘই তাকে শৃঙ্খলিত করতে পারে না, অথবা কোন বদমাশই তাকে কলুষিত করতে পারে না। যেখানেই সভ্যতা, দেখবে সেখানে গুটি কতক বিশ্বাসী আত্মার উপদেশের ব্যবহার। অনুশোচনা কোরে কি হবে? যা হবার হয়ে গেছে। তুমি আগাও।' ৯।১।৫২

॥ শুচিবাই ॥

পুরুণো উদ্বোধনে শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ স্বামীর কথা আলোচনা হচ্ছে। শুচিবাই একটা ব্যায়রাম, এটা যায় কি করে? বাবুরাম মহারাজ বলতেন, "ঠাকুর শুচিবাইগ্রস্ত লোকদের বড় ঠাট্টা করতেন। বলতেন, শুচিবাইগ্রস্ত লোকদের কেবল শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করতে গিয়ে সর্বদা মনে একটা অশুচির ভাব থেকে যায়। তাই ঈশ্বর-চিন্তা তাদের মধ্যে ঢোকা বড় কঠিন। ঠিক বিষয়-চিন্তারই

মত। তিনি তাদের কপালে আঁস্তাকুড়ের মাটির ফোঁটা পরে ধ্যান করতে বলতেন। তাই বলে তোমরা মনে করো না যে আচার-বিহীন, শৌচ-বিহীন হলেই পরমহংস হওয়া যায়। ঠাকুর রামপ্রসাদের গান গাইতেন,—"শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। দুই সতীনে পীরিত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।" ১০।১।৫২

॥ ভূত ও দেবযোনি ॥

আজও বাবুরাম মহারাজের কথাবার্তা চলছে—ভূত ও দেবতা সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলতেন? বাবুরাম মহারাজকে ঠাকুর একবার বলেন যে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে যখন কুঠি বাড়ীতে থাকতেন, তখন একজন অনেক রাত্রে জুতো পায় দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতো, ওপরের দরজা জানলা খুলে দিত। মন্দির হওয়ার পূর্বে নাকি ঐ কুঠিঘরে একজন সাহেব মারা যায়। ঠাকুর আর একবার তাঁকে বলেন, 'একবার দেখি, মা ✓ভবতারিণীর চারি-পাশে অনেক দিব্য-শরীরী নৃত্য করতে করতে হাততালি দিচ্ছে, আর সকলে একসঙ্গে বলছে, "জয় মা কালী!" "জয় মা কালী!" তার মধ্যে আবার শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী পুরুষও দেখলুম, তাদের তখনও এখানে আসতে দেখি নি।' শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য কত দিব্য-ধামের জ্যোতির্ময় দেবতারা এই মর্ত্যধামে শরীর ধারণ করে এসেছিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজও এইরূপ অনেক দেখেছেন। ১১।১।৫২

॥ ভক্তি ও আসক্তি ॥

কথামৃত পাঠ হলো। বিষয়—ভক্তি কাকে বলে? শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশের তাৎপর্য—ঈশ্বরে অনুরাগই ভক্তি। জীবে অনুরাগ হলে তাকে আসক্তি বলে। ঈশ্বরে যে অনুরাগ হয়েছে, তার লক্ষণ—জপ ধ্যান পূজা পাঠ। ঈশ্বর তাকে দিয়ে এই সব করিয়ে নেন। কিন্তু ঈশ্বরে শাস্ত্র সঙ্গত সেবাও বৈধী ভক্তি। এই বৈধী ভক্তির দ্বারা চিত্ত নির্মল হয়, তখন জীবের ঈশ্বরের প্রতি রাগানুগা ভক্তি আসে, তখন ঈশ্বরের প্রতি স্বাভাবিক টান হয়—পরিষ্কার লোহা যেমন আপনি চুম্বকের দিকে যায়। বৈধী ভক্তিতে জীব ঈশ্বরকে ধরবার চেষ্টা করে, বলে, "আমার ভগবান লাভ করতে হবে, সেই জন্য সাধন ভজন করছি"।

আর রাগানুগা ভক্তিতে ঈশ্বর জীবকে টানেন, তখন জীব ঈশ্বরকে পাবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। ১২।১।৫২

॥ সাধুর লক্ষণ ॥

কথামৃত পাঠ চলছে,—সাধুর লক্ষণ কি ? ঠাকুর যা বলছেন, তার সংক্ষেপ, 'সাধু তিন রকমের—উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম সাধু কারুর কাছে কিছু ভিক্ষা করে না, শ্রীভগবান তাদের সব যোগান। চাতক মেঘের জল ছাড়া খায় না। মধ্যম সাধু গেরস্তর দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে, "নমো নারায়ণায়"। অধম সাধু ভিক্ষার জন্য ঝগড়া করে—প্রত্যাখ্যাত হলেও আবার চায়।' উত্তম সাধু মনে করে দেহ থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি ? মধ্যম সাধু মনে করে, দেহের জন্য অন্ন পান চাই, কারণ দেহ না থাকলে সাধন ভজন হবে কি করে ? অধম সাধু দেহের স্বাস্থ্য ও ধর্মকর্ম উপলক্ষ করে নিজের ভোগের জন্য ভিক্ষা করে। উত্তম সাধু জীব-সেবায় অর্থ-ব্যয় করে, মধ্যম সাধু তীর্থ ও পুস্তকে ব্যয় করে, অধম—টাকা জমায় ভবিষ্যতের জন্য। ১৩।১।৫২

॥ কর্মকাণ্ড ॥

স্বামিজীর কথা আজ আলোচনা হলো। কর্মকাণ্ড কী ? স্বামিজী বলছেন, 'বহিরাঙ্গ যাবতীয পূজা প্রার্থনাদি সব কর্মকাণ্ড। শুধু বিধি হিসাবে করলে এর দ্বারা কেবল কামনার পূরণ হয়, পরন্তু নিঃস্বার্থভাবে করলে এ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানলাভের সহায়ক হয়। নিষ্কামকর্মাকেই কর্মযোগী বলে। সে চায সকলে তার আগে উদ্ধার হোক। সে সকলকেই মুক্ত হতে সাহায্য করে।' ভক্ত সেবা, সাধু সেবা, দরিদ্র সেবা, পীড়িত সেবা সকল সেবার শ্রেষ্ঠ। একজন বোধিসত্ত্ব (জিমূতবাহন) প্রার্থনা করেছিলেন, "জগতের পাপ নিয়ে আমি নরকে যাই, কিন্তু সকলে উদ্ধার হোক।" এই হলো যথার্থ পূজা বা সেবা—এরই নাম যথার্থ আত্মত্যাগ। ১৪।১।৫২

॥ বর্তমান যুগে বেদান্ত ॥

স্বামিজীর জীবনী আলোচনা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, বেদান্তের ভাষা হবে কিরূপ ? স্বামিজী বলছেন, 'বেদান্তের শুষ্ক, জটিল ও অদ্ভুত দর্শন, প্রবাদ ও

মনস্তত্ত্ব সহজ সরল বাংলা, ইংরেজী প্রভৃতি চলতি ভাষায় রূপ দিতে হবে, যাতে শিশু থেকে পণ্ডিত পর্যন্ত সকলের অধিগম হয়। এর ভাষা হবে আধুনিক অর্থাৎ জীবন্ত; মৃত ভাষায় কথা বলে কী হবে? ভাষা হবে কবির, অর্থাৎ হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই। আর বেদান্ত-ধর্মের প্রয়োগগুলো যেন দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক হয়। বেদান্তের নীতির দিকটা বেশ পরিস্ফুট হবে; এবং যোগ বা ধ্যানের দিকটা বেশ একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাধারণের নিকট পরিবেশন করতে হবে, যাতে লোকের প্রতীকের জটিলতায় মাথা ঘুলিয়ে না যায় অথবা বোকার মত না বুঝে অভ্যাস আরম্ভ করে।—ভাষাটা যেন একটা শিশুও বুঝতে পারে।' ১৫।১।৫২

॥ বিধি-নিষেধ ॥

স্বামিজীর কথা আলোচনা হচ্ছে—স্বামিজী বলছেন, 'বিধি মানুষের শুভ প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে, যাতে আত্মার সসীমতার গণ্ডী ভেঙে ধীরে ধীরে অনন্ত প্রসার ঘটে। আর নিষেধ হলো অশুভ কর্মে নিবৃত্তি সৃষ্টি, যেন মানুষ ঐ সব আচরণ কোরে একেবারে প্রবৃত্তিব বা প্রকৃতির দাস হয়ে না পড়ে। বিধি ও নিষেধ উভয়েরই তাৎপর্য—আত্মার স্বাধীনতা; যে বিধি বা নিষেধ মানুষের অমর আত্মাকে শৃঙ্খলিত করে সে বিধি নিষেধ সর্বথা পরিত্যাজ্য—সে বিধি নিষেধ কর্তৃত্ব-ভোগীদের সুযোগ সুবিধার উপকরণ। তারা এই উপকরণ-ভঙ্গকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে, কারণ তাতে ভোগীদের স্বার্থে আঘাত লাগে।' ১৬।১।৫২

॥ প্রয়াণকালে ॥

শ্রীশ্রীমায়ের কথা আজ আলোচনা হলো। অন্ততঃ মৃত্যু কালেও তাঁর আশ্রিতদের দর্শন হবে কী? মা বলছেন, 'যারা ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, (যারা মার কৃপা প্রাপ্ত হয়েছে) মৃত্যু কালে ঠাকুর তাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন, আমাকে তিনি কথা দিয়ে গেছেন। এ তাঁর নিজের কথা। তাঁর কথায় বিশ্বাস রাখ, আমার সন্তান হয়ে এত ভয় কিসের। ঠাকুরের কথায় যারা অবিশ্বাস করে তারা তো পাগল। তাঁর কথায় অবিশ্বাস মানে তাঁকে অপমান

করা, তাঁর নামের যে কলঙ্ক হবে। যদি তাঁর নামে বিশ্বাস থাকে, আমার কথায় বিশ্বাস কর, যেমন ইচ্ছা চল, অন্তে তিনি এসে নিয়ে যাবেন। ঠাকুর মনুষ্য শরীর নিয়ে আসেন কৃপা করবার জন্য। রজঃ তমোগুণে মেশান রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে তাঁকে কি কোরে দেখবে। অতি বিশুদ্ধ যারা, যেমন নরেন প্রভৃতি, তারা দেখতে পায়।' ১৭।১।৫২

।। জীবাদৃষ্ট খণ্ডন ।।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা চলেছে—একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করছেন, 'যারা আপনার কাছে সন্ন্যাস নিচ্ছে, তাদের কি সকলেরই নির্বাণ হবে ?' মা বল্লেন, 'নিশ্চয়ই হবে। ধীরে ধীরে তাদের মায়ার বাঁধন কেটে যাবে, আখেরে তারা সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে যাবে। এই যে দেহটা দেখছ, এ বাসনা থেকে হয়। যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ বুঝতে হবে লেশমাত্র মায়ারও অবশেষ আছে। তবে যদি বল ঠাকুর কি করে দেহ ধারণ করলেন ? তিনি জীব দুঃখে কাতর হয়ে, জীবাদৃষ্ট নিজে নিয়ে শরীর ধারণ করলেন এবং তপস্যা কোরে জীবকে মুক্তি দিলেন। এ অসাধারণ কর্ম করা জীবের সাধ্য নয়, অবতার ভিন্ন সিদ্ধ পুরুষরাও জীবাদৃষ্ট এরূপ মুহূর্ত মধ্যে খণ্ডন করতে পারেন না। পারেন কেবল ঠাকুর যখন শরীর ধারণ কোরে আসেন।' ১৮।১।৫২

।। দিব্যস্বপ্ন ।।

শ্রীশ্রীমার কথার আলোচনা চলেছে—স্বপ্নে দর্শন সত্য কি না ? বলছেন, 'ঠাকুর দেবতার স্বপ্ন সত্য। তবে ও সব কথা যার তার কাছে বলতে নেই। কলিতে স্বপ্নে দর্শনও মহা সৌভাগ্য জেন। চাক্ষুষ জাগ্রদবস্থায় দর্শন কলিতে বড় একটা হয় না। কারণ কলির শরীর বড় রজঃ তমোযুক্ত। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব শরীর ছাড়া, বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ ঠাকুরের দর্শন হবে কি কোরে। আবার তত্ত্বজ্ঞানই তাঁর আসল রূপ। সাধন ভজন না করলে তাঁর অনুভূতি হয় না।'

শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে একবার বলেন, "দেব স্বপ্ন সত্য। ও সব কথা যাকে তাকে বলতে নেই। এতে দেবতা অসন্তুষ্ট হন। গুরুর নাম, ইষ্ট নাম, মায়ের নাম, স্বামীর নাম যখন-তখন যাকে-তাকে বলতে নেই।" ১৯।১।৫২

।। কর্মপদ্ধতি ।।

আজ কথামৃত পড়া হলো—সংসারে থেকে কি কোরে কাজ কর্ম করতে হয় ? শ্রীশ্রীঠাকুর যা বলছেন, তার সার কথা হলো, 'সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়, যাতে ভগবানের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, যাতে সংসারের ঝঞ্ঝাট কমে এবং শান্তিতে তাঁকে যাতে ডাকতে পার। তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করতে হয়, যেন যে সব কর্তব্য সামনে পড়বে সে সব অনাসক্ত ভাবে করতে পার। সর্বদা বিচার কোরে দেখতে হয় সাধন পথে এগিয়ে যাচ্ছ কি না ? ব্রহ্মচারী কাঠুরেকে বলেছিল, "এগিয়ে যেতে"। যত এগুবে ততই শ্রীভগবানের মহিমা সব বুঝতে পারবে। হৃদয় নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। ধৈর্য ধরে থাকতে হবে, সন্ধ্যা নাগাৎ পাতা পড়বেই।' ২০।১।৫২

।। আত্মবিশ্বাস ।।

কর্মযোগ পড়া হলো—বিষয়টা হলো, সর্বদা নিজেকে অপদার্থ হীন মনে করা উচিত কি না ? স্বামিজী বলছেন, 'জীবনে যদি কোনও একটা ভুলও হয়ে যায়, তার জন্য অনুশোচনা করা বা লোকের কাছে অনুতাপ করা উচিত নয়। জীবনের কোন কাজে ব্যর্থতা আসবে জেনেও কখনও নিজেকে কারুর নিকট ছোট কোর না। এতে মানুষের মন ছোট হয়ে পড়ে, হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শরীর অবসন্ন হয়। একটা সময় যে কাজ সমাজে ব্যর্থ বলে পরিচিত হলো, আবার সেই কাজটিই কিছু কাল পরে দেখা যায় সমাজ নেয়, এবং সেই আবিষ্কর্তা ও আচরণকারীকে লোকে স্মরণ করে। 'মার্টার' (সহীদ)-দের জীবন দেখা যায় এইরূপই। তুমি নিজের কাজের জন্য নিজেকে জবাব দিহি করবে নিজের বিবেকের কাছে। সেখানে যেন কোন গলতি না থাকে। কর্মের নিক্তিকাঁটার মান হচ্ছে ত্যাগ, ওজনের সময় কাঁটা সেখান থেকে সরে গেলেই বুঝতে হবে কাজ ভুল হচ্ছে।' ২১।১।৫২

।। তৃপ্তি ।।

স্বামিজীর কথা আলোচিত হচ্ছে—মানুষের অতৃপ্তি কেন ? স্বামিজী বলছেন, 'মানুষকে কিসে তৃপ্ত করবে—টাকা ?—ভোগ ?—সৌন্দর্য ? কিছুতেই মানুষ

তৃপ্ত হতে পারে না। এক তার অন্তরতম প্রিয়তম আত্মা ছাড়া কিছুতেই সে তৃপ্ত হতে পারে না—তার নিজের অনন্তস্বরূপ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ সে ভুলে গিয়ে কেবল এ হাতে ও হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দশ ছিদ্রের বাঁশীটি, তার যাবতীয় বেদনা, প্রার্থনা ও সুর নিয়ে সেই এক কৃষ্ণ কথাই বলছে। সে নিরন্তর সেই বনেই ফিরে যেতে চায়, যেখান থেকে সে তৈরী হয়েছে। বুদ্ধিপূর্বক অহংস্রোত ত্যাগ কর, ভোগের আবর্তে ডুবে মোর না, তুমি ছাড়া আর কেউ তোমার বন্ধু নেই, তুমি ছাড়া আর কেউ তোমার শত্রু নেই।' ২২।১।৫২

॥ রাধা-তত্ত্ব ॥

কথামৃত পড়া হচ্ছে—শ্রীশ্রীঠাকুর, রাধা-তত্ত্ব কী, বলছেন। কথার সার হলো, 'রাধা হচ্ছেন শুদ্ধসত্ত্বা প্রকৃতি ; প্রেমের প্রতীক। যোগ মায়ায ত্রিগুণই থাকে—সত্ব, রজঃ ও তমঃ। কিন্তু শ্রীমতী রাধিকা মাত্র শুদ্ধ-সত্ত্ব-ভাবময়ী।' ঠাকুব বলতেন, 'নরেন রাধিকার ভাবটি বেশ গ্রহণ করে।' স্বামিজী বলতেন, 'যদি ভগবানকে ভালবাসতে হয়, তো রাধিকার মত।' সে প্রেমে লেশমাত্রও অন্য সুখ নেই, কারণ রজঃ বর্জিত ; আবার সে প্রেমে বিশ্রাম বা অবসাদ নেই, কারণ তা তমোবর্জিত। সচ্চিদানন্দ নিজের আনন্দ-স্বরূপ আস্বাদ করবার জন্য রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণের আধা (অর্ধ) ; আবার র-লয়ে অভেদ, অর্থাৎ লাধা (আনন্দ)। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাধার, আবার তিনিই রাধিকারূপে আধেয় হয়েছেন। কৃষ্ণ স্বয়ং রাধারূপে প্রকাশ, নইলে আনন্দ-লীলা বা পূর্ণানন্দের আস্বাদ হয় না—রাধা সচ্চিদানন্দকে ভালবাসবার অভিজ্ঞান। "কৃষ্ণ ছাড়া জগৎ দেখব না" বলে, জন্মের পর রাধা চোখ খুলতে চান নি। শিশু কৃষ্ণ খেলা ছলে এসে চোখ খুলে দিলেন। ২৩।১।৫২

॥ কৃপা ॥

শ্রীশ্রীমার কথা আলোচনা চলেছে—যারা তাঁর কৃপা পেয়েছে, তাদের শেষ কোথায় ? মা বলেছিলেন, 'তোমরা ভাব কী যে আমার শরীর গেলেই তোমাদের প্রতি আমার কর্তব্য শেষ হলো ? যতদিন তোমরা সকলে সম্পূর্ণ মুক্ত না হবে, ততদিন আমার কর্তব্য হতে মুক্তি নেই। মন্ত্র দেওয়া কি যা তা কথা, কতবড়

দায়িত্ব নিতে হয় জান কী ? এর জন্য আমাদের কত ভাবনা উদ্বেগ সহ্য করতে হয়। সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়, যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। আমার কথাগুলো যদি তোমরা বুঝতে পারতে, তা হলে তোমরাও বেশ একটু নিশ্চিন্ত হতে ; আমিও নিশ্চিন্ত হতুম। ঠাকুর ভক্ত নিয়ে কত খেলা করেন, আর আমাকে তার হ্যাপা সামলাতে হয়। জান আমি যাকে একবার গ্রহণ করেছি, তাকে আর আমার ত্যাগ করবার জো নেই।' ২৪।১।৫২

।। দুঃখ ।।

আজ স্বামিজীর বই পড়া হলো—"মুক্তি ও সেবা"। প্রশ্ন হয়েছে, সংসারের দুঃখ কষ্টের অবসান কোন কালে হবে কি না ? স্বামিজী বলছেন, 'ভগবানের বাণী—"আমাদের কর্মে অধিকার ফলে নয়", অতএব কোমর বেঁধে জগদ্ধিতায় লেগে যাও। আমি মনে করি, ভগবান আমাকে এই করবার জন্যই এনেছেন। সারা জীবন নানা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে আমি চলেছি, আমার অতি নিকটতমদের আমি না খেয়ে মরতে দেখেছি, লোকের কাছে আমি কত হাস্যাস্পদ, অবমানিত ও অতি সন্দেহজনক হয়ে পড়েছি, কেন জান ?—আমার এই দুঃস্থের প্রতি সহানুভূতির জন্য। এ জীবন একটা দুঃখের বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয় হতেই যত মহদাত্মারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়েছেন। এখানকার শিক্ষা—সহানুভূতি, ধৈর্য, দৃঢ়-নিশ্চয়। দুর্বল মানুষকে আমি অতি সহানুভূতির চক্ষে দেখি। তাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপরিধি অতি ক্ষুদ্র—খাওয়া পরাকে অতিক্রম কোরে আর বেশী দূর চলে না।' ২৫।১।৫২

।। ঈশ্বর-কোটি ।।

শ্রীশ্রীকথামৃতের আলোচনা হচ্ছে—ঈশ্বর-কোটি কারা ? তাঁর উপদেশের তাৎপর্য, 'ঈশ্বরাবতাররাই ঈশ্বর-কোটি। তাঁরা চিরমুক্ত, চিদাকাশে বিহার করেন, মাছ যেমন সমুদ্রে। তাঁরা সংসারে কখনও আবদ্ধ হন না। তাঁদের অহংকার সংসারীদের মত স্থূল নয়। সংসারীদের অহংকার যেন চারিপাশে পাঁচিল আঁটা একটা ছাতওয়ালা ঘর। তার ভেতর যে জীব বাস করে, সে মুক্ত আকাশের কিছুই দেখতে পায় না। মুক্ত আত্মাদের অহং কাঁচের মত স্বচ্ছ, তার

ভেতর দিয়ে তাঁদের সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি ব্যাহত হয় না। সংসারীদের কারাগারে এই সব ঈশ্বর-কোটিরা যেন এক একটা ঘুল-ঘুলির মত রাস্তা করেছেন, যার ভেতর দিয়ে মুক্ত আকাশের অনেকটা দেখা যায়। এঁদের ভেতর দিয়েই জীবের ঈশ্বর দর্শন হয়।' ২৬।১।৫২

।। ঈশ্বরে টান ।।

শ্রীশ্রীকথামৃতের আলোচনা চলছে—কিরূপ টান হলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়? ঠাকুরের সঙ্গে শশধর পণ্ডিতের কথার মর্ম হলো, 'মানুষ যখন তাঁকে দেখবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে, তখন তিনি তাকে দেখা দেন। এক গুরু এক শিষ্যকে বলেছিলেন, "এসো তোমাকে শিখিয়ে দেই, কিরূপ আঁকু পাঁকু প্রাণ হলে ভগবানকে পাওয়া যায়।" এই বলে শিষ্যকে একটা পুকুরের জলে ডুবিয়ে ধরলেন এবং খানিক পরে ছেড়ে দিলেন। তার পর জিগেস করলেন, "কেমন লাগছিল তোমার?" শিষ্য বললে, "যেন প্রাণ যায় যায়, বাতাস না পেলে যেন আর বাঁচিনে।" গুরু বললেন, "ঠিক ঐরূপ ঈশ্বর নইলে যখন প্রাণ যায় যায় হয়, তখন তিনি দেখা দেন।" এরূপ তাঁকে পাওয়ার ব্যাকুলতাই হচ্ছে সকল সাধনার সার। নারদ রামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "হে রাম! যেন তোমার ভুবন-মোহিনী মায়ায় না ভুলি"।' ২৭।১।৫২

।। মন ও দর্শন ।।

কেদারবাবু (বারুইপুরের) একবার জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ বলতেন 'মন তিন প্রকার—মন, শুদ্ধমন ও বিশুদ্ধমন'—এর মানে কি বলুন?" বল্লুম, "মন দিয়ে সংসার করে, শুদ্ধমন দিয়ে জীব সৎকর্ম করে, সৎ চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যান করে, ক্রমে শুদ্ধ মনে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। আর বিশুদ্ধমন আত্মারই স্বরূপ, যা 'তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ—যা মানুষের বোধে বোধ হয়।"

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ বলতেন, 'বেদান্ত সিদ্ধান্ত নৃত্যতি'—এর মানে কি, বলুন? বল্লুম, "এর মানে অবতার এক অদ্ভুত তত্ত্ব, তাঁতে মূর্তত্ব ও বিভুত্ব দুই আছে। সেই যে, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত অসীম অপার ব্রহ্ম-বস্তু, তিনিই যোগমায়া সহায়ে মূর্ত হয়ে, সচ্চিদানন্দ-ঘন হয়ে গোপীদের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন, ভক্তদের দর্শন দিয়ে কৃপা করে থাকেন।" ২৮।১।৫২

।। রাধা-তত্ত্ব ।।

একবার শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "রাধা-তত্ত্ব কি ?" তিনি বলেছিলেন, "শুকাদি পরমহংসেরাই এই রাধা-তত্ত্ব বুঝেছিলেন। জগৎ-রাস-চক্র দিনরাত ঘুরছে, যেখানেই জীব প্রকৃতি সেখানেই সাক্ষি-চৈতন্য। জড় জগৎকে ওরা বলে ভোগ্য-শক্তি। যেখানেই জড়-পরমাণু সেখানেই ঈশ্বর সত্তা বর্তমান—তিনি অর্থাৎ অস্তি, ভাতি, প্রিয় ছাড়া জড় বা চেতন কিছুই থাকতে পারে না। ঠাকুর বলতেন, 'কৃষ্ণের পীত বসন রাধার গায়ের রং, রাধার নীল সাড়ী কৃষ্ণের গায়ের রং। কৃষ্ণের নোলক নূপুর, রাধার নীল পাথর—অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতে পুরুষ প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী ভাব। যেমন হর পার্বতীর অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি।

"হরপার্বতী গৃহী হয়েও মহাতপস্বী, সীতারাম আদর্শ গৃহস্থ—গার্হস্থ্য কর্মযোগী—এঁরাই ভারতীয় গৃহীর আদর্শ। রাধাকৃষ্ণে ঈশ্বরীয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা—ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের পর পরমহংসেরা এই পরাভক্তি নিয়ে থাকেন।" ২৯।১।৫২

।। বিশ্ব-প্রেম ।।

স্বামিজীর বই পড়া হচ্ছে—বিশ্বপ্রেম জিনিষটার বিশ্লেষণ হচ্ছে—স্বামিজী বলছেন, 'সমস্ত বিশ্বে পরম প্রেমাস্পদ ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন, সেইটে যখন মাঝে মাঝে মানুষ অনুভব করে, তখন ঐ বিশ্বপ্রেম জিনিষটার মানবীয় কর্মে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দ্বৈতানুভূতিতে এর ব্যাখ্যা হয় না, যেখানেই, যেরূপ ভালোবাসাই হোক না কেন, সব সেই পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মার ঐক্যানুভূতির বহিঃ-প্রকাশ। আত্মার প্রতি আত্মার আকর্ষণ হয়; জড়ের প্রতি হতে পারে না। জড়ই পরমাত্মাকে আপাততঃ বিভাগ করেছে, আত্মা নিজের স্বভাবে সব গণ্ডি, সব বন্ধন, সব সীমা, সব বাধা, সব আবরণ, সব বিপরীত টান ছিন্নভিন্ন কোরে সর্বদা এক হবার চেষ্টা করছেন।' ৩০।১।৫২

।। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ।।

শ্রীশ্রীমহারাজদের উপদেশ পড়া হচ্ছে—বিষয় হচ্ছে এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের বিশেষত্ব কি ? 'কেবল জ্ঞান, কেবল ভক্তি বা কেবল কর্ম নয়। এবার সকলের

সমন্বয়। হাতীর যেমন দুটো দাঁত। বাইরের দাঁত দিয়ে লড়াই করে—সেটা হলো কর্মযোগ। আর ভেতরের দাঁত দিয়ে খায়—সেটা হলো জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি। ভেতর তোমাদের যতদিন শুদ্ধ থাকবে, ততদিন তোমাদের উন্নতি, নইলে এত বড় ব্যাপার সব পণ্ড হয়ে যাবে। কাজ করবার সময় মনে রাখতে হবে—আমি নিরহংকার কিনা, আমি ঠিক ঠিক প্রভুর ভৃত্যরূপে নিজেকে মনে করি কি না?' বাবুরাম মহারাজ বলতেন, 'আমি যদি প্রভুর ভৃত্যই হই আর তিনি যদি আমার রক্ষক হন, তা হলে নিশ্চয়ই আমার ভেতর কোন দোষ ঢুকতে পারে না। এতে দৃঢ়-নিশ্চয় হতে হবে। আমি যে শ্রীরামকৃষ্ণ দাস, সন্তান, আমি কি কোরে দোষ করব!' ৩১।১।৫২

॥ মনঃ-স্থিরোপায় ॥

পূজ্যপাদ মহারাজদের কথা পড়া হচ্ছে—মনস্থির হয় না কেন? 'কাম কাঞ্চনে মন ছড়িয়ে আছে বলে। এ হলো অবিদ্যার খেলা, অবিদ্যা চায় না যে কেউ মনস্থির কোরে ভগবানকে ডাকে। সেই জন্য সেই মহামায়ার কাছে কর-জোড়ে প্রার্থনা করতে হয়, যেন তিনি দয়া করে রাস্তা ছেড়ে দেন। তাঁকে জয় কোরে কেউ যেতে পারে না।'—শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ বলতেন।

'সাধন আর কী? ছড়ান মন কুড়িয়ে এনে ভগবানের দিকে এক করা। "যদি সুতোয় এতটুকুও ফেঁসো থাকে তো তা ছুচে ঢোকে না"—ঠাকুর বলতেন। মনের কোণে এতটুকু বাসনা লুকানো থাকলেও মন সেখানে আটকে থাকে। তাদের সন্ধান কোরে বিচার কোরে তাড়াতে হবে, এরই নাম "আত্মার দ্বারা আত্মাকে রক্ষা করা"—গীতার কথা।' ১।২।৫২

॥ বিশেষ প্রকাশ ॥

কথামৃত পাঠ হলো—ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন, তার সার কথা হলো—'সর্বব্যাপী ব্রহ্মের আবার বিশেষ প্রকাশ কি?' ঠাকুর নরেনকে লক্ষ্য কোরে বল্লেন, 'ভগবান সব জায়গায় আছেন সত্য, কিন্তু সব-জায়গায় যে তাঁর সমান প্রকাশ তা বলা যায় না। তিনি অজ্ঞেয়, তবে তিনি তাঁর শক্তির ভেতর দিয়ে যখন প্রকাশ হন, তখন তিনি ভক্তের জ্ঞেয় হন। তাঁর এই শক্তি আবার

বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে দ্বিবিধ—বিদ্যাশক্তিতে সচ্চিদানন্দের প্রকাশ বেশী, আর অবিদ্যাশক্তির ভেতর দিয়ে তাঁর প্রকাশ কম। জীবও ব্রহ্ম। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তি সেই ব্রহ্মস্বরূপ জীবকে বড় ছোট করেছে ; সেই একই বস্তু জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় রূপে ত্রিধা প্রতীয়মান হচ্ছেন। স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দে বিশেষ-অবিশেষ, রূপ-অরূপ, সগুণ-নির্গুণ, প্রকাশ-অপ্রকাশ বলে কিছু নেই।' ২।২।৫২

।। মুক্তির সোজা রাস্তা ।।

স্বামিজীর বই পড়া হচ্ছে—তিনি মুক্তির সোজা রাস্তা নির্দেশ করছেন। 'কতকগুলো আইন কানুন মানলেই মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে সেবায় ও জ্ঞানানুশীলনে। এর ফলটা তুমি তখনই বুঝতে পারবে না। কারণ দেখা যায় মানুষ হয়ত একটা বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিল, কিন্তু কালে ভুলে গেছে। কিন্তু তবুও জেন, সেটা কখনই নষ্ট হয় নি, সময় ও সুযোগ পেলে সে তেড়ে ফুড়ে তোমার চিত্তের অতল তল থেকে বেরিয়ে এসে তার প্রতাপ দেখাবে। তেমনি তুমি যে ভাল মন্দ কাজ করছ, ভেব না কিছুই ফেলা যাবে, তোমার প্রত্যেক কর্ম ও চিন্তা তোমার চরিত্র গঠন করছে ; তোমার প্রত্যেক আত্মত্যাগ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়ে প্রবলাকার ধারণ করছে, একদিন তা তোমাকে তোমার স্বর্গের সামনে এনে উপস্থিত করবে।' ৩।২।৫২

।। বিভিন্ন দেবদেবী ।।

শ্রীশ্রীমার কথা আলোচিত হচ্ছে—ভক্ত প্রশ্ন করছেন, "বিভিন্ন দেবদেবী কোন্ মন্ত্রে পূজা করব ?" মা উত্তর দিলেন, "আমি যে মন্ত্র দিয়েছি, সেই বীজে সব দেবদেবীর পূজা করা চলে—দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, রাম যা কিছু পূজা করবে সেই মন্ত্রে করবে। ইষ্টই তো সব দেবদেবী হয়ে রয়েছেন। সেই এক ব্রহ্ম বস্তুর সহিত আমার সম্বন্ধ ইষ্টরূপে। ইষ্ট কী ?—যে ভাবে, যেরূপে, যে ভক্তি-সম্বন্ধে আমি সেই এক ব্রহ্ম বস্তুকে উপাসনা করি। কাজে কাজেই আমার ইষ্টই ব্রহ্ম, সমস্ত দেবদেবী সেই ব্রহ্মেরই ভাব এবং জীব-সম্বন্ধভেদে রূপভেদ মাত্র। কল্মির ঝাড় যেখানে ধরে টানবে, সেখান থেকেই সব জায়গায় টান পড়বে। এই দেখাবার জন্যই তো ঠাকুর এলেন। ঠাকুর সর্ব-দেবদেবী স্বরূপ। সব দেবদেবীর তাঁতে পূজো হয়।" ৪।২।৫২

॥ ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ॥

কথামৃত পড়া হচ্ছে—ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজন কতখানি? ঠাকুর বোঝাচ্ছেন—'সাধন-ভজনের প্রথম অবস্থায় বই-টই দরকার, ঈশ্বরীয় লীলা, জ্ঞান, ভক্তির কথা পাঠ করলে মন খুব উঁচু হয়ে ওঠে। কিন্তু যিনি যথার্থ জ্ঞানী তিনি কাছে কোন বই-টই রাখেন না। মা সরস্বতী যাদের জিহ্বাগ্রে, তাদের আর বই দিয়ে কি হবে? যেমন শুকদেব। শাস্ত্রে চিনি ও বালিতে মেশান থাকে। সাধুরা পিঁপড়ের মত বেছে চিনিটা খায়, বালিটা ফেলে দেয়। সাধুরা সকল শাস্ত্রের সার গ্রহণ করে। তারা জগতে বাস করে বটে কিন্তু তারা সকলের মধ্যে সেই ব্রহ্মবস্তুরই উপভোগ করে। সব জায়গায় ভগবান আছেন, কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্তে প্রকাশ নেই। যেমন সোনা মাটি চাপা পড়ে থাকে।' ৫।২।৫২

॥ বেদ ॥

আজ স্বামিজীর বই পড়া হলো—বেদ বলতে কি বুঝায়?—স্বামিজী ব্যাখ্যা করলেন, 'বেদ অনন্ত জীবনের অনন্ত জ্ঞান রাশির অভিজ্ঞান। বেদ কখনও সুযুক্তি বিরুদ্ধ নয়, প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ নয় বা আধুনিক বিজ্ঞান বিরুদ্ধও নয়। সমাধি জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও ন্যায় অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। সমাধি-জন্য জ্ঞানকে শ্রীবুদ্ধ বোধি বলেছেন। এখানে সত্যের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-ব্যবধানে জ্ঞান হয় না, এখানে বুদ্ধি সত্যের সহিত এক হয়ে যায়। অনেক সময় সমাধি জন্য জ্ঞানের ভাষা বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারে না, কারণ তারাও কতকগুলো স্থূল দৃশ্য থেকে সূক্ষ্ম নিয়মাবলির অনুমান করে মাত্র। তার মধ্যে কতক ঠিক হয় এবং সেইগুলো বাস্তব জগতে প্রয়োগ করে, আর কতকগুলো "বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার" বা রূপ-কথার মত সমাজে প্রচলিত থাকে। বেদ কিন্তু অভ্রান্ত।' ৬।২।৫২

॥ প্রায়শ্চিত্ত ॥

নিউটেষ্টামেণ্ট্ আলোচনা হলো—পাপের প্রায়শ্চিত্ত খুব শীঘ্র কি করে হয়? —যদি জীবনে অনুতাপ আসে এবং কৃতকর্মের জন্য যদি মানুষ আন্তরিকতার সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। প্রভু

বলছেন, "যদি কেউ তোমার প্রতি অপরাধ করে, কিন্তু তারপর যদি ক্ষমা চায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে ক্ষমা করবে। যদি কেউ দিনে সাতবার তোমার অনিষ্টাচরণ করে, কিন্তু তারপর ক্ষমা চায, তুমি তৎক্ষণাৎ তাকে ক্ষমা করবে।"—(লুক্ ১৭।৩,৪)। কেউ অনুতপ্ত হলে আনন্দিত হবে যে সে শ্রীভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছে। ভগবৎ কৃপা না হলে কেউ কখন অনুতপ্ত হতে পারে না। ঈশ্বর-কৃপা না হলে অহংকার যায় না, অহংকার না গেলে কেউ নিজের দোষ বুঝতে পারে না, অনুতাপও আসে না। ৭।২।৫২

॥ গায়ত্রীর তাৎপর্য ॥

আজ গায়ত্রী সম্বন্ধে আলোচনা হলো—ভালমন্দ সংসারে বোঝা বড় কঠিন। শ্রীভগবান বলছেন, "কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম বুঝতে পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ হন।"* অনেকে মনে করে সে বেশ ভাল বোঝে, তার দৃষ্টি নির্বাধা। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় মানুষের বুদ্ধি ইভের নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর যে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, ঠিক সেই প্রকার। "যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।" তিনি যখন বুদ্ধি গুলিয়ে দেন তখন অতিবড় পণ্ডিতেরও বিপরীত নিশ্চয় হয়। পাঁচহাত দূরের জিনিষ দেখতে পায় না। সেই জন্য সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়, হে প্রভু! "ধীযোযোনঃ প্রচোদয়াৎ"—আমাদের বুদ্ধিকে সৎ পথে পরিচালিত কর। "প্রত্যেক কর্ম করবার পূর্বে তাঁর অনুমতি মনে মনে নিতে হয়", মহারাজ আমাকে বলতেন। সম্পূর্ণ তাঁর ওপর নির্ভর করলে, তিনি জীববুদ্ধিকে ঠিক্ ঠিক্ পথে পরিচালিত করেন। ৮।২।৫২

॥ "মন মুখ এক করা" ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আলোচনা হচ্ছে—"মন মুখ এক করা" কি? সাধারণতঃ লোকে বাইরে দেখায় তারা বড় শুদ্ধ, লোককে বলেও বড় বড় কথা, কিন্তু অন্তরে তাদের দোষ-সংস্কার একটুও ক্ষীণ হয় নি, বা ক্ষীণ করবার চেষ্টাও করে না। ব্যবহার ও চিন্তা এক হওয়ার নাম, "মন মুখ এক করা"। অনেক সময় লোকেও বুঝতে পারে না, কেন লোকটা এত কষ্ট পাচ্ছে—অনেক সময় বোধ হয় যেন ভগবানের অবিচার। কিন্তু সর্বদর্শী, সর্বান্তর্যামী ভগবান জগতের—বাহিরের

ও অন্তরের—সকল ঘটনাই জানেন, তাঁর সাক্ষিত্বে সকল ঘটনাই ঘটছে। অতএব নিজের দোষের জন্য শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাই উচিত, তিনি দয়াময় সর্বদোষ ক্ষমা করেন। মন মুখ এক করবার ক্ষমতা তাঁর নিকট হতেই প্রার্থনা করা উচিত। ৯।২।৫২

॥ চিন্মাত্রস্বভাব রামকৃষ্ণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মস্বরূপতা এবং আমাদের জীবত্ব সম্বন্ধে আজ আলোচনা হলো—ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য লাভের উপায় কি? যারা শ্রবণ, বিচার ও ধ্যান সহায়ে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, বিশুদ্ধ-চিন্মাত্র-স্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণে স্থির করে, তারাই সংসার বন্ধন মুক্ত হয়। কেবল মুখে "অহং ব্রহ্মাস্মি", কিন্তু কাজে যারা সংসারের কাম-কাঞ্চন মান-যশঃ নিয়ে ব্যস্ত, সর্বদা কর্মোন্মত্ত, তাদের পরমহংসস্বরূপতা প্রাপ্তি-প্রচেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন তেলাপোকা কাচপোকার চিন্তা করতে করতে কাচপোকার রং প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মধ্যানীরা সেই সত্যজ্ঞানানন্দ ধ্যানের দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপতাই প্রাপ্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তেরা অন্য চিন্তা পরিহার পূর্বক মাত্র তাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপই ধ্যানের দ্বারা প্রাপ্ত হন। ধ্যানী, যোগী, জ্ঞানী সেবকেরা তাঁদের সকল চিত্তবৃত্তির তাৎপর্য শ্রীরামকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠা করেন, সেই জন্য আখেরে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণময়-জগৎ দর্শন করেন। ১০।২।৫২

॥ "আচার্যবান্ পুরুষোবেদ" ॥

তত্ত্বোপদেশ পড়া হলো—কেবল শাস্ত্র সাহায্যে জ্ঞান হয় কি না? শ্রীশঙ্কর এ বিষয়ে পূর্বপক্ষ করছেন—"অন্তঃকরণ সংশুদ্ধৌ স্বয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে।
বেদবাক্যৈরতঃ কিংস্যাদ্ গুরুণেতি ন সাম্প্রতম্॥"

অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হলেই পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, সুতরাং বেদবাক্যের প্রয়োজন কি? এবং গুরুপ্রসাদেরই বা প্রয়োজন কি?

তারপর সিদ্ধান্ত করছেন—"তথাপি শক্যতে নৈব শ্রীগুরোঃ করুণাং বিনা।
অপরোক্ষয়িতুং লোকে মূঢ়ৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ॥
আচার্য্যবান্ পুরুষো হি বেদেত্যেবং শ্রুতির্জগৌ।
অনাদাবিহ সংসারে বোধকো গুরুরেব হি॥"

জীব ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে নানা শাস্ত্র ও বেদ-প্রমাণ আছে সত্য, কিন্তু তথাপি শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রসাদ ভিন্ন পণ্ডিতাভিমানী মূর্খগণ কখনও অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি লাভ করতে সমর্থ হয় না। বেদ বলছেন, "আচার্যবান্ পুরুষই আত্মতত্ত্ব জানেন"। এই অনাদি সংসারে গুরুই একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানবোধক। ১১।২।৫২

।। বৈরাগ ও অনুরাগযোগ ।।

স্বামিজীর গ্রন্থাবলী থেকে খানিকটা পড়া হলো—বৈরাগযোগ ও অনুরাগ-যোগ কি ?

উপনিষদ্ বলছেন, সমগ্র ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর, জগৎ একেবারে ত্যাগ কর, তাহলে তার অন্তরালে যে সত্য রয়েছে, তা দেখতে পাবে। জগৎটা একটা ভালয়-মন্দয় মেশান গল্প, এ গল্পে শিশু-মানব একেবারে মুগ্ধ হয়ে রয়েছে। উপনিষদ্ বলছেন, গল্প থামাও, আসল কাজে লাগো। গল্প শুনে কারও ক্ষুধা মেটে না, আত্মার ক্ষুধা মেটাতে হবে, এই প্রহেলিকার যবনিকা ছিঁড়ে ফেলো ; এর পেছনে রয়েছে জীবনের অমৃতময়ী স্রোতস্বিনী।

ভক্ত বলছেন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কেউ কখন করতে পারে না, তবে ইন্দ্রিয়কে পরিষ্কার করতে হবে, অনুরাগের অঞ্জন পরতে হবে। তোমার দৃষ্টি ক্ষীণ, সেই জন্য তুমি দেখতে পারছ না যে সেই সচ্চিদানন্দই, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার"—এই প্রত্যক্ষ-ভগবান ছেড়ে, আবার কোথায় তাঁর অনুসন্ধান কোরে ফিরছ ? ১২।২।৫২

।। ব্রহ্মজ্ঞান পরিপন্থী ।।

আচার্যপাদের বৈরাগ্যমূলক গ্রন্থ সকল পাঠ কোরে আমরা দেখি নিম্নলিখিত দোষগুলি ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপন্থী—১) অনুসন্ধানরাহিত্য—অর্থাৎ বিচার ও ধ্যান সহায়ে আত্মানুসন্ধানের জন্য সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মচিত্তবৃত্তি সমূহের বিশ্লেষণ না করা। ২) আলস্য—দৈহিক ও মানসিক জড়ত্ব বা কর্মপ্রচেষ্টারাহিত্য। ৩) ভোগ-স্পৃহা—ইন্দ্রিয়জাত চিত্তসুখভোগে আবদ্ধ হওয়া। ৪) লয়—নিদ্রাসুখভোগ। ৫) তমঃ—জীবনের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অবিবেক। ৬) বিক্ষেপ—সাংসারিক

বিষয়ে মনোনিবেশ। ৭) রসাস্বাদ—সামান্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধি জন্য আনন্দে নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করা। ৮) শূন্যতা—অভাবজ্ঞানটাকেই ব্রহ্মজ্ঞান মনে করা—এইরূপ যে চিত্ত বিকার। ১৩।২।৫২

॥ হিন্দুর ঐক্যসূত্র ॥

বিভিন্ন ভাষা সত্ত্বেও হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য সূত্র কী?—১) শাস্ত্র বলে গণ্য হতে গেলে সংস্কৃততে হওয়া চাই। সেই জন্য ভারতের যে কোন ভাষার উপব সংস্কৃতের আধিপত্য স্বীকার্য। ২) সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য দক্ষিণের লোক উত্তরে এবং উত্তরের লোক দক্ষিণে গেছে, যখনই ঐ সব দেশে বিশিষ্ট অধ্যাপকের উদয় হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের পূজা-পাঠ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, গ্রাম্য-প্রবাদ ও গাথাও সর্বদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ৩) যে কোন প্রদেশেই কোন মহাপুরুষ জন্মান না কেন, তাঁর উপদেশ সমভাবে সমন্বয়ের সহিত সর্ব-প্রদেশের সর্বস্তরের অন্ততপক্ষে, কতকগুলি লোকও নিজেদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে; যেমন রাম, কৃষ্ণ, শঙ্কর ও রামায়ণ, মহাভারতাদি। ৪) ভারতের যাবতীয় বীর যোদ্ধাই সমভাবে সর্বদেশে পূজিত; যেমন চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, বিক্রমাদিত্যেরা, বিজয় সিংহ, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, রণজিৎ, ইত্যাদি। ৫) ভারতের রামকৃষ্ণাদি অবতার সর্বপ্রদেশে সমভাবে পূজিত। ১৪।২।৫২

॥ সনাতন ধর্ম ॥

আজ কথামৃত পাঠ হলো—জগতে আখেরে কোন ধর্ম টিঁকবে? শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, 'ঈশ্বরেচ্ছাতেই কত ধর্ম উঠেছে এবং কত ধর্ম গ্যাছে। কিন্তু যা ঋষি-দৃষ্ট সনাতন, সর্বজনীন ধর্ম তাই চিরকাল কালবিজয়ী হয়ে থাকবে।' ছোটখাটো সম্প্রদায়ও ঈশ্বরেচ্ছায় হয়, কারণ তাদেরও একটা উদ্দেশ্য ও কর্ম আছে। অর্থাৎ কিছু নূতন দেওয়ার আছে, সেটা দেওয়া হয়ে গেলেই, সেগুলো সনাতন ধর্মে মিশে যায়। এ সব যা কিছু আবির্ভাব তিরোভাব হচ্ছে, সকলের পেছনেই ঈশ্বরেচ্ছা আছে। নইলে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটতে পারে না। আমাদের যেটাকে খুব উৎকট বলে বোধ হয়, সেটার মধ্যেও একটা রহস্য আছে, আমাদের গলতি দূর কোরে নূতন দৃষ্টি খুলে দেয়। দেখ, পূর্বপক্ষ না

থাকলে উত্তরপক্ষ হয় না, পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ মিলেই সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে। সিদ্ধান্তেও সমালোচনা না থাকলে অনেক সময় তা কল্পনা হয়ে পড়ে। ১৫।২।৫২

॥ লোক ব্যবহার ॥

কথামৃত পড়া চলছে,—লোকের সঙ্গে মনোমালিন্য থাকলে কি করা উচিত? শ্রীশ্রীঠাকুর ভবনাথকে বলেছিলেন যে, প্রথম সকলের সঙ্গেই মিত্রতার চেষ্টা করবে, কিন্তু যদি না শোনে, তখন ও বিষয়ে আর চিন্তা করা উচিত নয়, ভগবচ্চিন্তা করাই ভাল। ভগবচ্চিন্তা ছেড়ে ঐ একটা বিষয় নিয়ে মন খারাপ করা উচিত নয়। সকলকেই ভালবাসবে, কারণ সকলের মধ্যেই সেই প্রেমময় ভগবান আছেন। দুষ্টু নারায়ণদের দূর থেকে নমস্কার করবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান হয়েও বহিরাঙ্গ লোক দেখলে ভাব সম্বরণ করতেন। একজন যদি সত্যই একজনের মনের মত না হয়, তা হলে কি দিন রাত তাই ভেবে সময় নষ্ট করতে হবে? আমি বলি—আমার কোন কিছুর দরকার নেই, মা তুমিই কেবল আমার থাক। ১৬।২।৫২

॥ ভারতের দান ॥

স্বামিজীর গ্রন্থাবলী পড়া হচ্ছে—মানব জীবনের উপাদানে ভারতের দান কী হবে? স্বামিজীর মতে, "God, God alone"—একমাত্র ভগবান ছাড়া ভারতের আর মনুষ্য সমাজে দেবার কিছু নেই। তারা মৃত্যুপণ কোরে এই ভগবানকে ধরে আছে। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক, কোন চিন্তাধারাই তাদের ভাগ্যের বিধাতা কোন কালেই হবে না, তা আসুক দারিদ্র্য, বিদেশীর অত্যাচার, শোষণ। কোন কালেই ভারত-ভারতী শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞদের স্থান অধিকার করতে পারবে না, কিন্তু যখনই জগৎ ধ্বংসের সম্মুখীন হবে তখনই ভারত তাদের পথরোধ কোরে দাঁড়াবে, তাদের ভগবানকে নিয়ে। ভারতকে বাঁচতে হলে যতটুকু রাজনীতির দরকার, ততটুকু তার অভিনবত্ব সৃষ্টি হবে। কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ অভিনবত্ব যুগে যুগে নূতন আদর্শ, নূতন মানব, নূতন অতীন্দ্রিয় বস্তু লাভের পদ্ধতি অবিষ্কার। ১৭।২।৫২

॥ রত্নমালা ॥

সুসংসর্গ কাকে বলে?—সুখাবহ মিত্রতা অর্থাৎ যার সহিত মিত্রতা করলে চিরকাল আনন্দ লাভ হয়।

মরণকাল পর্যন্ত যাতনা দেয় কি?—গুপ্ত পাপ এবং মর্মচ্ছেদী বাক্যের স্মৃতি।

কোন্ বিষয়ে নিত্য প্রযত্ন বিধেয়?—বিদ্যাভ্যাস এবং আর্তকে ঔষধাদি দান।

চতুর্ভদ্র কি?—১) প্রিয়বচন প্রয়োগের সহিত দান, ২) গর্ব পরিহার পুরঃসর দান, ৩) ক্ষমা সহ শৌর্য ও ৪) দান সহ বিত্ত।—শ্রীশঙ্কর॥ ১৮।২।৫২

॥ দুঃখে সান্ত্বনা ॥

যখন দুঃখ আসে কি ভাবি?—মন! তুমি অতি দীন, তা তুমি যাই হও, অথবা যারই দিকে তাকাও, যতক্ষণ না তুমি ভগবানের দিকে তাকাবে। তোমার মনের মত পরিবেশ রূপ নিচ্ছেনা দেখে তুমি কি করবে? তুমি কি এই জগৎ চালাচ্ছ? তোমার কর্মফল বিধাতা তুমি স্বয়ং, না শ্রীভগবান নিজে? এ জগতে এমন কেউ আছে কি, তা সে রাজা মহারাজাই হোক আর মোহান্ত মহারাজই হোক, যে বিনা বাধা-বিপত্তি বা অপ্রিয়-সংযোগ ভিন্ন কোন বস্তু তাঁর লাভ হয়েছে? তা হলে ভক্তদের মধ্যে ভাল কে? যারা নিজের অবস্থায় সর্বদা অস্বস্তি অনুভব করে, না যে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা মিশিয়ে দিয়ে বলে, "বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা, সে কেবলি দয়া তব জেনেছি মা দুঃখ হরা!" ১৯।২।৫২

॥ জীবাদৃষ্ট গ্রহণ ॥

জীবাদৃষ্ট গ্রহণ করা কি?—শ্রীভগবান মানুষ হয়ে এসে জীবের পাপ নিজে ভোগ কোরে জীবের "কপাল-মোচন" করেন। খৃষ্টানরা মনে করে যীশু একটি নিরীহ মেষশাবক, তাঁতে সর্বপাপ সমর্পণ কোরে, সেই মেষটী ভগবানের কাছে বলি দেওয়া হয়েছিল। যীশুকে যারা বিশ্বাস করে, তিনি তাদের পাপ গ্রহণ কোরে প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছেন। আমাদের ঠাকুরের তেমনি গলরোগ ভোগ। স্বামিজী কিন্তু এরূপ বিশ্বাসটা পছন্দ করতেন না। তিনি ডেট্রয়েটের এক বক্তৃতায় (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪) বলেন, "যদি

কেউ এসে বলে, 'আমার রক্তের পরিবর্তে তুমি মুক্ত হও', আমি তাকে বলব, 'ভাই! তুমি এখান থেকে এসো, আমি নরকেই যাব, আমি এমন কাপুরুষ নই যে এক জন নিরীহের রক্তের পরিবর্তে আমি স্বর্গে যাব, আমি নরকে যেতেই প্রস্তুত।" ২০।২।৫২

॥ মহাপুরুষলক্ষণ ॥

স্বামিজীর বই পড়া হচ্ছে—মহাপুরুষদের কি লক্ষণ?—তারা অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত ভাবের এক একটী অনুভূতি স্বরূপ। সর্বাদর্শের উৎপত্তি স্থল হচ্ছেন সেই ব্রহ্মময়ী—অস্তি-ভাতি-প্রীতিস্বরূপা। তাঁরই কোন ভাবাদর্শের আবিষ্কারকেরা তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। স্বামিজী বলছেন, "বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নয়, তিনি একটী অপূর্ব-অনুভূতি।" মহাপুরুষেরা শান্তির আদর্শ। যারা শান্তিকামী তাদের সেই মহাপ্রাণদের রাস্তা অবলম্বন করতে হবে। নিজের মুক্তি নিজে অর্জন করতে হবে। কেউ তোমাকে তা তোমার হতে তুলে দিতে পারবে না, যদি তুমি তা নিজ হাতে গ্রহণ না কর। কেউ তোমাকে বিশেষ অধিকার দিতে পারে না, যদি তুমি তার অধিকারী না হও। নিজে আত্মবিশ্বাসী হও, আত্মাকে দুর্বল কোরো না, কিছুদিন শক্তি অর্জনের চেষ্টা করলেই দেখবে আত্মা অনন্ত-শক্তি। ২১।২।৫২

॥ সৎসঙ্গ ॥

হোলি বাইবেল পড়া হচ্ছে—ভাল লোক বিচার কি কোরে করব?—বাবুরাম মহারাজ বলতেন, "যার সঙ্গে দেখা হলেই ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আপনি জেগে ওঠে, তাকে ভাল লোক বলে জানবি।" সকলের সঙ্গে মিশবে, ভদ্রতা করবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখবে, তারা শ্রীরামকৃষ্ণের কি না। কিন্তু কি কোরে বুঝব তা? "যে হয় আপন জনা, নয়নে তায় যায় গো চেনা।" যারা ঠাকুরের, কিছুক্ষণ পরেই তারা কথাবার্তার মধ্যে তাঁর কথা বলে ফেলবে। তারা নরশরীরে ব্রহ্মের আবির্ভাব স্বীকার করে। খৃষ্ট বলতেন, প্রভু যে বেশেই আসুক কুকুর তার প্রভুকে চিন্তে পারে। ভগবান যে বেশেই আসুন ভক্ত তাঁকে চিন্তে পারবেই। মেষ শিশুকে যে খোঁয়াড়েই চুরি কোরে রাখুক, সে তার প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনলেই

উত্তর দেবে। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁর বাণী শুনলেই ভক্তেরা বুঝতে পারে, প্রভুর আবির্ভাব হয়েছে। ২২।২।৫২

।। উপেক্ষা ।।

"উপেক্ষা" কাকে বলে?—পাতঞ্জল সূত্র পড়া হলো। অপরের অক্ষমতা এবং দুর্বলতা ধৈর্য সহকারে দৃষ্টিপাত করবে। কারণ তোমারও তো অনেক দুর্বলতা এবং অক্ষমতা আছে। তুমি যদি অপরের দোষের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না কর, তা হলে তোমার দোষের বেলায় অপরের নিকট হতে তুমি কি প্রত্যাশা কর? আমরা সর্বদা চাই অপরের আচার ব্যবহার যেন আমাদের অনুকূল হয়, কিন্তু আমরা নিজেরা কি সব সময় অপরের প্রতি তার অনুকূল ব্যবহার করতে পারি? আমরা অনেক সময় অপরকে অতি রূঢ় ভাবে সংশোধন করি, কিন্তু কার্য্যকালে সেরূপ রূঢ়তা আমরা নিজেরা সহ্য করতে পারি না। অপরের স্বাধীনতাটা আমরা যথেচ্ছাচার মনে করি; কিন্তু আমাদের কার্য-কলাপও তো অপরে ঠিক সেইরূপ মনে করতে পারে। ২৩।২।৫২

।। "একটী কৃষ্ট ও একটী রাধা" ।।

একদিন এলাহাবাদ মঠের ছাদে শুয়ে আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে পূজ্যপাদ হরিপ্রসন্ন মহারাজ বল্লেন, "এই যে অফুরন্ত নক্ষত্র সব দেখছ, এ সব সেই একই বিশ্বম্ভর অগ্নির এক একটী বিশিষ্ট প্রকাশ। সেইরূপ 'একটী কৃষ্ট' ও 'একটী রাধা' ছাড়া আর কিছু নেই। কৃষ্ণ পরমাত্মা, রাধা মহাপ্রাণ—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি কৃষ্ণ। এক বহু হন কি কোরে? না, এক মহাপ্রাণশক্তি অসংখ্য স্থূল সূক্ষ্ম কারণে পরিণত হচ্ছেন, আর তাইতে প্রতি-বিম্বিত হয়ে একটী কৃষ্ণ অনন্তকোটী কৃষ্ণে স্ফুরিত হচ্ছেন। এই হলো জগৎ রাসচক্রের তাৎপর্য। মাঝখানে একটী কৃষ্ণ-রাধা। রাধা অনন্ত বিচিত্র প্রাণ-শক্তিরূপ গোপীতে পরিণত হয়েছেন এবং প্রতি গোপীতে এক একটী কৃষ্ণ প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। ঐ মূলরাধাকৃষ্ণ যেমন নৃত্য করছেন, যাবতীয় পরিনামি-প্রাণরূপ-গোপী ও প্রতিবিম্ব-কৃষ্ণগণ তাঁরই অনুসরণ কোরছে।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কৃষ্ণ ও রাধা কি পৃথক পৃথক তত্ত্ব?" বল্লেন, "না তা

কেন হবে, ঠাকুর বলতেন, 'ব্রহ্ম শক্তি এক, যেমন মণি ও মণির জ্যোতিঃ, সাপ ও সাপের কুটীল গতি।' স্বামিজীর গানে আছে, 'যেই সূর্য তারি কিরণ, যেই সূর্য সেই কিরণ'।" ২৪।২।৫২

॥ "তিনি যাকে ধরেন" ॥

একদিন শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজকে বল্লুম, "ধ্যান জপ কোরে যদি কিছু অনুভূতি হয়, তবেই সাধন পথে উৎসাহ আসে। নইলে এগুচ্ছি না পিচুচ্ছি কিছু বোঝা যায় না।"

বল্লেন, "ধরে থাকতে হয়, খুঁটি ধরে ঘুরতে হয়, খুঁটি ছাড়লেই পড়ে যাবি। খান্‌দানি চাষারা বার বচ্ছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষবাস ছাড়ে না। সন্ধ্যা নাগাৎ পাতা সকলেরই পোড়বে। এ সব ঠাকুরের কথা। বুড়োগোপাল দা বলতেন, 'ঠাকুরের কাছে প্রথমবার গিয়ে কিছুই বুঝতে পারলুম না—কেন এঁকে লোকে মহাপুরুষ বলে। আবার গেলুম, কিন্তু সেই একই ধারণা নিয়ে ফিরলুম। ভাবলুম আর যাব না। শেষে এক বন্ধুর অনুরোধে তৃতীয়বার গেলুম, এইবার এক অদ্ভুত টান অনুভব হতে লাগলো।' এইবার ঠাকুর তাঁকে ধরলেন। গোপাল দা বলতেন, 'তার পর থেকে দিন রাত কেবল তাঁর কথা মনে পোড়ে বুকের মধ্যে যেন সর্বদাই কি একটা বেদনা অনুভব করতুম; অনেক চেষ্টা কোরেও তাঁর মুখ ভুলতে পারতুম না।' এইভাবে তাঁর কৃপার প্রতীক্ষা কোরে থাকতে হয়; যেদিন ধরবেন সেদিন বুঝতে পারবি। 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'—কিন্তু ছাড়বার জো নেই। আবার মজা দেখ, যদি বা ঐ আকুলি বিকুলি ভাবটা কেটে যায়, তখন আবার ঐ ভাবটা পাবার জন্য এক অদ্ভুত বিরহ-ব্যথা উপস্থিত হয়—তাঁর বিরহটাই মধুর বলে বোধ হয়।"

পরে খৃষ্টান মিস্‌টিক্‌দের বই পড়ে বুঝলুম, প্রভুর ভক্তের আত্মাকে ধরাটাকেই তাঁরা 'পবিত্রাত্মার অবতরণ' বলে বর্ণনা কোরেছেন। ভগবানের আকর্ষণই ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিরূপে প্রকটিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর যাকে বলতেন, "প্রেম হয়েছে"। ২৫।২।৫২

॥ উপেক্ষা ॥

একদিন পূজ্যপাদ হরি মহারাজের সহিত আমাদের, পাতঞ্জলোক্ত মৈত্রী করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। দুর্জনের প্রতি উপেক্ষা—সূত্রকার বলছেন। হরি মহারাজ বল্লেন, "দুর্জনের প্রতি উপেক্ষা বেশ ভাল কথা, কিন্তু ওর চাইতেও উঁচু আদর্শ আছে। একবার এক সাধু স্নান কোরতে গিয়ে দেখলেন একটা বিছে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, তিনি হাতে কোরে তুলে তাকে ড্যাঙায় ফেলে দিলেন। বিছে কিন্তু ওর মধ্যেই তাঁকে কামড়ে দিলে। সাধু উঃ কোরে উঠলেন। তার পর আবার স্নানাদিতে মনোযোগ দিলেন। ইতি মধ্যে বিছেটা আবার ঢেউ লেগে জলে গিয়ে পড়লো। সাধু আবার তাড়াতাড়ি কোষ কোরে সেটাকে তুলে ডাঙায় ফেলে দিলেন, বিছে আবার তাকে কামড দিলে। সাধুও আবার উঃ কোরে উঠলেন। একজন লোক কিনারায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। বল্লে, "তুমি তো আচ্ছা বোকা দেখছি, কেন ওটাকে তুমি বার বার তুলছ?" সাধুটী বল্লেন, "ওর যা স্বভাব ও তাই দেখাচ্ছে, আর আমার যা কাজ আমি তাই করছি।" ২৬।২।৫২

॥ অনাসক্তি ॥

অনাসক্তি কী?—দৃশ্য হতে চির বিদায়—অহমিকার দীপ শিখাটীর চির-নির্বাণ! তারপর? তারপর প্রতিবিম্বের অস্পষ্টতা হতে স্বরূপের জ্যোতির্ময় সুপ্রভাত!

মৃত্যু চিন্তা করি কেন?—মৃত্যুর চিন্তা মৃত্যুর অতীতকেও ভাবায়। মৃত্যুর চিন্তা আত্মার নশ্বরত্বের মিথ্যা অভিনয়কে ভুলিয়ে দেয়। সে এই দেহের ক্ষুদ্র সীমানাকে ছাড়িয়ে কত দূর দূরান্তের লোকে ঘুরে বেড়ায়, আর ধীরে ধীরে জীবনের এই ক্ষুদ্র সীমানার আসক্তিও কমে আসে। যাদের এই সীমানায় আসক্তি তারাই মরে; যারা এ পারের সীমায় আসক্ত নয়, সন্তুষ্টও নয়, মরণে তাদের আসে অভয়, তারাই বাঁচে মোরে। মৃত্যুকে যদি অগ্রাহ্য করতে চাও, তাহলে কখনও এই ক্ষুদ্র সীমানায় জীবনটাকে আবদ্ধ কোরে ভালবেস না, বা একে জড়িয়ে ধরে রাখবার চেষ্টা কোরো না। ২৭।২।৫২

॥ অস্থিরতা ॥

স্থির থাকতে পারি না কেন ?—তোমার আলোতেই চিন্তা-নর্তকী নাচছে ; এমন মুগ্ধ তুমি, যে তার অঙ্গভঙ্গীতে নিজেই অঙ্গভঙ্গী কোরে ফেলছ। ওদিকে আর নজর দিও না ; সে খানিক নেচে খুব শ্রান্ত হয়ে আপনিই পালাবে। তখন থাকবে শুধু ঐ আলো, ঐ অমর জ্যোতিঃ। একজন বলতো, "ধ্যানের শান্তি পর্বত গহ্বরেও নেই, নদী তীরেও নেই। মন যার চিন্তাহীন, আগুনও তার কাছে শীতল।"

মহানির্বাণের আকর্ষণে সব চলেছে, মা কি আসন্নমৃত্যু শিশুর গলা জড়িয়ে ধরে তার বিদায়-যাত্রা স্থগিত রাখতে পারে? জীবনের প্রতি মুহূর্তের কর্ম কেবল আমরা খতাচ্ছি, 'এতে আমার স্বার্থ কতটুকু বাড়ল ?' কখনও ভেবেও দেখি না যে, যারা সেবক, যারা ত্যাগী, যারা ধ্যানী, তারা সকলের বাইরে থেকে ফুলের মত গন্ধ দিয়ে ঝরে পড়ে। ২৮।২।৫২

॥ গোপী প্রেম ॥

একদিন শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ আমাদের বলতে লাগলেন, "আহা আমরা আর ঠাকুরকে কিই বা ভালবাসলুম। ভালবাসা ছিল গোপীদের, ভগবানের পায় কুশাঙ্কুর ফুটলে তাদের মনে হোত তাদের বক্ষে শেল বিঁধছে। কৃষ্ণের সুখের জন্য তারা জাতি, কুল, শীল, মান, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, নিন্দা সব উপেক্ষা কোরেছিল, কৃষ্ণ-সেবার জন্য সর্বদা তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকতো। কৃষ্ণের কুশলের জন্য তারা নরক ভয়ও কোরতো না।

"একবার শ্রীকৃষ্ণের অসুখ কোরলো। বল্লেন, 'ভক্তপদধূলি অঙ্গে মাখা ভিন্ন এ ব্যাধি যাবে না।' নারদ ভক্তপদধূলি সংগ্রহের জন্য ত্রিভুবন ঘুরলেন, কিন্তু কেউ এরূপ গর্হিত কার্য কোরতে রাজি হলেন না। শেষে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে এই কথা পাড়তে গোপীরা বল্লেন, 'আমরা তাঁরই একান্ত শরণাগত দাসী, তাঁকে ভিন্ন আমরা অন্য কিছুই জানিনা, তাঁর লীলা ভিন্ন আমরা অন্য ভজন করি না, তিনি ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমাদের অনুরক্তি নেই। এক কৃষ্ণ-সুখ আস্বাদে আর সব সুখে আমাদের অরুচি হয়ে গেছে। আমাদের কোন পুণ্যে যদি তাঁর পাদপদ্মে কিছু ভক্তি থাকে, তা হলে আমাদের পদধূলিতেই তিনি আরোগ্য

হবেন—এতে আমাদের নরক হয় হবে।' তাঁরা পায় ধূলো মেখে এসে পদ-ধূলি দিলেন।

"গীতায় পড়া যায়, "স্বকর্মণা ত্বমভ্যর্চ্য"। শ্রীমতী বলেছিলেন, 'তোদের কৃষ্ণ কথার কথা, আমার কৃষ্ণ অন্তরের ব্যথা।' ঠাকুর যদি একবার কৃপা-দৃষ্টি করেন, তা হলেই জীব আনন্দে মসগুল হয়ে যায়। তখন আসে প্রেম ভালবাসা। তখন 'যেদিকে ফিরাই আঁখি সব কৃষ্ণময় দেখি।' তখন আসে সর্বভূতে প্রেম, 'ইউনিভার্সাল্ লাভ্', তখন সর্বভূতের সেবাও হয় ঠিক্ ঠিক—'ইউনিভার্সাল্ সারভিস্'।" ২৯।২।৫২

॥ "এলে দেওয়া" ॥

পূজ্যপাদ হরি মহারাজ অসুস্থ অবস্থায় বলরাম মন্দিরে আছেন। একবার বল্লেন, "ঠাকুর এখানে একবার এসেছেন, জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত পড়ছি টড়ছি, কিন্তু মনে বসছে না কেন?' তখন ফোটোগ্রাফ্ চালু হয়েছে, একখানা ছবির দিকে তাকিয়ে বল্লেন, 'কাচে যদি মশলা মাখান না থাকে তো তাতে ছবি ওঠে না।' একখানা লোহার ট্রেতে তখন এখানে তামাক, টিকে, দিয়াশলাই, চকমকি সব থাকতো। সেই দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'দিয়াশলাই ভিজে গেলে, কাঠি ঘসলে জ্বলে না, কাগজ ছিঁড়ে যাবে তবুও জ্বলবে না।' অর্থাৎ বৈরাগ্যের সহিত শাস্ত্রাভ্যাস না কোরলে কিছু মনে বসে না। আবার বল্লেন, 'দেখ চকমকি যদি হাজার বছর জলের তলায় থাকে তাহলেও তুলে লোহা দিয়ে ঠুকলেই আগুনের ফিন্‌কি বেরুবে'—অর্থাৎ যাদের ভেতর সত্তা আছে, তারা যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ঈশ্বরের নাম কোরলেই তাদের অশ্রু পুলকাদি দেখা দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি কি এ সব উপদেশ (উপমা) আগে থেকেই তৈরি কোরে রেখেছেন'। তিনি বল্লেন, 'না, তা রাখিনে, মা সব জায়গায় আছেন, যখন যেদিকে তাকাই তখন সেখান থেকেই মা সব এলে দেন।' অর্থাৎ ভেতর থেকে ঐ সব জিনিষগুলোকে উপলক্ষ্য কোরে মনে ঐ সব কথা ওঠে। এরই নাম 'এলে দেওয়া'।"

শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্বামী আমেরিকায় একবার তাঁকে হাসতে হাসতে বল্লেন, "হরিভাই, সব কথা একদিনে বোলে ফেলো না, এর পর কি বলবে?" হরি মহারাজ হেসে বল্লেন, "ঠাকুর বলতেন, 'মা এলে দেবেন'।" ১।৩।৫২

॥ ভারতের ভবিষ্যৎ ॥

শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের কাছে শুনেছি, স্বামিজী একদিন মঠের গঙ্গার ধারের বেঞ্চির উপর বসে ভারতবর্ষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিন্তা কোরে বল্লেন, "যুক্তি দিয়ে হিন্দু ধর্মের বাঁচবার কোন আগম-নিগম খুঁজে পাওয়া যায় না, সকলেই উদারতার নামে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থের নিকট ৩০ কোটি হিন্দুকে বলি দিতে চায়। কারণ কোন বুদ্ধিমান বড় জাতের জাগরণটা অপর জাত ভীতির চক্ষে দেখে। কুরীতি, কদাচার সত্ত্বেও এখনও হিন্দুর আদর্শ মহান্, এখনও সেই মহান্ আদর্শকে তারা বাস্তবে প্রয়োগ করবার চেষ্টা কোরছে। এখনও ভারতে সাধু-সন্তের অভাব নেই, ঈশ্বর লাভের জন্য এখনও সর্বস্ব ত্যাগী অহিংসাপরায়ণ প্রেমিক সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে একটু খুঁজলেই পাওয়া যায়। আমি পৃথিবী ঘুরে, ঈশ্বর দর্শন কোরেছেন এরূপ যে দু চার জন লোক দেখলুম, তার সব কটিই ভারতবর্ষে। আমার বোধ হয়, যদি জগতে ধর্ম বলে কিছু থাকাটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তা হলে এক অভাবনীয় উপায়ে ভারতীয় হিন্দুরা এই ভীষণ দুর্যোগে রক্ষা পাবে।"

বাবুরাম মহারাজ বলতেন, "তোরা যেন অবস্থা চক্রে পড়ে দেশ জাগরণের বিলেতী উপায়ের দিকে টলে যাস নি, এই শ্রীরামকৃষ্ণরূপ খুঁটি ধরে থাকবি, দেখবি আখেরে ধর্মেরই জয় হবে। তবে অনেক দুঃখ কষ্ট নির্যাতন এই ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙালী জাতির উপর দিয়ে যাবে। বাঙালীর মধ্যে লোকদের ভেতর অসীমশক্তি, সহনশীলতা, বল, বীর্য, বুদ্ধি কালে প্রকাশ পাবে। স্বামিজী একদিন বল্লেন, 'এই দেশটা তোর। দেখবি কালে এই জাত সমগ্র ভারতে এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের মধ্য দিয়ে জগতে এক ব্যাপক শান্তি স্থাপন কোরবে। তোদের এখন একমাত্র কর্তব্য এই শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রকে মৃত্যুপণ কোরে ধরে থাকা—যতই ধাক্কা আসুক কিছুতেই বিচলিত না হওয়া। আখেরে জানবি শ্রীরামকৃষ্ণই জয় যুক্ত হবেন।" ২।৩।৫২

॥ প্রচারে "কাঁচা ও পাকা আমি" ॥

কথামৃত পড়া হলো—"কাঁচা-আমি" দিয়ে প্রচার করলে দল বাঁধা যায় কি না? শ্রীশ্রীঠাকুর একবার কেশবচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন যে, 'যে আমিটাকে মানুষ

নেতা, দলের কর্তা, প্রচারক ইত্যাদি মনে করে সেটা কাঁচা-আমি। ধর্ম প্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বর-গুরুর আদেশ না পেলে, ধর্ম প্রচার হয় না। "চাপড়াস" দরকার। শুকদেব ভাগবত বলার হুকুম পেয়েছিলেন। ঈশ্বর দর্শনের পর যদি তাঁর হুকুম পায় যে প্রচার করতে হবে, "শিক্ষে" দিতে হবে, তা হলে সে সব কাজে দোষ হয় না। সেটা কাঁচা-আমি নয়, পাকা-আমি।'

আবার কেশবকে বলেছিলেন যে, কাঁচা-আমি ছাড়তে হবে। যে 'আমি' ভাবে আমি ভগবানের দাস, ভগবানের ভক্ত, সে 'আমি' ক্ষতি করে না। তিনি নিজেকে কর্তা মনে করেন বোলে, তাঁর দলের লোক চলে যায়, অন্য দলে যোগ দেয়। কেশব হেসে বলেছিলেন, 'শুধু তাই নয়, আবার গালও দেয়।' ৩।৩।৫২

॥ নিম্ন দৃষ্টি ॥

প্রবাদ আছে, "নিজের চরখায় তেল দাও"। লাটু মহারাজ বলেছিলেন, "সংসারে মাথা নিচু কোরে চলতে হয়—চারিপাশে বেশী তাকান উচিত নয়।" অপরের বিষয়ে নজর দিলেই তোমার বিষয়েও অপরে নজর দেবে। তখন তুমি তোমার মনের শান্তি হারাবে। একজন খৃষ্টান সাধক একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন, "যদি অপরকে তার নিজের কাজ নিয়ে একলা থাকতে না দাও, তা হলে সেও তোমার কাজে ব্যাঘাত জন্মাবে। অপরের বিষয়ে নিজেকে ব্যস্ত কোরো না, এবং বড়লোকের ব্যাপারেও নিজেকে জড়িও না।"—(ঈশানুসরণ)।

"আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে প্রয়োজন কি?" বড় লোকদের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে নিজের অশান্তি ডেকে এনে কি হবে? প্রভু খৃষ্ট বলেছিলেন, "অপরের চোখের কুটোর কথা না ভেবে, নিজের চোখের কড়ি কাঠটার কথা আগে ভাব।" ৪।৩।৫২

॥ কর্মের পথে ॥

ভাল কাজে ভাল আশা করা যেতে পারে। তবে জয়ের গর্বটা ভুলে যেতে হবে। বেশী ভরসা ভাল নয়, তাতে মনে আসবে কর্তব্যে তাচ্ছিল্য অথবা নিজের সম্বন্ধে গর্ব। উদ্বিগ্নমনে থাকলে সকলকেই আশা ও ভয়ের দোলায় দুলতে হবে—মনের মধ্যে ঘোঁট পাকাবে, ঘুম হবে না। তখন নিজের সব বিশ্বাস এক

কোরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে, "যা দরকার সেইটে আমাকে দিয়ে করাও"—তার পর থেকেই মনে শান্তি ও বল পাবে। আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক তৎপরতা হতে মানুষকে বিরত করে দুটো অবস্থা—পথের পরিশ্রম ও বিপদের ভয়। ৫।৩।৫২

॥ ঊর্ধ্ব গতির উপায় কি ? ॥

সরলতা ও পবিত্রতা দুটী পক্ষ। এই দুটী পক্ষের উপর নির্ভর কোরে অতি ঊর্ধ্ব ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত লাভ হয়। মানুষের সহিত আচার ব্যবহারে থাকবে সরলতা, ঈশ্বর ভজনে থাকবে সরলতা এবং জীব প্রেমে থাকবে পবিত্রতা, সেবায় থাকবে সরলতা ও পবিত্রতা। সরলতা ও পবিত্রতা নিয়ে যখন জগতের যে কোনও দৃশ্যের নিকট উপস্থিত হবে, ওমনি দেখবে তার মায়িক আবরণ অপসারিত হয়ে, তার ভেতর দিযে পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করছেন, সমস্ত জগতের এবং অন্তঃকরণের প্রত্যেক বস্তু এবং বৃত্তি যেন এক বিরাট জ্ঞান-বেদের এক একটী তত্ত্ব, তারা নিজ তত্ত্বের পরিচয় দিচ্ছে। এমন কোন ক্ষুদ্র জঘন্য পদার্থ নেই, যার ভেতর দিয়ে না সেই সচ্চিদানন্দই উঁকি মারছেন। ৬।৩।৫২

॥ "জ্যান্তে মরা" ॥

নির্বাণ কি ?—অহমিকার নির্বাণ! অহমতা মমতার দীপ শিখাটীর চির নির্বাণ! এ হলো নিষিদ্ধ-ভূমি, এখানে গেলে আর কেউ ফেরে না, "হা, হা, কোরে ঝাঁপিয়ে পড়ে", পশ্চাতের সঙ্গীদের দিকে আর ফিরেও তাকায় না। "কালাপাণিতে নৌকা গেলে" আর কি ফেরে ? "নুনের পুঁতুল" প্রথম নির্বাণ শান্তির স্পর্শে কোথায গোলে তলিয়ে যায়, তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। কেবল বুদ্ধ-খৃষ্ট-রামকৃষ্ণেরা এখান হতে ফিরে আসেন। কত অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও এ অভিজ্ঞানটী শ্রীরামকৃষ্ণ কাকেও দিতে চাইতেন না; এ অভিজ্ঞানে নরেন্দ্র-নাথের প্রথমে ভয় হয়েছিল—সমস্ত জগৎটা যেন ভেল্কির মত কোথায় ফন্ ফন্ কোরে ঘুরতে ঘুরতে মিলিয়ে যেতে লাগলো। এ অভিজ্ঞান যাদের হয়েছে, তারা তথ্য প্রকাশ করতে পারে না, আনন্দে জীর্ণ হয়ে পড়ে থাকে, এদেরই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "জ্যান্তে মরা"। ৭।৩।৫২

।। জীব-দুঃখ-কাতরতা ।।

মহাপুরুষে জীবদুঃখ-কাতরতা থাকে কেন ?—শ্রীশ্রীঠাকুর পার্থিব সকল বন্ধন ছেদন করলেন, কিন্তু স্বজাতির দুঃখ-বেদনার অশ্রুমাখা কাহিনীগুলি তিনি এত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন কেন ? তাদের কিছু বোঝা লাঘবের জন্য তাঁর এই প্রাণপণ অক্ষুণ্ণ চেষ্টা ছিল কেন ? বলতেন, "নারকোলের ফোঁপল শুকিয়ে গেলে খোল থেকে আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু একটা না একটা জায়গায় একটু খোলের সঙ্গে লেগে থাকে।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শরীরসম্বন্ধ রেখেছিলেন, মাত্র ঐ জীব-দুঃখ-কাতরতায়। ঐ জীব-দুঃখ-কাতরতাই তাঁর মনুষ্য লীলার বীজ-শক্তি। তিনি এ বীজ-শক্তি দগ্ধ করতে সম্পূর্ণ সমর্থ হলেও কেন জানি না ওটা তিনি বরাবর রক্ষা কোরে চলেছিলেন। তিনি যে নিস্তল, নিঃসীম সমুদ্র—প্রেমের, কৃপার, করুণার। ৮।৩।৫২

।। আত্ম-জ্যোতিঃ ।।

গুরু। দিবা ও রাত্রিতে বস্তু-প্রকাশক জ্যোতিঃটী কি ?

শিষ্য। সূর্য ও চন্দ্র।

গুরু। সূর্য ও চন্দ্র কোন্ জ্যোতিঃকে আশ্রয় করে ?

শিষ্য। চক্ষু।

গুরু। চক্ষু মুদ্রিত কোরে কোন্ জ্যোতিঃতে বৃত্তির দর্শন হয় ?

শিষ্য। বুদ্ধি।

গুরু। বুদ্ধির দর্শন বিষয়ে কোন জ্যোতিঃ মূল ?

শিষ্য। আত্মজ্যোতিঃ। "অতো ভবান্ পরমেকং জ্যোতিস্তদস্মি প্রভো !"

অতএব আপনি সেই পরমজ্যোতিঃ আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম। হেপ্রভো ! আমিও সেই পরমজ্যোতিঃ স্বরূপ।—(এক শ্লোকী)—শ্রীশঙ্কর॥

"বিশোক আনন্দময়ো বিপশ্চিৎ, স্বয়ং কুতশ্চিন্ন বিভেতি কশ্চিৎ।
নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্ত্যৈ, বিনা স্বতত্ত্বাবগমং সুসূক্ষ্মম্॥
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মম্, অন্তর্বহিঃশূন্যমনন্যমাত্মনঃ।
বিজ্ঞায় সম্যক্ নিজতত্ত্বমেতৎ, পুমান্ বিপাপ্‌মা বিরজো বিমৃত্যুঃ॥"

বিশোক আনন্দময় বিদ্বান স্বয়ং কাহাকেও ভয় করেন না বা কোথা হতেও ভয় পান না। অতিসূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব অবগতি ছাড়া ভববন্ধন মুক্তির আর কোনও পন্থা নেই। নিত্য বিভু সর্বগত অতিসূক্ষ্ম অন্তর ও বহিঃ শূন্য নিজ আত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হয়ে পুরুষ পাপ রহিত, রজোরহিত ও মৃত্যুশূন্য হন।—(কেবলোঽহম্)—শ্রীশঙ্কর॥ ৯।৩।৫২

॥ আত্মরতি ॥

স্থান বদলে কি হবে, মন বদলাও। তুমি যত বড়ই হও বা যত লোকেরই সাহায্য গ্রহণ কর, ততদিন তোমাকে অশান্তি ভোগ করতে হবেই, যতক্ষণ না তুমি আত্মতত্ত্বের দিকে না তাকাবে। যত চেষ্টাই কর, দেখবে জগতের ঘটনাবলী ঠিক তোমার মনের মত কখনও ঘটবে না বা আসবে না, যতদিন তুমি স্বীয় আত্মার মহিমায় সন্তুষ্ট না থাকবে বা শ্রীভগবানে একান্ত নির্ভরশীল না হবে। অতি গরীব এবং নিরীহ কি কোরে আনন্দে জীবন ধারণ করে বল দেখি? পশু সম্পদকে তারা হাস্যমুখে, পদাঘাত করে কি কোরে? কারণ তারা হৃদয়ের অন্তর্নিহিত দৈবী সম্পদের সন্ধান পেয়েছে। ধনরত্ন, প্রভুত্ব, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা, অনুগ্রহ, নিগ্রহ তাদের কাছে কিছুই নয়। ১০।৩।৫২

॥ পথ চলা ॥

সত্যিকার ভক্ত যারা, তারা সত্যকে ধরে পথ চলে, অপমান, লজ্জা, ভয় তারা গ্রাহ্যই করে না। তারা চলেছে তপস্যার ক্রুশটী কাঁধে কোরে আত্মবলিদানের শ্মশানে, সেখানে তাদের এই জড়ের খোল ত্যাগ করতে হবে এবং তার পরিবর্তে পাবে দিব্য শরীর। অপমান লাঞ্ছনারূপ কাঁটার মুকুট হতে আনন্দের রক্ত-আবির তাদের ঝরে পড়ে, তারা চলেছে দুঃখের পথ ধরে গঞ্জনার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতার অভিব্যক্তির দিকে! সামনে তাদের আদর্শ—বুদ্ধের দুঃখ, খৃষ্টের ক্রুশ, শ্রীরামকৃষ্ণের পরাপরাধ গ্রহণ-জন্য ব্যাধি-যন্ত্রণার দৃশ্যশ্রেণী! চিত্তে তাদের অমিত বল, অনমনীয় বীর্য—"আগুয়ান সিন্ধুরোল গান অশ্রুজল পান প্রাণপণ যাক কায়া।" ১১।৩।৫২

॥ 'মা' মন্ত্রার্থ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত মায়ের মন্ত্রার্থ—'আমার মা সেই পরমপুরুষ হতে ভিন্ন নয়। তিনি একই সঙ্গে এক এবং বহু, আবার এক ও বহুকেও অতিক্রম করে রয়েছেন। আমার মা বিশ্বের জননী, তিনিই বেদান্ত-বর্ণিত ব্রহ্মবস্তু, তিনিই উপনিষদের আত্মা, তিনিই সেই ব্রহ্মমায়া যিনি অখণ্ডে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন; ভাল এবং মন্দ দুই সমভাবে তাঁর আদেশ পালন করে। কর্মের পদ্ধতি ও নিয়ম আছে, কিন্তু মা-ই সেই পদ্ধতি ও নিয়মের উপায ও নিয়তি। তিনি নিযম ভাঙেন ও গড়েন, তিনি লাল জবার গাছে রাতারাতি সাদা জবা ফোটান। ভাল ও মন্দ কর্মের নিযন্ত্রী তিনিই। তিনি পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করান, আবার পঙ্কে করীকে আবদ্ধ করেন। তিনিই পরমসত্তা দান করেন। তাঁর কাছ হতে পালাবার জো নেই, তিনি ইচ্ছা করলে নিবাণের সমীপবর্তী হতেও জীবকে নীচেয় টেনে নামিয়ে রাখতে পাবেন।' ১২।৩।৫২

॥ সমাধি ॥

এই যা কিছু জীবজগতে দৃশ্য, তাব হলো সত্তা, প্রকাশ, আনন্দ, রূপ ও নাম—এই পাঁচটী অংশ। প্রথম তিনটী ব্রহ্মের স্বরূপ এবং দ্বিতীয দুটী জগতের স্বরূপ। আকাশাদি ভূত, দেবতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জাতিতে সচ্চিদানন্দ অভিন্ন, কিন্তু নাম ও রূপের ভেদ আছে। এখন প্রত্যেকেব কর্তব্য, সচ্চিদানন্দ বস্তুতে চিত্তকে একাগ্র এবং নামরূপকে সর্বদা উপেক্ষা এবং ভিতরে ও বাহিরে সর্বদা এই সচ্চিদানন্দেই সমাধি করা। সমাধি দুপ্রকার—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। সবিকল্প সমাধি আবার দুপ্রকার—দৃশ্যানুবিদ্ধ ও শব্দানুবিদ্ধ। কামাদি চিত্তবৃত্তি বা আকাশাদি যাবতীয বাহ্য দৃশ্য পদার্থের সাক্ষিরূপে চৈতন্যে মনকে সমাহিত করার নাম দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি; এবং আমি অসঙ্গ সচ্চিদানন্দ, স্বয়ং প্রকাশ, দ্বৈতরহিত এইরূপ আত্মভাবনাদ্বারা চিত্তলযের নাম শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি। আর সর্ববিকল্প-রহিত চিত্তস্থিতি নির্বিকল্প সমাধি। এখানে চিত্ত ও আত্মায় ভেদ করা যায় না।—(বাক্যসুধা)—শ্রীশঙ্কর॥ ১৩।৩।৫২

॥ মণিরত্নমালা ॥

"কি জানলে আর জানার কিছু থাকে না?—শিবপ্রসাদাৎ সুখবোধরূপম্।

"সংসারে কোন্ বস্তু দুর্লভ?—সদ্‌গুরু, সৎসঙ্গ ও ব্রহ্মবিচার।

"ঠিক্ ঠিক্ ত্যাগ কখন হয়?—সর্বত্র যখন সচ্চিদানন্দের স্ফূর্তি হয়, তখন সর্বনামরূপ ত্যাগ হয়।

"পশু অপেক্ষা পশু কে?—শাস্ত্র দ্বারা যার আত্মজ্ঞান হয় না।

"কোন্ বিষ সুখ সদৃশ?—কাম।

"বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল কি?—ধন, যৌবন ও আয়ু।"—শ্রীশঙ্কর॥ ১৪।৩।৫২

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত লক্ষণ ॥

হৃদয়ে বল, বাহুতে শক্তি, মস্তিষ্কে সদাই নূতন সত্যের দাবী, অসত্যের নিন্দা—এই সব হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণপদানুগদের লক্ষণ। চালাকিকে প্রকাশ কোরে দেওয়া, পাপকে নিরোধ করা, সত্যের অনুসন্ধান, অন্তরতম দৃষ্টি—এই সব হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণপদানুগদের লক্ষণ। গোঁড়ামীর প্রাচীর ভেঙে দেওয়া, দৃষ্টিকে অনন্ত প্রসারী করা, মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়া—এই সব হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণপদানুগদের লক্ষণ। প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় জ্ঞানী, নূতন তথ্যের গ্রহণ ধারণে পটুতা, শিশুর মত সরল ও বিশ্বাসী, নিরীহ, দয়ালু, ভদ্র—এই সব হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণপদানুগদের লক্ষণ। চক্ষে মোহিনী শক্তি, হৃদয়ে কল্যাণ ইচ্ছা, কামকাঞ্চনে অনাসক্তি, অসূয়াহীনতা—এই সব শ্রীরামকৃষ্ণপদানুগদের কার্যে, বাক্যে, ও চিন্তায় প্রকাশ পায়। ১৫।৩।৫২

॥ আদর্শ ॥

কোন মূর্তি বা পুস্তকই আমার আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না; একটা মস্ত অশান্ত ভাব আসে, কি করব ভেবে পাই না। স্বামিজী বলেন, "জীবনে এ সব প্রতীক ও প্রস্তাবনা একটার পর একটা আসবে, কিন্তু তাই বলে

ভেতরের আদর্শ তার ওপর প্রক্ষেপ কোরে একটা ব্যবস্থা নিয়ে তৃপ্ত হওয়া চলে না।" "প্রেম সিন্ধু হৃদে বিদ্যমান"—এমন কি ঠাকুরের নির্বিকল্পের পথে মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মহত্তর সত্যে গেলেই বোঝা যায় যে পূর্বের সত্যটা অল্প, কিন্তু অধিকতর সত্য প্রকাশিত হবার একটা অপরিত্যজ্য অবস্থা মাত্র। সেটা ক্রমেই মিলিয়ে যেতে থাকে এবং অগ্রবর্তী সত্য ধীরে ধীরে জীবন্ত ও পরিস্ফুট হয়ে জীবনকে অধিকতর বিকশিত কোরে তোলে। ১৬।৩।৫২

॥ গার্হস্থ্য ধর্ম ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, ব্রহ্মচর্যকে ভিত্তি কোরে যদি শান্তস্বরূপকে জীবনে উপলব্ধি না করা যায়, তাহলে গার্হস্থ্য-জীবনে শিবস্বরূপকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। ব্রহ্মচর্যহীন গার্হস্থ্য-জীবন অকল্যাণকর। সংসারে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করতে গেলে স্বার্থবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাহত করা চাই। তখন মানুষ, মিলনের ধর্ম যে কিরূপ নির্মল ও আত্মবিসর্জনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত তা বুঝতে পারে। এই তত্ত্বটী সম্পূর্ণ বোঝা হলে তখন যিনি অদ্বৈতম্, যিনি ঐক্যরূপী পরমাত্মা, তাঁর সহিত নির্বাধা-মিলন সম্ভবপর হয়। যে জীবনের প্রারম্ভে সত্য, মধ্যে মঙ্গল এবং পরিণামে আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই জীবনই সার্থক। সার্থক জীবনের প্রথম পরিচয় জ্ঞানে, পরে কর্মে এবং তৎপরে প্রেমে, ধ্যানে, আনন্দে। তাই কবি ধ্যানের মন্ত্র বলছেন, "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্", এবং প্রার্থনা মন্ত্র "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।" ১৭।৩।৫২

॥ সেবা ও সেবক ॥

স্বামী শিবানন্দ একবার রোমাঁরোলাঁকে লেখেন, 'মানুষের মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন, তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর সেবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব-ব্যাপী দুঃখ বেদনা সম্পর্কে চেতনা বোধ থাকা, এ দুয়ের মধ্যে আপনি একটী পার্থক্য কল্পনা করেছেন বোধ হয়। আমার মনে হয় ও একই বুদ্ধিবৃত্তির দুটো দিক ছাড়া আর কিছু নয়, ওদের ভাগ কোরে দুটো পৃথক

মানসিক অবস্থা বলা চলে না। মানুষের মধ্যে যে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ সত্তা রয়েছেন, কেবল তাঁকে উপলব্ধি করেই মানবের দুঃখ বেদনার গভীরতাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব। কারণ, তা না হলে মানুষের বুদ্ধির দাসত্ব, অপূর্ণতা এবং দিব্যানন্দের অভাব আমাদের বিবেকচেতনার নিকট এমন সুস্পষ্টরূপে কখন স্পর্শ গোচর হোত না। মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব ও বর্তমান অজ্ঞতা এবং অজ্ঞান প্রসূত দুঃখ বেদনার মর্মান্তিক তুলনামূলক পার্থক্যই মানুষের সেবার জন্য আমাদের প্রণোদিত করে। ১৮।৩।৫২

॥ আরম্ভ ও সমাপ্তি ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন যে, আমাদের শাস্ত্রের বিধান—প্রথম ব্রহ্মচর্য তারপর গার্হস্থ্য—প্রথম শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুতি তারপর কর্মজীবনে পরিপক্বতা—প্রথমে শান্তম্ তারপর শিবম্, তারপর অদ্বৈতম্। এই অদ্বৈতেই সমাপ্তি—শিক্ষাতেও নয়, কর্মেও নয়। শেখার কি প্রয়োজন, পরিশ্রমেরই বা মূল্য কী?—তাদের পরিণাম কোথায়? পরিণাম অদ্বৈতে, যা নিরবচ্ছিন্ন প্রেম. নির্বিকার আনন্দ। মঙ্গলের সাধনায় যখন কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়, অহংকারের প্রাখর্য ক্ষীণ হয়, যখন আত্মপর সমস্ত বন্ধন ঘুচে যায়, তখনই নম্রতা, ক্ষমা, করুণা প্রেমের পথ প্রস্তুত করে; তখনই অদ্বৈতম্, তখনই সর্বসাধনার সিদ্ধি এবং সর্বকর্মের অবসান। ১৯।৩।৫২

॥ আনন্দম্ ॥

হে স্বার্থকেন্দ্রিক জীব! ক্ষুদ্র অহমিকার গণ্ডি ভাঙ। উর্ধ্ব অধঃ যে আনন্দ সমুদ্রে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাকে তোমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বইয়ে দাও—"অন্তর্বহিঃ যদি হরিঃ"—সব আনন্দময় হয়ে যাবে—অন্তর বহিঃ সেই আনন্দে পূর্ণ—"ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্মপুরস্তাৎ"—আনন্দ হতে এই সৃষ্টি, আনন্দে এর বিলয়, এই আনন্দকে প্রাপ্ত হলে আর "ন বিভেতি কুতশ্চনঃ" আনন্দ নিয়ে জাগ্রত হও, আনন্দকে জেনে কর্ম কর, আনন্দেই বিশ্রাম লভ, আনন্দে কর আত্মসমর্পণ। সেই ব্রহ্ম শিবস্বরূপ, "আনন্দরূপামৃতম্"। যাঁকে জানলে, "অভয়ং বৈ জনক"।

"সম্পদে সংকটে থাকো কল্যাণে
থাকো আনন্দে নিন্দা অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাকো আনন্দে
চির অমৃত নির্ঝরে শান্তি রসপানে ॥"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥ ২০।৩।৫২

॥ ভক্ত সঙ্গে মেশা ॥

"মৌমাছিকে তোমার মনের মধু খেতে দাও, কিন্তু সাবধান, যেন তারা তোমার ভাব-পদ্মের সৌন্দর্য-কোরকে আবদ্ধ না হয়ে পড়ে।" ভক্তদের ভাব ও আদর্শের বাণী শোনাবে, কিন্তু তাদের ক্রীতদাস করবার জন্য নয়। প্রভু বলেছিলেন, 'মা আমার মুখে কোন ধর্মমতের ব্যাখ্যা দিও না, আর অনুষ্ঠানের আদেশ আরও কম দিও।' অনুষ্ঠান দিয়ে কি কখন অনাদি অনন্ত স্বয়ং-জ্যোতিরানন্দ উৎপন্ন করা যায়? ভালবাসা ও আন্তরিকতায় তা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। প্রথমটী অধিবিদ্যা (metaphysics) আর দ্বিতীয়টী ধর্মশাস্ত্র (কর্মকাণ্ড)—এ দিয়ে কি কোরে আপনাকে আপনি পাওয়া যাবে? ঠাকুর তর্ক ভালবাসেন না, কারণ ভগবান বলা-বলি জানা-জানির ঊর্ধ্বে; "আম খেতে হবে, পাতা গুণে কি হবে?" পুনর্জন্ম, অবতার, পৌত্তলিকতার বিবাদ তাঁকে জানলেই সব মিটে যাবে। ২১।৩।৫২

॥ দর্শন ॥

শ্রীশ্রীমার জীবনী আলোচনা হচ্ছে—দর্শন কি রোজ হয়? একদিন মা একজনকে বল্লেন, 'কি বলছ বাবা, রোজ কি কারুর এই রক্ত মাংস শরীর নিয়ে দর্শন হয়? এ কথা ভাবাই ঠিক নয়। রোজ কি কারুর সচ্চিদানন্দের মুখোমুখি দর্শন ঘটে? ঠাকুর বলতেন, "রোজই কার ছিপে আর বড় বড় মাছ পড়ে বলো?" আর ছিপ ফেল্লেই কি তখনই মাছ আসে? চার ফেলে ছিপ হাতে কোরে মনঃ সংযোগ কোরে বসতে হয়। একদিন হয়ত একটা বড় মাছ টোপ গিললো। বেশীর ভাগ দিনই কিছু পড়ে না, হয় তো বা কোন দিন একটা আধটা বেলে পুঁটী পেলে, কিন্তু তাই বলে ছিপ ফেলে পালালে

আর মাছ ধরা হবে না। সাধন ভজন ছাড়তে নেই, ধীরে ধীরে জপ বাড়িয়ে যেতে হয়। ফাতনা নড়বে, দর্শন স্পর্শন সবই হবে।' ২২।৩।৫২

॥ সাধনে ধৈর্য ॥

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা হচ্ছে—একজনকে মা বলছেন, 'অমন অধৈর্য হলে কি হয় বাবা! যা পেয়েছ, তাইতেই লেগে থাকতে হয়। সর্বদা মনে রাখবে, আমার আর কেউ থাক্ আর না থাক্, আমার একজন মা আছেন। ঠাকুরের কথা মনে রেখো। তিনি বলেছেন, "যারা আমার শরণ নেবে তাদের কাছে আমি প্রকাশ হবই।" অন্ততঃ শেষের দিনে তিনি দেখা দেবেনই দেবেন। তিনি বলেছেন, "সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবেন"।'

"চিত্তাৎ সংকল্পপূর্বং সৃজতি
জগদিদং যোগিবন্মায়য়া যঃ,
স্বাত্মন্যেবাদ্বিতীয়ে পরমসুখদৃশি
স্বপ্নবদ্ ভূম্নি নিত্যে।

তস্মৈ তুভ্যং নমঃ শ্রীহরিহরগুরবে, সচ্চিদানন্দমুক্তানন্তাদ্বৈতপ্রতীতে, ন কুরু কিতবতাং পাহি মাং দীনবন্ধো॥"—(গুরুর প্রার্থনা—পঞ্চরত্ন স্তোত্র)। ২৩।৩।৫২

॥ সুখ ও দুঃখ ॥

স্বামিজীর পত্রাবলী পড়া হচ্ছে—ভাল মন্দের বিচার চলেছে। স্বামিজীর মতে, 'আমাদের জীবন নির্ভর করে অপর উদ্ভিদ, প্রাণী বা জীবাণুর মৃত্যুর ওপর। আর—একটা ভুল আমরা প্রতিনিয়তই কোরে থাকি, তা এই যে, ভাল জিনিষটাকে আমরা ক্রমবর্ধমান বলে মনে করি; পক্ষান্তরে মন্দ জিনিষটার পরিমাণ আমরা নির্দিষ্ট বলে ভাবি। তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই যে প্রত্যহ কিছু কিছু কোরে মন্দের ক্ষয় হয়ে এমন একটা সময় আসবে যখন কেবল মাত্র ভালটাই অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু এই অনুমানটা অপসিদ্ধান্ত, কারণ এর হেতু ও দৃষ্টান্ত ভ্রমাত্মক। জগতে যদি ভালটাই কেবল বাড়ে তা হলে এও স্বীকার করতে হবে যে তার সমান্তরালে মন্দটাও বেড়ে চলেছে।

আমার সুখানুভূতিও যত বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে জগতের দুঃখানুভূতিও অতি তিক্ত হয়ে উঠছে। যা অতিসূক্ষ্ম সুখকে জানে, তাই আবার অতিসূক্ষ্ম দুঃখকেও জানিয়ে দেয়। ২৪।৩।৫২

॥ মূলা ও তুলা মায়া ॥

ঈশ্বরমায়া ও জীবমায়া—(মূলা ও তুলা—বাচস্পতি মিশ্র)।—ঈশ্বর যে বস্তুকে সৃজন করেছেন, তা স্বরূপতঃ আবার জীব দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না বটে, তথাপি ঈশ্বর দ্বারা নির্মিত মণি প্রভৃতি বস্তু একভাবে থাকলেও ভোক্তা জীবের বুদ্ধি নানা প্রকার হয় বলে, সে মণি প্রভৃতির ভোগও জীবের নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন কেউ মণি পেয়ে আনন্দিত হয়, কেউ বা ক্রুদ্ধ হলো—আমার জিনিষটা এখানে এলো কি করে?—আর বৈরাগ্যবান্ যাঁরা তাঁদের মণি দর্শনে হর্ষ বা ক্রোধ কিছুই হয় না। তা হলে দেখা যাচ্ছে, এক মণিরূপ আধারে অবস্থিত প্রিয়, অপ্রিয় এবং উপেক্ষ্য—এই তিন আকার—জীব রচিত; আর তিন আকারে সাধারণ ভাবে অবস্থিত যে রূপ (common perception) তাই ঈশ্বর রচিত। ঈশ্বর রচিত মাংসময়ী নারী মূর্তি, এক হলেও জীব বুদ্ধিতে সৃষ্ট পত্নী, পুত্রবধূ, মাতা, কন্যা প্রভৃতি ভাবমূর্তি ভিন্ন ভিন্ন, কারণ বিভিন্ন জীবই একই পদার্থকে ভাবানুযায়ী বিভিন্ন ভাবে দেখে।—(পঞ্চদশী)॥ ২৫।৩।৫২

॥ আমার স্বরূপ ॥

যেমন জল স্বভাবতঃ শীতল হলেও অগ্নির সম্বন্ধে উষ্ম হয়ে থাকে, সেইরূপ বুদ্ধির সহিত মিথ্যা তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বশতঃ আত্মার কর্তৃত্ব প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক আত্মা অকর্তা। যেমন জলবিন্দুর দ্বারা আকাশ সিক্ত হয় না এবং শুষ্কও হয় না, সেইরূপ আত্মা গঙ্গাজলের দ্বারা শুদ্ধ হয় না, কারণ আত্মা নিত্য শুদ্ধ। যেমন বৃক্ষে জাত ফল সমূহের দ্বারা বৃক্ষের কোন তৃপ্তি লাভ হয় না, সেইরূপ আমাতে আরোপিত অন্নপানাদির দ্বারা আমার কোনও তৃপ্তি হয় না। স্থাণুতে যে চোরের কল্পনা করা হয় তা কখন তার স্বরূপের বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। সেইরূপ আমাতে কল্পিত পাপপুণ্যাদি আমার স্বরূপের কখনও বাধা সৃষ্টি করেনি, করছে না বা ভবিষ্যতে করবেও না। এ সব পঞ্চদশীকারের মত। ২৬।৩।৫২

॥ আত্মা প্রিয়তম ॥

যে কোন আনন্দ হোক, আত্মানন্দকে অপেক্ষা করে। আত্মানন্দ যদি লাভ না হয় তো অপরানন্দ মূল্যহীন। সেই জন্য আত্মা প্রিয়তম। সেই আত্মার প্রিয় সাধন অপর যা কিছু করে, তারাও প্রিয়তম আত্মার প্রিয়। আর বাকি জগৎ হয় উপেক্ষ্য, যেমন পথিমধ্যস্থ তৃণ উপেক্ষ্য ; অথবা পথিমধ্যস্থ ব্যাঘ্র চৌরাদি দ্বেষ্য। আবার প্রিয়তম, প্রিয়, দ্বেষ্য ও উপেক্ষ্যের কোন নিয়ম নেই—যেমন অজ্ঞানী আত্মহত্যা করতে চায়। অনাত্মবস্তু কামকাঞ্চন— কখন প্রিয় কখন অপ্রিয় হয়। একটী বিড়াল কখন দ্বেষ্য, কখনও উপেক্ষ্য আবার পালন করলে প্রিয় হয়। পথিমধ্যস্থ তৃণ উপেক্ষ্য, কিন্তু পশু খাদ্যা-ন্বেষণার্থীর নিকট প্রিয়। অর্থাৎ ব্যবহারের উপর প্রিয়তমত্ব, প্রিয়ত্ব, দ্বেষ্যত্ব বা উপেক্ষ্যত্ব নির্ভর করে। এ সব ধর্ম কখন সমনিয়ত হতে পারে না। এ সব পঞ্চদশীকারের অভিজ্ঞান। ২৭।৩।৫২

॥ আত্মা প্রিয়তম ॥

চুম্বনরত পিতার শ্মশ্রুর দ্বারা পীড়িত সন্তান ক্রন্দন করে, তথাপি পিতা চুম্বনে বিরত হন না ; কারণ তাতে পিতার আত্মা প্রীত হয়, পুত্র প্রীত হয় না। মণি মাণিক্যের নিজের প্রীতি নেই। মানুষ তাকে যত্নে রক্ষা করে নিজের প্রীতির জন্য, রত্নকে প্রীত করবার জন্য নয়। বৃষ ভার বহন কোরে নিজে প্রীত হয় না, বণিকের প্রীতি সম্পাদন করে, সেই জন্য বৃষ বণিকের প্রিয়। বৃষের প্রতি বণিকের প্রিয়ত্ব নিজ প্রয়োজনে, বৃষের তাতে পরিশ্রম ছাড়া আর কি লাভ হলো। ব্রাহ্মণত্বের দ্বারা ব্রাহ্মণ পূজনীয় হয়ে প্রীতি লাভ করে, ক্ষত্রিয়ত্বের দ্বারা ক্ষত্রিয় রাজাসনে বোসে প্রীত হয়, জড় ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব তাতে প্রীত হয় না। সেই জন্য বুঝতে হবে সবই আত্মার প্রীতির জন্য, কারণ আমাদের আত্মা স্বভাবতঃ প্রিয়তম। (পঃ দঃ ॥ ২৮।৩।৫২

॥ বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি ॥

বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এ তিনটী পরস্পর সহায়ক, কখন একাধারে থাকে, কখন প্রতিবন্ধক হেতু বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে। বিষয়ে দোষদৃষ্টি বৈরাগ্যের

অসাধারণ কারণ বা হেতু, বিষয় পরিত্যাগ ইচ্ছাই বৈরাগ্যের স্বরূপ, বিষয়ে অদীনতা, পুনর্গ্রহণেচ্ছার অভাব হলো বৈরাগ্যের বিলক্ষণ বা অসাধারণ ফল। শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসন জ্ঞানের অসাধারণ কারণ; কূটস্থ তত্ত্ব এবং মিথ্যা অহংকার বিবেচন-জ্ঞানের স্বরূপ, এবং নিবৃত্ত-হৃদয়গ্রন্থির অমুদয় অর্থাৎ আর না ওঠা, জ্ঞানের কার্য। যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্প সমাধি—এই আট যোগাঙ্গ উপরতির হেতু। আর সমাধি অভ্যাস দ্বারা প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিরূপ যে পঞ্চবৃত্তির নিরোধ, তাই উপরতির স্বরূপ এবং লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের বিস্মরণ উপরতির ফল।—এ সব পঞ্চদশীকারের মত। ২৯।৩।৫২

॥ পর-ধর্ম-মত সহিষ্ণুতা ॥

কথামৃত পড়া হচ্ছে।—পরমতকে ক্ষমা করা নয়, পরমতে শ্রদ্ধা ও তার আচরণ। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন গাইয়ে রাধিকে গোঁসাইকে বল্লেন, 'আমি বৃন্দাবনে গিয়ে ভেক নিয়েছিলুম। বৈষ্ণবদের যে সব সম্প্রদায় আছে, তাদের প্রত্যেকের সাধন পদ্ধতি কিছু দিন কোরে আচরণ করলুম—তবে শান্তি। আমি সব সাধনই স্বীকার করি, সব রাস্তাই রাস্তা। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তী এখানে যারাই আসে, আমি তাদের সকলকেই সমান চক্ষে দেখি ও সম্মান করি। সেই জন্য সব মত পথের মানুষ এখানে আসে, আর প্রত্যেকেই মনে করে যে আমি তাদের সম্প্রদায়ের লোক। 'আধানিক' ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও আমি সম্মান করি।' বলতেন, 'একটা লোকের একটা আশ্চর্য রঙের গামলা ছিল। লোকে যে রঙের কাপড় ছোপাতে চাইত, সে তাইতে ডুবিয়ে সেই রঙের কোরে দিত। একজন এই সব দেখে আশ্চর্য হয়ে বল্লে,—"আমায় তোমার সেই রঙ দাও যাতে সব রঙ পাওয়া যায়।" ৩০।৩।৫২

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের বদান্যতা ॥

রোম্যাঁ রোলাঁ একটি বিষয়ে ইউরোপীয়দের অতি সুন্দর ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন—ইউরোপীয়রা অনেকে মনে করেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণে আত্মপ্রে ছিল, কিন্তু সাধারণের সেবাকার্য সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ ছিল অস্পষ্ট।

কিন্তু বাস্তবিক তাই কি? তিনি সর্বব্যাপী আত্মাকে জেনেছিলেন, তাঁর প্রেম কি গণ্ডিবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে? তাঁর প্রেমও ছিল সর্বব্যাপী। তিনি তো স্বার্থপর ব্যক্তিগত মোক্ষের অহংকারকে পছন্দ করেন নি—"তুই তো বড় বোকা! আমি ভেবেছিলুম বটগাছের মত তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় নেবে।" ধর্ম সমন্বয় ও সেবার মূলসূত্র অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বটী বের করতেই শ্রীরামকৃষ্ণের শীর্ণ দেহের অলৌকিক শক্তি আর অন্য চিন্তার সময় পেত না। মা কালী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সর্বদা আলুলায়িত কুন্তল দিয়ে জগতের দুঃখ কষ্টকে তাঁর চোখের সামনে থেকে ঢেকে রাখতেন। যখন তাঁর সর্ব সাধনায় সিদ্ধি এলো, তখন মা তাঁকে সমগ্র জগতের সমবেত দুঃখ একেবারে দেখালেন। দেখে তিনি চিৎকার কোরে উঠলেন, "মা আমি হাজার জন্ম নেব।" তিনি অখণ্ড ধ্যানী প্রিয়তম নরঋষিকে আকর্ষণ করলেন, "আমি এসেছি, তুই আয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকেই স্বীয় হৃদয় ও অনুভূতির অধিকারী কোরে গেলেন; তখন বিবেকানন্দের মধ্যে এলো এক সর্বগ্রাসী সহানুভূতি, বেদনা, উৎসাহ ও আবেগময়ী কর্মশক্তি। ৩১।৩।৫২

॥ সাধুর অহিংসা ॥

কথামৃতের আলোচনা চলেছে—বিষয়টা হলো শ্রীরামকৃষ্ণের অহিংসা সম্বন্ধে একটী গল্প।—এক মঠের সাধুরা রোজ ভিক্ষা করতে যেতেন। এক দিন এক সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, এক জমিদার এক গরীব বেচারীকে ঠ্যাঙাচ্ছে। দেখে সন্ন্যাসী বাধা দিতে গেলেন। জমিদার রেগে সন্ন্যাসীকেই একেবারে দুরদাড় কোরে ঠ্যাঙাতে লাগলো—সন্ন্যাসী একেবারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। আশ্রমবাসীরা তিনি আসছেন না দেখে, অনেক খোঁজাখুঁজি কোরে তাঁকে খুঁজে বার করলেন এবং ধরাধরি কোরে আশ্রমে নিয়ে এসে সেবা শুশ্রূষা কোরে তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে নিয়ে এলেন এবং তাঁর মুখে একটু একটু কোরে দুধ দিতে লাগলেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তোমার মুখে দুধ দিচ্ছে, চিনতে পারছ?" সন্ন্যাসী ক্ষীণ-কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হাঁ, খানিক আগে যিনি আমায় মেরেছিলেন।" ১।৪।৫২

॥ সংকীর্ণ ধর্ম ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে—বিষয়টা গোঁড়াদের সম্বন্ধে। —কবি বলছেন যে, একটা বিশেষ গণ্ডি এঁকে, একটা বিশেষ সীমার মধ্যে এরা ধর্মকে কারারুদ্ধ করে রাখতে চায়। তখন ধর্ম হয় কয়েকটা বিশেষ দিনের, কোন একটা বিশেষ স্থানের বা কোন একটা বিশেষ প্রণালীর। তার একটু এদিক ওদিক হলেই মহা হুলুস্থুলু পড়ে যাবে। গোঁড়ারা যেরূপ প্রচণ্ড উৎসাহে স্বরচিত শ্বাসরোধকারী গণ্ডি রক্ষা করার চেষ্টা করে, একটা ঘোরতর বিষয়ীও তার জমির সীমানা অত উৎসাহে অত সতর্কিতভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করে না। তাদের এই গণ্ডি রক্ষাই ধর্ম। তারা বলে, বিজ্ঞান ততক্ষণ সত্য, যতক্ষণ তা তাদের গণ্ডিতে হাত না দেয়। এদের ধর্ম-বৃন্তটী এত দুর্বল যে দক্ষিণে হাওয়ার সুখ-স্পর্শকেও এরা শত্রু বলে জ্ঞান করে। এর কারণ ধর্মের বাস্তবরূপ না থাকা,—ধর্মের আচরণ আছে, কিন্তু সফলতা নেই, অর্থাৎ অন্তরের সত্যজ্ঞানানন্দের অনুভূতি নেই। ২।৪।৫২

॥ প্রেম ॥

“ওঁ সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা।”—নারদভক্তি সূত্র।

“প্রেমিক চায় শুধু প্রেমেতে মিলিতে
প্রেমও ফিরে সদা প্রেমিক সন্ধানে।
প্রেমিকের আকর্ষণে প্রেম ভার-নত
প্রেমোন্মত্তা তারে করে লিপ্সুক সুন্দর।
জেন স্থির প্রেম পূর্বাভাসে হয় বিনিময়
(হে জীব! তারে কি বাসিতে পার ভাল
যদি সে না ভালবাসে তোমা)
যদি সে তড়িল্লেখা হৃদে কভু স্ফুরে
নিঃসন্দেহে জেন, ধরা দেছে প্রেমময়
হৃদিনীলিমায়,—তোমারে বেসেছে সেও ভাল।”

(অনুবাদ)—সুফি জালালুদ্দিন রুমি॥ ৩।৪।৫২

॥ শ্রীগুরু বাক্য ॥

"বিচারনীয়া বেদান্তা বন্দনীয়ো গুরুঃ সদা।
গুরূণাং বচনং পথ্যং দর্শনং সেবনং নৃণাম্ ॥
গুরুর্ব্রহ্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্‌বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা ॥
যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥

সর্বদা বেদান্ত বিচার করা কর্তব্য এবং সর্বদা গুরুর বন্দনা কর্তব্য। গুরুর বচন, দর্শন ও সেবাই জীবের ভবব্যাধির পক্ষে পথ্য। গুরু সাক্ষাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম, মুমুক্ষুগণ কর্তৃক তিনি সর্বদা সেব্য ও বন্দনীয়। কৃতজ্ঞ ও বিবেকীরা এর কখন অন্যথাচরণ করেন না। যতদিন আয়ুঃ থাকবে ততদিন বেদান্ত, গুরু এবং ঈশ্বর—এই তিনের, মন কর্ম এবং বাক্যের দ্বারা বন্দনা কর্তব্য—এ শ্রুতি নিশ্চয়।

"ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥"

—[তত্ত্বোপদেশ—শ্রীশংকর] ॥

অন্তর্ভাবে সর্বদা সর্ববস্তুর সহিত অদ্বৈত চিন্তা করবে, কিন্তু ব্যবহারিক রাজ্যে সর্ব-ক্রিযার সহিত অদ্বৈত ভাবনা করা উচিত নয়। ত্রিলোকের সহিত অদ্বৈত ভাবনা করবে, কিন্তু কদাচ গুরুর সহিত অদ্বৈত ভাবনা করবে না।

"নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে, বিমুক্ত সঙ্গায় সদুত্তমায়।
নিত্যাদ্বয়ানন্দরসস্বরূপিণে, ভূম্নে সদাঽপারদয়াম্বুধাম্নে ॥
যৎকটাক্ষশশি-সান্দ্র-চন্দ্রিকাপীতধূতভবতাপজশ্রমঃ।
প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবানন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ ॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং বিমুক্তোঽহং ভবগ্রাহাৎ।
নিত্যানন্দস্বরূপোঽহং পূর্ণোঽহং তদনুগ্রহাৎ ॥"

—[বিবেকচূড়ামণি—শ্রীশংকর] ॥

হে গুরু! তুমি মহান্ আত্মা, বিমুক্ত সঙ্গ, সদুত্তম, নিত্য, অদ্বয়, আনন্দ-রসস্বরূপ, ভূমা, সদা অপার দয়াম্বুধাম, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার! যাঁর কটাক্ষশশী নিবিড়-চন্দ্রিকা পান কোরে আমি ভবতাপজশ্রম অপগত হয়ে

ক্ষণকালমধ্যে অখণ্ড বৈভবানন্দ অক্ষয় আত্মপদ প্রাপ্ত হলাম, তাঁকে নমস্কার, নমস্কার! আমি ধন্য, আমি কৃতকৃত্য, আমি ভবগ্রাহ হতে বিমুক্ত, আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, আমি পূর্ণ, তোমার অনুগ্রহেই। তোমাকে নমস্কার! তোমাকে নমস্কার! ৪।৪।৫২

॥ সমষ্টি মুক্তি বা একজীববাদ ॥

স্বামিজী একখানি চিঠিতে লিখছেন—'জীব-সমষ্টিকে নিয়েই ঈশ্বর; অথচ মানবদেহের প্রত্যেক কোষের একটা স্বাতন্ত্র্য থাকলেও দেহ যেমন এক, ঠিক তেমনি ঈশ্বরও একজন ব্যক্তি। সমষ্টি—ঈশ্বর; ব্যষ্টি—জীব। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জীব-সাপেক্ষ, ঠিক যেমন দেহটী কোষ-সাপেক্ষ; অথবা কথাটা উল্টিয়ে বলা চলে যে, জীবের অস্তিত্ব ঈশ্বর-সাপেক্ষ। জীব ও ঈশ্বরের সত্তা সমনিয়ত—যতক্ষণ একজন আছেন, ততক্ষণ অপরকেও থাকতেই হবে। ব্রহ্ম এই উভয়ের অতীত এবং উহা কোন অবস্থা বিশেষ নয়। উহাই একমাত্র অদ্বৈত বস্তু যা সংমিশ্রণ সংভূত নয়। এই সর্বব্যাপী তত্ত্বই দেহ-কোষ থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত সর্বত্র অনুস্যূত এবং একে বাদ দিয়ে কেউ থাকতে পারে না। যা কিছু সত্য তা এই ব্রহ্মতত্ত্ব ভিন্ন আর কিছু নয়।' ৫।৪।৫২

॥ ব্যক্তিত্ব ॥

আমরা যদি ঈশ্বরের সহিত এক হই, তা হলে কি আমাদের ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই?—স্বামিজী একবার একজনকে লেখেন,—থাকবে না কেন? সে ব্যক্তিত্ব ভগবান স্বয়ং। এখন যে 'ব্যক্তিত্ব' 'ব্যক্তিত্ব' করছ, এটা তোমার আসল ব্যক্তিত্ব নয়; তোমার প্রকৃতি তোমাকে তোমার আসল ব্যক্তিত্বে নিয়ে যাবার সর্বদাই প্রযত্ন করছে। ব্যক্তি মানে কি? যাতে এমন একটা বিশেষ ধর্ম আছে, যা অন্যেতে নেই। কাজে কাজেই ব্যক্তি কখন বিভাজ্য নয়। (যেমন পরমাণু; নৈয়ায়িকেরা বলে যে প্রতি অবিভাজ্য পরমাণুর একটী বিশেষ ধর্ম আছে)। কিন্তু তোমার বর্তমান ব্যক্তিত্ব তো ক্ষণে ক্ষণে পালটাচ্ছে, এই এক রকম হাব-ভাব আচার-ব্যবহার, পরক্ষণে আবার অন্যরূপ; কাজেকাজেই এ ব্যক্তিত্ব যে সেই অপরিবর্তনীয় ব্যক্তিত্ব, তা কখনও বলা চলে না। এ ব্যক্তিত্ব যদি

সত্য হোত তা হলে তো সব পণ্ড,—চোর চোরই থেকে যেত, মূর্খ-মূর্খই থেকে যেত। ৬।৪।৫২

।। কর্মী কারা ।।

স্বামিজী একজনকে লিখছেন,—'শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্', 'রাই কুড়িয়ে বেল'। যখন বড় কাজ আরম্ভ হয়, ভিত্তি স্থাপন হয়, রাস্তা তৈরী হয়, যখন অমানুষিক বলের দরকার হয়, তখন নিঃশব্দে দু একজন অসাধারণ পুরুষ নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে নিঃসাড়ে কাজ করে। যখন হাজার হাজার লোকের উপকার হয়, ঢাক ঢোল বেজে ওঠে, দেশশুদ্ধু লোকে বাহবা দেয়, তখন কল চলে গেছে, তখন একটা বালকেও কাজ চালাতে পারে, একটা আহাম্মকও কলে একটু তেল দিতে পারে। এইটী বোঝ—ঐ দুই একটী গাঁয়ের ওপর ঐ গোটাকযেক অনাথ বালক নিয়ে অনাথ আশ্রম—ঐ জনদশ কুড়ি কর্মীই যথেষ্ট—ঐ হলো মহৎ কাজের বজ্রবীজ! ঐ থেকে কালে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হবে; এখন দু দশটা সিংহের প্রয়োজন—তখন শত শত শৃগালেরাও উত্তম কাজ করতে পারবে। ৭।৪।৫২

।। পাপ ও পাপী ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ, 'আমি পাপী', 'আমি পাপী' করাটা পছন্দ করতেন না। স্বামিজী বলতেন, "ঐরূপ বোধটা আধ্যাত্মিকতার একেবারে নীচেকার কথা।" তুমি চুরি করনি, ব্যভিচার করনি—এ বলে সভ্য সমাজে তুমি কি সম্মান নিতে চাও?—এ তো ভদ্র সন্তান মাত্রই স্বীকার করে। চিরদিন নিজেকে 'পাপী' 'পাপী' ভাবলে সেই পাপসংস্কার চিত্তে বদ্ধমূল হয়ে যায়। তার চাইতে বলা ভাল নয় কি যে 'আমি শুদ্ধ', 'আমি মুক্ত স্বভাব', 'আমি সচ্চিদানন্দময়ীর সন্তান', 'আমার আবার পাপ কি?' যদিই বা ধুলো ময়লা খেলতে গিয়ে লাগে, নিশ্চয়ই মা এসে ঝেড়ে মুছে ঘরে নিয়ে যাবেন; ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে? বরং যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক তার চেষ্টা কর। বন্ধনটা যেমন মনের, মুক্তিও তেমন মনের। বিশুদ্ধ আত্মায় বন্ধনও নেই, মুক্তিও নেই। ৮।৪।৫২

॥ পুরুষার্থ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্" আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তা অকল্যাণকর এবং যাতে তার শীঘ্র নাশ হয়, তাই করা উচিত। যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবের স্বাধীনতা বৃদ্ধি হয়, তারই নাম প্রকৃত সাহায্য। স্বার্থান্ধ হয়ে কখনও একথা বলা উচিত নয় যে ঐ ব্যক্তি, দল বা জাতি শিক্ষা ও কর্মে উন্নত হলে আমরা অত্যাচারিত হব। এইরূপ আশংকা পাপী ও অত্যাচারীর লক্ষণ। ৯।৪।৫২

॥ অবতরণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের এক দিব্য-দর্শন—নরঋষিকে আকর্ষণ।—একদিন সমাধিতে দেখলেন, তাঁর মন এক আলোক-বর্ত্মে ক্রমাগত উর্ধ্বে চলেছে। ক্রমে গ্রহ-নক্ষত্র জগৎ পার হলো ; সম্মুখে দুর্বোধ্য ভাবময় চৈতন্য-জগৎ। ক্রমেই পথের দুপাশের দেবদেবীরা ক্ষীণ হয়ে আসছেন, ধীরে ধীরে তাঁরা একেবারে অন্তর্হিত হলেন—সম্মুখে এক সুরকীর কাঁড়ির মত লাল জ্যোতির্মণ্ডল অখণ্ড হতে খণ্ডিত জগৎকে পৃথক কোরে রেখেছে। সে জ্যোতির্মণ্ডল ভেদ কোরে দেখেন এক অরূপ রূপ—দেহগত কিছু নেই, দেশকালের জ্ঞানও অস্পষ্ট হয়ে আসছে—জ্যোতির্ময় দেবদেবীরাও এই ভাবানুভূতির দিকে তাকাতে সাহস করেন না, গলে যাবার অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব হারাবার ভয়ে। সেখানে দেখেন সাতজন ঋষি সমাধিমগ্ন—জ্ঞানে, ত্যাগে, পবিত্রতায় এবং প্রেমে মানুষ তো দূরের কথা, এঁদের সমকক্ষ দেবতারাও নয়। তারপর দেখেন জ্যোতিঃ ঘনীভূতাকারে এক পরম সুন্দর ষোড়শবর্ষীয় শিশু, একজন ঋষিকে আকর্ষণ করছেন, "আমি এসেছি, তুই আয়"। তখন ধীরে ধীরে এক জ্যোতিঃতরঙ্গ ঐ অলৌকিক আকাশ পথে ঐ ঋষির দেহ থেকে নির্গত হয়ে পৃথিবীর দিকে অবতরণ করতে লাগলো। ১০।৪।৫২

॥ আত্ম-পরিচয় ॥

শ্রীশ্রীকথামৃতের আলোচনা হচ্ছে—শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলরাম বাবুর বৈঠক-খানায় বসে ব্যাখ্যা কোরছেন যে, নির্বিকল্প সমাধিতে যা আছে তাই থাকে। সবিকল্প থেকে নির্বিকল্পের অনুমান হয় মাত্র—নির্বিকল্পে অহং বুদ্ধি থাকে না, সেইজন্য সেখান থেকে নেমে এসে, কেউ কিছু বলতে পারে না। আবার ৯ই মে, শনিবার, ১৮৮৫, প্রকাশ করেন, এখানে আর কোন লোক-জন নেই, তা তোমাদের একটা কথা বলি,—যারা ঠিক ঠিক অন্তরের সহিত ভগবান চাইবে, তারা নিশ্চয়ই পাবে। যারা তাঁর জন্য ব্যাকুল এবং সংসারের আর কিছুই চায় না, তারা তাঁকে লাভ করবেই করবে। তার পর নিজের শরীরটাকে দেখিয়ে বলেছিলেন যে, যারা সব এখানকার লোক, তারা সব এসে গেছে, এর পর যারা আসবে, তারা বাইরের। তারা সব আসবে যাবে। মা তাদের বলবেন,—'এই কর, এমনি কোরে তাঁকে ডাক' এই রকম আর কি। একবার এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, 'ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আসে না কেন?—জীবের মন ঈশ্বরের দিকে যায় না কেন?' উত্তরে বলেন, 'তাঁর মায়া তাঁর চাইতে শক্তিশালী।'
১১।৪।৫২

॥ প্রভুর কথার তাৎপর্য ॥

প্রভু বলেন, বাপ মা ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, পাড়াপর্শীর বিষয়ে ভাল-বাসার কথা বোলো না, তাদের তো ভালবাসবেই, শত্রুকেও ভালবাসবে, বিদেশীকেও ভালবাসবে। তবে সন্তান শাসন শাসন নয়, ফোঁস করা রাগ নয়। সর্ব ধর্ম ও মতবাদের উদ্দেশ্য সত্য লাভ, ঝগড়া কোরে কি হবে? কোন্‌টা বেশী ভাল বা মন্দ, কেবল বিচারে কি হবে? কাজে লাগো। সকলেরই উদ্দেশ্য আনন্দ লাভ। সব নদী সমুদ্রে সংগত হবে একদিন, তোমার কর্তব্য ধীরে সেই ব্রহ্ম-সাগরে বয়ে যাওয়া। কারও প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করো না, বরং তাকে সাহায্য কর, আবার নিজেরও গতিপথ প্রস্তুত কর। দেশকাল পাত্রানুসারে, ভূমির উচ্চ নীচতানুযায়ী প্রতি প্রবাহের গতি মন্থর বা দ্রুত, কিন্তু সকলে একদিন মহা-সমুদ্রকে প্রাপ্ত হবেই। সকল প্রবাহই জল প্রবাহ, সকলের স্বরূপ ঐ সমুদ্র—

'এগিয়ে চলো', 'এগিয়ে চলো'—কান পেতে শোন ঐ মহাসমুদ্রের আহ্বান—'হে শাখা সকল! জাহ্নবীকে আশ্রয় কর, শীঘ্র আমাকে প্রাপ্ত হবে।' হে প্রভু! তুমিই সেই সহস্র-ধারা জাহ্নবী! ১২।৪।৫২

।। শান্তি-দাতা ।।

যদিও শ্রীরামকৃষ্ণকে সরল শিশু বলে বোধ হোত, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে কোন কিছু অলক্ষিতে যেতে পারত না। তিনি কখনও বালকের মত ক্রীড়ামোদী আবার কখন বা প্রাজ্ঞের ন্যায় বিচারশীল। তাঁর সঙ্গ ছিল সদা হাস্যময়, স্নেহময় ও মোহনীয়। তিনি অপরের দুঃখের অনুসন্ধান করতেন নিজের শিক্ষার বা অভিজ্ঞানের জন্য নয়, অপরের দুঃখকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ কোরে নেবার অদ্ভুত শক্তি তাঁর ছিল। তবে দুঃখ তাঁর মধ্যে প্রবেশ কোরে বিলয় পেত, তাঁকে অধিকক্ষণ উদ্বেলিত করতে পারত না। এই ভাবে ছিলেন তিনি জীবনের শান্তিদাতা কৃপাময়; তিনি কদমাক্ত মানুষকে ধৌত কোরে, নির্মল কোরে নিতেন, কারণ "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ সাধুরেব স মন্তব্যঃ।" ১৩।৪।৫২

।। দরকারী কথা ।।

মা সুরেন বাবুকে একদিন বলেছিলেন, 'বাড়িতে রুগী থাকলে গেরস্থর পক্ষে, ঠাকুরের জন্য আলাদা তুলে রেখে, রুগীকে খাইয়ে দেওয়া যায়, মনে করতে হয়, যেন তিনি প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

'জগতের দুঃখের কথা আর কি বলব! আমাকে দেখে শেখ, কেমন কোরে আছি, ঠাকুর আমাকে যেমন কোরে থাকতে বলেছেন, ঠিক তেমনি কোরে আছি। দেখছ না, কী জীবন কাটাচ্ছি এই মেয়েটাকে নিয়ে?

'তবু বাবা ভয় কোর না, সর্বদা মনে রেখো ঠাকুর সঙ্গে আছেন, এ সব দুঃখ কষ্টের ভেতর আছ বলে অনাসক্ত থাকতে পেরেছ, নইলে হয়ত জড়িয়ে পড়তে, এও দুঃখের একটা শুভ দিক্।

'যে স্বপ্নে ঠাকুর দর্শন দেন সে স্বপ্ন সত্য। সে স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে নেই, ঠাকুর তাঁকে বলতেও নিষেধ করতেন।' ১৪।৪।৫২

॥ প্রত্যেক পাঁচশো বৎসর ॥

শ্রীবুদ্ধ আসায় জগতে ইতিহাস ও শীল সুরু হলো; তারপর পাঁচশো বছর পরে এলেন খৃষ্ট, নীতি ও ভক্তি নিয়ে। দুজনে সারা পৃথিবী ভাগাভাগি কোরে নিলেন। তারপর পাঁচশো বছর পরে এলেন মহম্মদ, সত্যের অনুসন্ধানে সমস্ত প্রতীক ও সাংবৃতিক নিয়মগুলোকে ভাঙবার জন্য; কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে উপরোক্ত দুজনের চাইতে বিশেষ কিছু বলতে পারেন নি। তারপর পাঁচশো বছর পরে এলেন মার্টিন লুথার—এই প্রটেষ্ট্যাণ্ট তরঙ্গে জগৎ ভেসে গেল—স্বাধীন চিন্তায় মানুষ নবালোক প্রাপ্ত হলো, যুক্তি হয়ে উঠলো প্রধান, যার ফল নব্য-বিজ্ঞান। কিন্তু দুঃখ-নিবৃত্তি বা মুক্তি সম্বন্ধে ইনিও প্রথমোক্ত-দ্বয়কে অতিক্রম করতে পাবেন নি। এটা বিবেকানন্দের পর্যবেক্ষণ। ১৫।৪।৫২

॥ সনাতন ধর্ম—বেদ ॥

মাড়োয়াড়ীরা বিগ্রহ কাঁধে কোরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন যে, হিন্দু ধর্মই সনাতন ধর্ম। এই যে আজকাল নানা সম্প্রদায় দেখা যাচ্ছে এ সব ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে, আবার তাঁর ইচ্ছায় চলে যাবে। এ সব কখন চিরকাল থাকবে না। ঈশ্বরেচ্ছায় হয়েছে বলে, তিনি আধুনিক সম্প্রদায়ের ভক্তদেরও নমস্কার করতেন। তাঁর কথা—হিন্দু ধর্ম চিরকাল ছিল, এবং চিরকাল থাকবে।

হিন্দুর শাস্ত্রকে বেদ বলে। বেদ হলো অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি, যা ঈশ্বর হতে উৎকৃষ্ট মানবে আবির্ভূত হয়েছে। হিন্দুদের একটী সম্প্রদায়—পূর্ব মীমাংসকেরা, আক্ষরিক বেদেরও নিত্যতা স্বীকার করেন। এই আক্ষরিক-বেদ গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে চলে আসছে। কিন্তু অপর পক্ষ বলেন যে আক্ষরিক-বেদ মনুষ্য-কৃত; কিন্তু তার তত্ত্ব অনাদি অনন্ত—যা ঈশ্বর হতে জীবে আবির্ভূত হয়েছে। ১৬।৪।৫২

॥ মৌনী ॥

"শূন্যে গৃহ নির্মাণ যেমন বৃথা, সেইরূপ অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ অবিকল্প আত্মাতে নানারূপ কল্পনা করাও বিফল। সুতরাং অদ্বয়ানন্দময়-হৃদয়ে পরমাশান্তি লাভ কোরে সর্বদা মৌনভাবে অবস্থান কর। অসৎ কল্পনা ও বিকল্প হেতু বিচলিত

বুদ্ধির উৎপত্তি হয়, ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার মৌনাবলম্বনই সেই বুদ্ধির পক্ষে পরমাশান্তি ; ঐ প্রকার শান্তিতে নিরবচ্ছিন্ন অদ্বয়ানন্দের অনুভূতি হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়েছে এবং যে পরমানন্দ রসপানে তৃপ্ত, প্রব্রজ্যাশ্রম ও মৌনাবলম্বন অপেক্ষা তাঁর পক্ষে পরমানন্দপ্রদ আর কিছু নেই। যে বিদ্বান আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি কি গমন কালে, কি অবস্থান কালে, কি উপবেশন সময়ে, কি শয়নাবস্থায়, কি কার্যানুষ্ঠান কালে—সকল সময়ই নিজ ইচ্ছানুসারে মৌনভাবে অবস্থান করবেন।" (ইতি বিবেকচূড়ামণি—শ্রীশঙ্কর)॥ ১৭।৪।৫২

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ॥

এ বিষয়ে একখানি পত্রে শ্রীবিবেকানন্দের ইঙ্গিত এইরূপ—'শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন একটা মহাসমন্বয়পূর্ণ কাব্য। তাঁর ভক্ত—গৃহস্থ ও সাধুদের মধ্যে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে সেই আদর্শে পূর্ণতা লাভ করতে না পারলেও, তারা এক একজন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের এক এক ভাবের বিকাশ কোরে, এমন একটা সংহতি গোড়ে তুলতে পারে যাতে একঘেয়ে ভাবটা দূর হয়ে যেন সর্ব জীবন মিলে একটা গোটা পূর্ণ জীবন প্রস্ফুটিত হয়। এক ব্যক্তিতে যেটা অভাব, সেটা অপর ব্যক্তির জীবনের দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠুক। এতে ব্যক্তিগত জীবনে সমন্বয় অস্পষ্ট হলেও, সমষ্টিগত জীবনে সমন্বয়টা পরিস্ফুট হয়ে পড়বে। এই প্রাপ্ত সমন্বয়টা, প্রচলিত যাবতীয় একদেশী ধর্মমত হতে একটা সুনিশ্চিত উন্নতির সোপান শ্রেণীতে নির্দিষ্ট—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকবে না। শ্রীভগবান যদিও সর্বভূতে বর্তমান, তথাপি তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মনুষ্য-প্রতীকের মধ্য দিয়ে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর মতো এত উন্নত চরিত্রের ও সমন্বয়ের আদর্শ-প্রতীক কোন কালে কোন মহাপুরুষের মধ্যে আমরা পাই না। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-পদানুগ ভক্তমণ্ডলীর—সাধু ও গৃহস্থদের, তাঁকেই কেন্দ্র স্বরূপে ধরে থাকা উচিত। ১৮।৪।৫২

॥ নেতার নির্বিশেষ প্রেম ॥

স্বামিজী নেতার লক্ষণ নির্দেশ করছেন আর একখানি পত্রে।—অনেকে সব হৃদয় দিয়ে ভালবাসে একজনকে এবং চায় সেইরূপ প্রতিদান। কিন্তু

নেতার মনোযোগ সবটা একটা বিষয়ে দেওয়া চলে না, দিলে তিনি একটা জায়গাতেই আবদ্ধ হয়ে পড়বেন। কর্মে সফলতার জন্য নেতাকে বহুলোকের ভালবাসাকে অর্জন করতে হয়। নেতাকে থাকতে হয় সকলের মধ্যে এবং সকলকে ছাড়িয়ে। একটা বিশিষ্ট পাত্রে সবটা ঢেলে দিলে হিংসা ও কলহে সমস্ত ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু এর মানে এটা নিশ্চয়ই নয় যে নেতা সকলের শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে তাদের পশুর মত কাজে লাগাবেন, আর মনে মনে হাসবেন। কিন্তু তাঁর ভালবাসা হবে "বহুজন-হিতায়, বহুজন-সুখায়"। প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে হবে, কিন্তু মহদুদ্দেশ্যে দরকার হলে হৃদয় উৎপাটিত করতে হবে। সর্ব বস্তুতে আত্মদর্শন না হলে প্রেম হয় না। প্রেমিকের কাছে জড় বলে কিছু নেই, সবই চেতন, তাই তাঁর প্রেমও নির্বিশেষ। ১৯।৪।৫২

॥ লোকব্যবহার ॥

স্বামিজীর কথা আলোচনার দ্বারা আমরা এই তাৎপর্যগুলিতে উপস্থিত হই—সর্বপ্রাণীই ব্রহ্ম স্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্য, তফাৎ হয় কেবল আবরণের ঘনতা এবং তরলতার তারতম্যে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই তত্ত্বটাই সকল ধর্মের ভিত্তি। ভৌতিক, মানসিক বা আত্মিক ভূমির মানবেতিহাসের সার কথা হলো ঐ—আত্মস্বরূপ কখন অধিক প্রকাশ, কখন কম প্রকাশ হচ্ছে।

চরিত্র গঠন সম্বন্ধেও আমাদের কোন বিশেষ নৈতিক মতের পোষকতা নেই ; আমরা কেবল এইটুকু দেখি যে তোমার কার্যের দ্বারা যেন অপরের কিছু ক্ষতি না হয়। যা সত্য প্রকাশের সহায়ক তাই ধর্ম, আর যা তাতে বাধা দেয় তাই অধর্ম।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত, অপর ব্যক্তিকে ঈশ্বরের ছবি বলে দেখা ও ব্যবহার করা। এ শুধু সন্ন্যাসীর কর্তব্য নয়, গৃহীরও। ২০।৪।৫২

॥ ব্যবহারিক স্বাতন্ত্র্য, মঙ্গল ও প্রেম ॥

ব্যবহারিক স্বাতন্ত্র্য, মঙ্গল ও প্রেম।—রবীন্দ্রনাথের ধর্ম শিক্ষার এই তাৎপর্যটী আমাদের জীবনে খুব লক্ষ্য করার জিনিষ—আমাদের ব্যক্তিগত

স্বাতন্ত্র্যকে ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ আহুতি দেবার পূর্বেই যত কিছু দ্বন্দ্ব ; একদিকে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপর দিকে সর্বজনীন প্রেম, একদিকে ক্ষুদ্র শক্তি অপর দিকে বিশাল ত্যাগ। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যেও মঙ্গল এক অপূর্ব চৈত্তিক ও সামাজিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। কারণ এতে প্রতিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও পরস্পরের সহিত ব্যবহারে বেসুর বেজে ওঠে না, যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় মঙ্গল। আত্মকেন্দ্রিক শক্তি ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যকে খুব বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু মঙ্গল স্বাতন্ত্র্যের তীব্রতা হ্রাস কোরে জীবনকে সহনশীল ও সমন্বিত করে এবং প্রেম স্বাতন্ত্র্যকে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে সকলে এবং সকলের অতীতে মিশিয়ে দিতে চায়। এই মিলনের পূর্বেকার দ্বন্দ্বে যদি জীবনের উদ্দেশ্য মঙ্গলময় না হয়, তা হলেই সমষ্টি জীবনে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবেই। ২১।৪।৫২

॥ দুঃখ অনিত্য ॥

চিরকাল কেউ দুঃখ ভোগ করে না। সবই যদি অনিত্য হয়, দুঃখও একদিন চলে যাবে। দুঃখ আসে দেহাসক্তি কমিয়ে আত্মাসক্তি বাড়াবার জন্য। তান্মাত্রিক জগতে আমরা সহজেই তন্মাত্রাসক্ত হয়ে পড়ি, চৈতন্য জগতের কথা ধীরে ধীরে ভুলতে থাকি। ভগবান ভক্তকে সর্বক্ষণই দেখছেন, ছেলের বাড়ী ফিরতে দেরি হলেই মা ঝি চাকর পাঠিয়ে সন্ধান নেন, ডেকে পাঠান, হয়ত বা জোর কোরে ধরে আনেন, খেলার আসক্তিতে ছেলের তখন কত কষ্ট। ছেলে কি জানে বোঝে, মা তাকে তার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আত্মার শান্তি ও বিশ্রাম দেবার জন্য ডাকছেন? মায়ের স্পর্শ যখন পায় সে তখন সংসারের সকল খেলা ভুলে যায়, তখন খেলতে পাঠালেও খেলতে যেতে চায় না। ২২।৪।৫২

॥ জীর্ণমত ॥

গোঁড়াদের মত সম্বন্ধে শ্রীরবীন্দ্রনাথের একটী কথা স্মরণ হয়—দেহের মতো মতও বদলাতে হয়। দেহের যেমন মৃত্যু ঘটে, তার জীর্ণতার শেষ হয়, সেইরূপ পুরাতন মতও জীর্ণ হয়ে শেষে মৃত হয়। দেহও ক্রমাগত বদলাচ্ছে, মতও ক্রমাগত বদলাচ্ছে। দেহ যদি না বদলাতো মানুষ চিরদিনই মাতৃগর্ভে থেকে যেত। ক্রমাগত নূতন আহারের দ্বারা পুরাতন জীর্ণ দেহকে আমরা ত্যাগ কোরে

নূতন দেহে সচ্চিদানন্দকে লাভ করবার চেষ্টা করছি, সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সহিত মতও নূতন নূতন হয়ে আমাদের চিত্তকে শ্রীসম্পন্ন করছে। জীর্ণ দেহ না বদলালে যেমন নবজীবন লাভ করা যায় না, সেইরূপ জীর্ণ মতকে সমাধিত না করলে, নূতন ভাব-সম্পদে চিত্ত কখনও ঐশ্বর্যপূর্ণ হবে না। ২৩।৪।৫২

॥ শ্রীশ্রীমার কথা ॥

৺কাশীতে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যানুভূতি।—একদিন মা ৺কাশীতে থাকতে দেখলেন, নারায়ণ, বৃন্দাবনে শেঠদের মন্দিরে যেমন। পাশে ঠাকুর হাতজোড় কোরে দাঁড়িয়ে। তিনি ভাবলেন, ঠাকুর এখানে কি কোরে এলেন! দেখলেন নারায়ণের গলায় মালা, পা পর্যন্ত ঝুলছে। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাশীতে দেহ রাখলে মুক্তি হয়, রাসবিহারী তা মানে না।' ঠাকুর তাতে বল্লেন, 'সব মানবে। এ সব সত্য।' শ্রীশ্রীনারায়ণ মাকে দুটো কথা বল্লেন, তার মধ্যে একটা, 'ঈশ্বর না মেনে না পেয়ে কেউ কি কখন সত্য লাভ করেছে?' শ্রীশ্রীমাকে পূজ্যপাদ কৃষ্ণলাল মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'নারায়ণের সামনে ঠাকুর হাতজোড় কোরে কেন দাঁড়িয়ে ছিলেন?' তাতে মা বলেন, 'তাঁর কথা ছেড়ে দাও, তাঁর সকলের নিকটই দীন ভাব, ঐ ওঁর বিশেষত্ব—এবার বালকবৎ অবস্থা অবলম্বন কোরে যে লীলা করলেন।' ২৪।৪।৫২

॥ চিন্তা জগৎ ॥

স্বামিজী বলেছেন, বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতি দুটো আলাদা জিনিষ নয়, তারা একই শক্তি, কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন-ক্রিয়। মহামায়া এই উভয়াত্মিকা। জগৎ মানেই যা কিছু স্থির ও গতিশীল। আমরা দুটো বিরাট বিভাগ করি জড় ও প্রাণী; আমরা মনে করি প্রাণ জড় হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাস্তবিক তারা একই প্রকৃতির বিভিন্ন দিক্। আধখানা ক্রমাগত আর আধখানার উপর ক্রিয়াশীল। জড় শব্দ স্পর্শ রূপাদি প্রাণে আঘাত দিচ্ছে। শব্দ স্পর্শ রূপাদিও শক্তিছাড়া আর কি? বাহিরের শক্তিই ভিতরের অবস্থা পরিবর্তনে অনুরূপ গ্রহণ করছে। ইচ্ছারূপে এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়ার

দ্বারা বাহ্য শক্তিকে সে নিজের অনুকূল কোরে নিচ্ছে। এরই নাম চিন্তা জগৎ। ২৫।৪।৫২

॥ "যত মত তত পথ" ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী—আসল কথা হলো, শ্রীভগবান বিভিন্ন অধিকারীর জন্য তাদের ভাবানুযায়ী বিভিন্ন ধর্মের পথ নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন দেশ কালে যে সব মত প্রচারিত হয়েছে, সে সব তাঁতে পৌছবার বিভিন্ন সাধন-মার্গ। কিন্তু সর্বদা মনে রাখা চাই রাস্তাটা স্বয়ং ভগবান নয়, তাঁর রূপায়িত একটা ইচ্ছা। তাঁকে পেতে হলে এই ভগবদিচ্ছাকৃত একটা রাস্তা ধরা চাই, বেশ একান্ত চিত্তে। ধর কোন রাস্তায় একটু গোলমাল আছে, কিন্তু পথিক যদি সরল হয়, তা হলে ভগবান সেগুলো শুধরে নেন। যদি কেউ জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে ভুলে উত্তুরে রাস্তা ধরে, তখন কেউ না কেউ তাকে ঠিক রাস্তা ধরিয়ে দেবে। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এই জন্য সাধন পথে জিজ্ঞাসা চাই। "দুঃখত্রয়াভি-ঘাতাৎ জিজ্ঞাসা"—ত্রিবিধ দুঃখের আঘাত পেয়েপেয়ে জীবের মনে মুক্তি লাভের ইচ্ছা জাগে। শ্রীভগবান আচার্যরূপে তখন মুক্তির উপায় বলে দেন। ঝগড়া বিবাদে কি দরকার?—তিনিই সরূপ, তিনিই অরূপ; আবার রূপা-রূপের পার। 'তাঁর ইতি করা যায় না'। 'চাঁদা মামা সকলেরই মামা'। 'যার পেটে যা সয়'। ২৬।৪।৫২

॥ ঈর্ষা ও দাসজাতি ॥

স্বামিজী একবার বলেন যে, ঈর্ষারূপ পাপ দাসজাতির মধ্যেই স্বভাবতঃ উদ্ভূত হয়, আর ঐ ঈর্ষাই তাদের চিরকাল হীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত কোরে রাখে। তিনি দাসসুলভ মনোবৃত্তির লক্ষণে বলছেন যে, যদি তারা কারও কিছু ভাল শোনে বা দেখে, ওমনি তাদের চিত্ত এমন বিষায়িত হয়ে জ্বলে পুড়ে ওঠে যে তখুনি কোমর বেঁধে লেগে যায় কি কোরে তাকে একেবারে ধ্বংসের দ্বারে পাঠান যায়। তাদের নিজেদের মধ্যে কেউ একজন সাধারণ স্তর হতে একটু মাথা উঁচু কোরে দাঁড়ালেই, তাদের একেবারে অসহ্য হয়ে পড়ে। একজন নিগ্রো নাকি আর একজন স্বজাতির প্রশংসা বা উন্নতিতে একেবারে অসহিষ্ণু

হয়ে পড়ে এবং প্রতিপক্ষদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে নিষ্পেষিত করবার চেষ্টা করে। ২৭।৪।৫২

॥ বিভূতি ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আলোচনা হচ্ছে—বলছেন যে অল্পবুদ্ধিরাই ঐসব বিভূতি টিভূতি খুঁজে বেড়ায়, যেমন—রোগ ভাল করা, মকদ্দমা জেতান, জলের ওপর দিয়ে হাঁটা, এই সব আর কি! কিন্তু যারা শ্রীভগবানের খাঁটী ভক্ত তারা তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি ছাড়া আর কিছু চায় না। একদিন হৃদয় মুখিজ্জে মশায় তাঁকে বল্লেন যে তিনি মা জগদম্বার কাছ থেকে কিছু বিভূতি চেয়ে নিন। তাঁর তো ছেলেপুলের স্বভাব, কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বল্লেন যে হৃদয় তাঁর কাছ থেকে কিছু বিভূতি চেয়ে নিতে বলছে। মা জগদম্বা তাঁকে এমন জিনিষ দেখালেন যে বিভূতিতে তাঁর চিরকালের জন্য ঘৃণা হয়ে গেল। দেখলেন বিভূতি বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যজ্য। তিনি তার পর হৃদয়কে বকৃতে লাগলেন, 'কেন আমাকে বিভূতির কথা বল্লি, তোর জন্য আমাকে এমন জঘন্য দৃশ্য দেখতে হলো।' ২৮।৪।৫২

॥ প্রেম ॥

(রসেটীর—"মেরী ম্যাগডেলেন্" অবলম্বনে—)

তোমরা ছাড়িয়া দাও মোরে!
দেখিছ না প্রিয়তম মুখখানি সম্মুখে আমার
আমারে করিছে আকর্ষণ!
তাহার চরণতরে তৃষ্ণার্ত চুম্বন,
চঞ্চল কুন্তল দাম, নয়নের অশ্রুধারা—
আজি মোর মাগিতেছে সে যে!
উহু—হুঃ! বাক্য কি বর্ণিতে পারে সেই দেশ কাল!
যে দেখিবে মোরে—জড়ায়ে ধরেছি সেই রক্তাক্ত চরণ!
সে যে মোরে চায়, তার প্রয়োজন মোরে।
সকরুণে ডাকিছে আমারে, সে যে মোরে ভালবাসিয়াছে!
তোমরা যাইতে দাও মোরে! ২৯।৪।৫২

।। শান্তি ।।

আগে নিজের মনে শান্তি সৃষ্টি কর, তা হলে অপরকেও শান্তি দিতে পারবে। পণ্ডিতের চাইতে যারা শান্তিময় পুরুষ তারা অপরের অধিক আনন্দ বিধান কোরতে পারে। অসংযতেন্দ্রিয় মন ভালকেও মন্দরূপে দেখে, সব জিনিষের খারাপ দিকটা নেয়। আর শান্তিময় পুরুষ সব জিনিষের মঙ্গলের দিকটাই গ্রহণ করে, কালোটা ভুলে তারা আলোটাই গ্রহণ করে। যাদের হৃদয়ে শান্তি বিরাজিত, তারা হঠাৎ কারুর প্রতি সন্দেহ করে না। অসন্তুষ্ট দেহ মনই কেবল তোলাপাড়া করে, কাকেও বিশ্বাস করে না, সবই তাদের নিকট সন্দেহজনক। নিজেকে তারা শান্ত করবার চেষ্টাও করে না, এবং অপরকেও তারা শান্ত হতে দিতে চায় না। তার জিহ্বা বড় বেসামাল, যা তা বলে বসে, তার জীবনের অতি দরকারী বিষয়েও ভুল কোরে বসে। সে অপরের কর্তব্য সম্বন্ধে খুব হুসিয়ার, কিন্তু তার নিজের কর্তব্যে সর্বদা অবহেলা। ৩০।৪।৫২

।। পরদোষানুসন্ধান ।।

অপরের ভাবনা ভেবে মন চঞ্চল করার তোমার কি প্রয়োজন? নিজের ভাবনা ভাব। অপরে কি করলে না করলে তাতে তোমার কি আসে যায়। তুমি ঠিক্ সত্য পথে আছ কি না দেখ। অমুক লোক এই চরিত্রের, অমুক লোক এইরূপ, তাতে তোমার কি এসে যায়? অপরের হয়ে লড়াই করারই বা কি দরকার? তুমি নিজের দুর্বৃত্তির সঙ্গে লড়াই কর, নিজের বিবেকের নিকট জবাবদিহি হও। যারা সত্য পথে চলে, ভগবান তাদের রক্ষা করেন, তোমার পার্থিব সহায় অতি দুর্বল। যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তোমার ভেতর তিনি সেবার উদ্রেক কোরে দেবেন, তখন তোমার কর্ম ও চিত্ত হবে অবাধিত। তিনি জানেন কে কি চিন্তা করে, কার ভেতরের ইচ্ছা কি, কে কেমন লোক। ১।৫।৫২

।। নাম-মাহাত্ম্য ।।

সমস্ত জগৎটাই শব্দের অর্থ মাত্র। শব্দ ভিন্ন কি কোন অর্থের জ্ঞান হয়? সেই জন্য বর্ণ, যা হচ্ছে শব্দের অঙ্গ, “মাতৃকা” বলে তন্ত্রে পরিচিত। বর্ণ থেকেই

শব্দের অভিব্যক্তি। শব্দ হচ্ছে অনাদি-বর্ণের সহিত অর্থ এবং তার প্রত্যয় হচ্ছে বস্তু। পুনঃ পুনঃ শ্রুতিদ্বারা অর্থাৎ শ্রুত অনিত্য ধ্বনি হতে নিত্যবর্ণ সহযোগে স্ফোটের (eternal ideas) অভিব্যক্তি ঘটে। তার প্রত্যয়টা ক্রমে অস্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। মূল শব্দ বা "Word" হচ্ছেন অনাদি অনন্ত ও পূর্ণ, যার ধ্বনিকে হিন্দুরা বলে ওঁ। নানাবিধ অনিত্য ধ্বনি বা ভাষার মধ্য দিয়ে সেই অনাদি-নিত্য-বর্ণগত স্ফোটের অভিব্যক্তি বা প্রত্যয় ঘটছে, যা হলো এই ব্যক্ত-জগৎ। এক অখণ্ড স্ফোটের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডিত অর্থপ্রত্যয়গুলি তার এক একটা অংশ মাত্র। এই হলো মণ্ডন মিশ্রের মত। এই জন্য হিন্দুরা ভগবৎ নামের ও জপের ওপর এত জোর দেয়। অনিত্য ধ্বনির পৌনঃপুনিকতায় নিত্য বর্ণার্থ সহযোগে বস্তু-প্রত্যয় একদিন হবেই। ২।৫।৫২

॥ দিব্যোন্মাদ ॥

মানুষের মধ্য দিয়েও ভগবানের অভিব্যক্তি ঘটে। মানুষকেই নারায়ণ বলে দেখতে হবে। কাঠ দুটো ঘষলে যেমন আগুন বেরয়, তেমনি ভক্তি দিয়ে গুরু, আচার্য, অবতার মন্থন করলেই তার মধ্য থেকে দপ্ কোরে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হবে। প্রহ্লাদের ভক্তিতে থাম থেকে ভগবান নির্গত হলেন। ভগবানে প্রেম হলে সর্বভূতে তাঁর অনুভূতি হয়। গোপীদের একটা অবস্থায় সর্বভূতে কৃষ্ণ দর্শন হয়েছিল—সমস্ত জগৎ কৃষ্ণে ডুবে রয়েছে। তারা বলতো আমরাই কৃষ্ণ, এ অবস্থাকে বলে দিব্যোন্মাদ—মহাভাবের একটা স্তর। বৃক্ষ দেখে বলেছিল, মুনিরা তপস্যা নিরত। তাদের তৃণ দেখে বোধ হোত যেন কৃষ্ণপাদ স্পর্শে পৃথিবী রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ৩।৫।৫২

॥ চেতনার স্তর ॥

স্বামিজী প্রাণতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে বিভিন্ন লোকের বা 'প্লেনের' একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'মনে কর এই বিশ্বটা যেন একটা বিরাট আকাশ ও প্রাণকণা সমুদ্রে ভাসছে। কেন্দ্র থেকে আরম্ভ কোরে বিভিন্ন দেশ কালের এক একটা বৃত্ত-জুড়ে বিচিত্র স্পন্দ-তরঙ্গ খেলা করছে। বৃত্ত, কেন্দ্রের যত নিকটবর্তী তার স্পন্দ-তরঙ্গ তত ক্ষুদ্র ও শীঘ্র। এ ভাবে আকাশে অনন্ত লোক বা

চেতনার স্তর পর পর বিস্তৃত রয়েছে।' সমস্পন্দ তরঙ্গ বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি চিদাভাস সাহায্যে পরস্পরকে বোঝাতে পারে। কোটী কোটী মাইল আলোক বর্ষ (light years) অপেক্ষাও আরও দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম দেশ কালে বিভিন্ন জগৎ রয়েছে। এক স্পন্দবিশিষ্ট লোকে আর এক স্পন্দবিশিষ্ট লোকের অনুভূতি হয় না, যতক্ষণ না চিত্তকে অভীপ্সিত লোকের স্পন্দবৃত্তি সম্পন্ন না করা যায়।— যেমন দুর্বীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ সাহায্যে আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে সূক্ষ্ম ও দূরের উপযুক্ত কোরে নেওয়া হয়। সমাধি ও মননের দ্বারা আমরা আমাদের চিত্তকে ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রাণস্তরের অনুকূল কোরে নিতে পারি। ৪।৫।৫২

।। দরকারী কথা ।।

স্বামিজীর বই পড়ে বুঝেছি—সাহায্য করতে হলে আগে মনে রাখতে হবে ১) পৃথিবীর নিকট আমরা ঋণী, পৃথিবী আমাদের কাছে ঋণী নয়। ২) শ্রীভগবান এই জগতের অভিভাবক, তাঁর ক্রিয়াশক্তি শাশ্বত ও সনাতন, তিনি জগতের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ব্যাপার অবগত আছেন। ৩) কাকেও ঘৃণা করবে না, কারণ ভালয় মন্দয় মিশিয়ে জগৎ। আমাদের আদর্শ হচ্ছে দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি দেখান এবং অনিষ্টকারীদের ভালবাসা। ৪) ধর্মোন্মাদ হলো ব্যায়রাম, ভালবাসা নয়। এই ব্যায়রামে যখন মানুষ আক্রান্ত হয়, তখন সে যে-কোন হিংসায় লিপ্ত হতে পারে, তখন সে হিংসা ও নিষ্ঠুরতাকে বিবেকের পর্যায়ে উঁচু কোরে তোলে। ৫) ধীর স্থির হয়ে কাজ করবে, তা হলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু ঠাণ্ডা থাকবে—কাজ ভাল হবে। উত্তেজিত হলেই স্নায়ুভঙ্গ রোগে ভুগতে হবে। ৫।৫।৫২

।। জীবন ও মৃত্যু ।।

স্বামিজীর বই পড়ে বুঝেছি—"পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু।" যারা পরের দুঃখ ক্লেশের কথা ভাবে না, তারা তো মৃত প্রেততুল্য। উচ্চ জীবনের লক্ষণ হচ্ছে প্রেম। যদি দরিদ্র, অজ্ঞ, অত্যাচারিত, মূর্খদের জন্য তোমার প্রাণ না কাঁদে তা হলে বুঝতে হবে তোমাতে প্রেম, সহানুভূতি, পরদুঃখ-কাতরতা প্রভৃতি দৈবী-সম্পদ উদিত হয় নি। প্রেম সম্পন্ন হৃদয়ের প্রার্থনাই প্রভু শোনেন, তার ভিতর তিনি অমিত-বীর্য প্রেরণ করেন, সে ক্রমাগত

বিজয়ের সহিত এগিয়ে যায়, সকল দুর্বলতা তার দূর হয়ে আসে অতি বিশুদ্ধ ও দৃঢ় চরিত্রবলে, যার সম্মুখে পর্বতপ্রমাণ বাধাও চূর্ণ হয়ে যায়। "বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়" তার একমাত্র পণ হলো ত্যাগ-পূর্ণ জীবন। এই ব্রহ্মাস্ত্রের নিকট সকল অসুরকেই পদানত হতে হয়। ওঠো, জাগো, এগিয়ে যাও—দাঁড়িয়ে থেকো না—'প্রোগ্রেস্'। ৬।৫।৫২

।। স্বাধীনতা ।।

স্বামিজীর বই পড়ে বুঝেছি—স্বাধীনতা না দিলে কোন জীবই উন্নত হতে পারে না। দাবিয়ে রাখার মত মহাপাপ আর জগতে নেই ; এ পাপের নিশ্চিত ফল দৈহিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গতির শৃঙ্খলবদ্ধতা—বাহ্য জগৎ এই নিষ্ঠুরদের ব্যবহারজন্য এক বিরাট কারাগার সৃষ্টি করে। অনভিজ্ঞদের স্বাধীনতা হয়তো তাদের জীবনে কিছু দিনের জন্য ভুলের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু আবেষ্টনীর ঘাত-প্রতিঘাতে তারা শীঘ্রই সচেতন হবে ও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। স্বাধীনতার ফলে পাশ্চাত্য সমাজ কিরূপ অদ্ভুত প্রগতিশীল, আর স্বাধীনতার অভাবে আমাদের সামাজিক জীবন মৃতবৎ। পরন্তু স্বাধীনতার ফলে আমাদের ধর্ম ক্রমাগত মহাপুরুষদের জন্ম দিচ্ছে, আর স্বাধীনতার অভাবে পাশ্চাত্য ধর্ম ক্রমাগত সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে ; আধ্যাত্মিক জগতের সত্যের অনুভবও তারা মুখ ফুটে বলতে সাহস করে না। ৭।৫।৫২

।। উপনিষৎ অতিমানব ধর্ম ।।

উপনিষদের ঋষিরা মনুষ্য-কেন্দ্র থেকে কথা বলেছেন, সেই জন্য সে বাণী মনুষ্য জাতির সর্ব ব্যাসার্ধ দিয়ে সর্ব পরিধিতে পৌঁছয়। উপনিষৎ আত্মস্বরূপকে ব্রহ্ম বলেছেন। আত্মা থেকেই উপনিষদের অনুসন্ধান আরম্ভ। আমরা সব অস্বীকার করতে পারি, সর্ব বিষয়ে বাদানুবাদ, সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে, কিন্তু আত্মাকে অস্বীকার করা চলে না, কারণ 'আমাকে' স্বীকার কোরে তবে ধর্ম, সংগ্রাম বা শান্তি। আত্মাতে ব্রহ্ম দর্শন মানে আত্মায় অনন্ত শক্তির স্বীকার। পূর্ণত্ব হচ্ছে আত্মার স্বভাব, সেখানে আমাদের ফিরে যেতে হবে, তখন সকল নৈতিকতা, সামাজিকতা, সাধনার পরিসমাপ্তি। উপনিষদের পথ হলো যম

ও নিয়ম, তার মধ্যে প্রধান অহিংসা। শ্রীবুদ্ধ, শ্রীযীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মূল কথা হলো ত্যাগ, সংযম ও অহিংসা। এসব দুর্বলের ধর্ম নয়, অতিমানবদের ধর্ম। ৮।৫।৫২

॥ "ঊর্জিতা-ভক্তি" ॥

কথামৃত যা পড়া হলো, তার সার কথা এই—শ্রীভগবানে ভক্তি হলো পরম বস্তু। এক রকমের ভক্তি আছে, তার পেছুনে কামনা বাসনা থাকে। আবার অহৈতুকী-ভক্তি আছে। এই শুদ্ধাভক্তিতে কোন কামনা বাসনা নেই। অনেক সম্প্রদায় আছে তারা খুব ভক্তিযোগের পক্ষপাতী, খুব 'ভক্তি' 'ভক্তি' কোরে বেড়ায়, কিন্তু কামনা বাসনা শূন্য নয়। নিষ্কাম ভক্তিযোগে ভক্ত শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায না। আবার ঊর্জিতা-ভক্তি আছে, তাতে দেহে অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার প্রকাশ পায। এ ভক্তিতে হৃদয উচ্ছ্বসিত হযে ওঠে—এ ভক্তিতে ভক্ত হাসে, কাঁদে, নাচে, গায। শ্রীচৈতন্যে এ ভক্তি পূর্ণ প্রকট ছিল। শ্রীরামচন্দ্র একবার লক্ষ্মণকে বল্লেন, 'ভাই! যেখানে ঊর্জিতা-ভক্তির লক্ষণ দেখবে, সেখানে বুঝবে যে আমার প্রকাশ হযেছে।' তিনি তো সব জায়গায়ই আছেন, কিন্তু ঊর্জিতা-ভক্তি তাঁকে দর্শন করিয়ে দেয। ৯।৫।৫২

॥ বুদ্ধি ও বোধি (প্রাতিভ জ্যোতিঃ=তারকজ্ঞান) ॥

সহজাত বোধ (instinct), অনুমান (reason) এবং সমাধিজাত প্রজ্ঞা (intuition or super-consciousness)—তিনটে আলাদা জিনিষ নয়, একই বুদ্ধির স্থূল হতে সূক্ষ্মতর তম স্তর। মানুষের মধ্যে তিনটে মন নেই, একই মন উত্তরোত্তর পরিমার্জিত হযে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। সহজাত জ্ঞান মার্জিত হয়ে বুদ্ধিতে পরিণত হয়, বুদ্ধি পরিমার্জিত হয়ে বোধিতে পরিণত হয়। এদের পরস্পরের মধ্যে বিভাজক কোন অবকাশ নেই, যেমন একই তরঙ্গায়িত জল ধীরে ধীরে স্থির হয়ে আসে। বুদ্ধি সহজাত বোধের পরিপূরক, বোধি বা প্রাতিভজ্যোতিঃ আবার বুদ্ধির বা মূর্ধ্বজ্যোতির পরিপূরক। সূক্ষ্ম স্থূলকে নিরাশ করে না, বরং আরও পরিষ্কার করে। অন্তঃকরণের অতি সূক্ষ্ম-ভূমিতে যে দ্যোতনা আসে, সেটা "not to destroy but to fulfil"—ধ্বংস করবার জন্য নয়, পরিপূর্ণ করবার জন্য। ১০।৫।৫২

।। ব্যক্তি মায়া ও জগন্মায়া ।।

ব্যক্তি-মায়া ভাল হতে চাইলেও তাকে জগৎ-মায়ার ওপর নির্ভর করতে হয়। এই জগন্মায়া হলো বিরাট কাল ও আবেষ্টনী। ব্যক্তিগত ইচ্ছা এর অধীন। যেমন একটা লোক একখানা কাগজে সোজা লাইন টানতে চায়, কিন্তু কাগজটা রয়েছে ওবড়া খাবড়া জায়গায়, কাজে কাজেই লাইন সোজা হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও হাতের পেন্‌সিল্ গড়িয়ে অন্য দিকে চলে যায়, লাইন সোজা না হয়ে আঁকা বাঁকা হয়ে যায়। তেমনি ব্যক্তির অসদ্ ইচ্ছাও এই বাহ্যমায়ার অধীন। একজন লোক চুরি করবে, কিন্তু লোকের ভয়ে পারে না। খুব প্রবল ইচ্ছাশক্তি যার সেই বাহ্য মায়ার ওপর কিছু প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আমাদের ব্যক্তিগত-ইচ্ছা, সমুদ্রে ভাসমান বরফের পাহাড়, 'আইসবার্গের' যেন মাথাটুকু, বাকি তিন ভাগ হচ্ছে অজ্ঞানভূমি, আর বাহ্যদৃশ্য। ১১।৫।৫২

।। সুন্দরের ও ভয়ঙ্করের উপাসনা ।।

সংশ্লিষ্ট-সুন্দরের (synthetic beautyর) উপাসনাই খৃষ্টান ও বৈষ্ণব ধর্ম। অদ্বৈত-বেদান্তীরা মৃত্যুরূপা কালীর উপাসক। মৃত্যুকে কারা উপাসনা করে? —জগতের মিথ্যাত্ব যারা বুঝেছে, যারা সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের অনিত্যতা দর্শনে বিতরাগ। এ হলো নেতিমার্গ। ইতিমার্গে কিন্তু সৃষ্টি ও সৌন্দর্যেও সেই সচ্চিদানন্দ। কিন্তু সচ্চিদানন্দকে ভুললে সৃষ্টি ও সৌন্দর্য আনে কেবল দুঃখ ও নিরর্থকতা। ভীষণার উপাসনা, দুঃখ ও কষ্টকে বরণ করা। তখন তাই প্রিয়, তাতে আর যন্ত্রণা নেই।

বৌদ্ধেরা পাঁচশো বছর শীলের, পাঁচশো বছর মূর্তির এবং পাঁচশো বছর মন্ত্রের উপাসনা করেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের একটা বিশিষ্ট কালিকরূপ, হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক নয়। বৈষ্ণবেরা চায় আত্মসমর্পণ, শাক্তেরা চায় সংগ্রাম। ভক্তেরা ঈশ্বরেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে, শাক্তেরা চায় মায়ের নিকট পুনঃপুনঃ অভিনব কিছু আদায়, "মায়ের ধরব চরণ লব কেড়ে"। শ্রীরামকৃষ্ণে এ দুয়ের সমন্বয় হয়েছে। ১২।৫।৫২

॥ লোক ॥

ভূরাদিলোক মনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। বেদ বলছেন, আদিত্যলোক ভেদ কোরে চন্দ্রলোকে জীব গমন করে। আদিত্য চক্ষের অধিপতি অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ, সেখানে আকাশ ও প্রাণের খেলা খুব স্থূল। চন্দ্র মনের অধিপতি অর্থাৎ সূক্ষ্ম মানস-লোক দেবস্থান। এই চন্দ্র-মণ্ডল সূর্য-মণ্ডলকে ঘিরে আছে। এ চন্দ্রলোকে আকাশ ও প্রাণের ক্রীড়াশক্তি অতি সূক্ষ্মা। এই চন্দ্রলোক ভেদ কোরে জীব বিদ্যুৎলোকে গমন করে, এ লোক চন্দ্র-মণ্ডলকেও ঘিরে আছে। এখানে আকাশ ও প্রাণে মেশামিশি ভাব, যেমন বিদ্যুৎ 'ম্যাটার্' না 'মোশান্'—স্থিতি না গতি—বলা বড় কঠিন। এখানে তপস্বী ঋষিরা বাস করেন। তারপর বিদ্যুৎলোক ভেদ কোরে ব্রহ্মলোক রয়েছে, অর্থাৎ আকাশ ও মনের মূল উৎস যে বিশ্বমন বা মহতী চেতনা—এ সেই স্তর। এই কারণাবস্থায়ও অতি সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য আছে। একে অতিক্রম কোরে রয়েছেন অব্যয় ব্রহ্ম। ১৩।৫।৫২

॥ ব্রহ্মে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ॥

শ্রীভগবান এমন একটী বৃত্তের কেন্দ্র যার পরিধি কোন স্থানে শেষ হয় নি এবং যার কেন্দ্র সর্বত্রই। এই প্রত্যেক কেন্দ্রটী জীবন্ত, চেতন, ক্রিয়াশীল এবং সমভাবে নির্মাতা। আমাদের ব্যক্তিগত আত্মা সসীম, অহং কেন্দ্রিক এবং ঊর্ধ্ব ও অধঃগতি সম্পন্ন। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক-চেতনা বিরাট বিশ্বের তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তেমনি এই বিরাট জগৎ ঈশ্বারালোকে ভাসমান একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভস্মকণা। আমরা বলি শ্রীভগবানের বাণী এই বিশ্ব, আবার তিনি বাক্যাতীত হয়ে আছেন। স্বামিজী বলছেন,—ধরো পৃথিবী হতে সূর্যের একটা ফটোগ্রাফ নেওয়া হলো ; ক্রমে আমরা সূর্যের দিকে এগুচ্ছি, বহু সহস্র মাইল এগিয়ে আবার ফটোগ্রাফ্ নিয়ে দেখা গেল, সূর্য আরও বৃহৎ ; এই যাত্রা-প্রগতির প্রত্যেক ছবিখানি বৃহত্তর ; ক্রমে আমরা সূর্যে উপস্থিত হব, তাতে বিহার করব এবং অবশেষে তাতেই মিলিয়ে যাবো। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক এইরূপই বর্দ্ধিত হয়ে, তাতেই মিলিয়ে যায়। ১৪।৫।৫২

॥ চৈতন্য ও চেতনা ॥

অব্যক্তিক চৈতন্য, প্রত্যেক ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু সব কেন্দ্রই এক অখণ্ড চৈতন্যের ঔপাধিক অভিব্যক্তি। স্বরূপতঃ আমরা সকলেই বিশ্বজনীন এবং সর্বব্যাপী। চৈতন্য কি করে দেশিক, কালিক বা সম্বন্ধিত হবে! একটা দেশ আর একটা দেশকে সীমাবদ্ধ করে, কাল কালকে সীমাবদ্ধ করে, সীমাদ্বয় সম্বন্ধিত হয়—অখণ্ড চৈতন্য তাদের দ্বারা কিরূপে সসীমতা লাভ করবে বা কার সহিত সম্বন্ধিত হবে! কাজেকাজেই ব্যক্তিগত চেতনা হলো ভ্রান্তি, তার স্বরূপ অব্যক্তিক চৈতন্য। এই অব্যক্তিক চৈতন্যের এক একটা কল্পিত-কেন্দ্রই সর্ব ব্যক্তিগত চেতনা। চেতনার ব্যক্তিত্ব বাধিত হলেই তা শুদ্ধ-চৈতন্য। চেতনা বা বুদ্ধি হলো চিদ্-জড়গ্রন্থি—সাত্ত্বিক মায়ায় চিৎপ্রতিবিম্ব। দর্পণরূপ উপাধিকে আশ্রয় কোরে অব্যক্তিক-চৈতন্য ব্যক্তি চেতনারূপে বিবর্তিত হন। স্বরূপতঃ তিনি শুদ্ধ, তাঁর চেতনা রূপটী তাঁতে অধ্যস্ত। ১৫।৫।৫২

॥ কাম ॥

মনোভব বুদ্ধিকে অন্ধ করে, মনোভব শয়তানকে দেবদূতরূপে আমাদের চক্ষের সামনে আবির্ভূত করে। মনোভব চক্ষুর ছানি, দ্রষ্টার সর্বনাশ করে, নিজ সুন্দরাবাসকে ভুলিয়ে দিয়ে; গভীর কর্দমের পথে নিয়ে চলে, যাতে নিপতিত হলে আর কাউকেও উঠতে হয় না। মনোভব এমন সুরা যা একবার আস্বাদ করলে আর কখন মুক্তির মুখ দেখতে হবে না। এই সুন্দর অবৈধ-পানীয়ে একটীবার চুমুক দিলে আরও উৎকট পানের ইচ্ছা জেগে ওঠে এবং গলার মধ্যে যায় জড়িয়ে এবং শেষে ফাঁসিচক্রের রূপ ধরে, যতক্ষণ না তুমি একেবারে শূন্য পথে তলিয়ে না যাও।—সুফী জামীর॥ ১৬।৫।৫২

॥ অহংকার ॥

অহংকার কোরো না যে আমার গর্ব তিরোহিত হয়েছে, কারণ এ সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতম। অন্ধকার রাতে কাল পাথরে একটা পিঁপড়ের পায়ের দাগ ধরা পড়তে পারে, কিন্তু অহংকার এত সূক্ষ্ম যে ঐরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের

কাছেও ধরা পড়ে না। ও মন থেকে তুলে ফেলা বড় সোজা ব্যাপার নয়। একটা ছুঁচ দিয়ে পৃথিবী হতে একটা পাহাড় তুলে ফেলা সম্ভব, কিন্তু মন থেকে অহংকার তুলে ফেলা তার চাইতেও কঠিন।—সুফী বাহারী-স্থান॥ ১৭।৫।৫২

॥ ঈশ্বরে ভালবাসা ॥

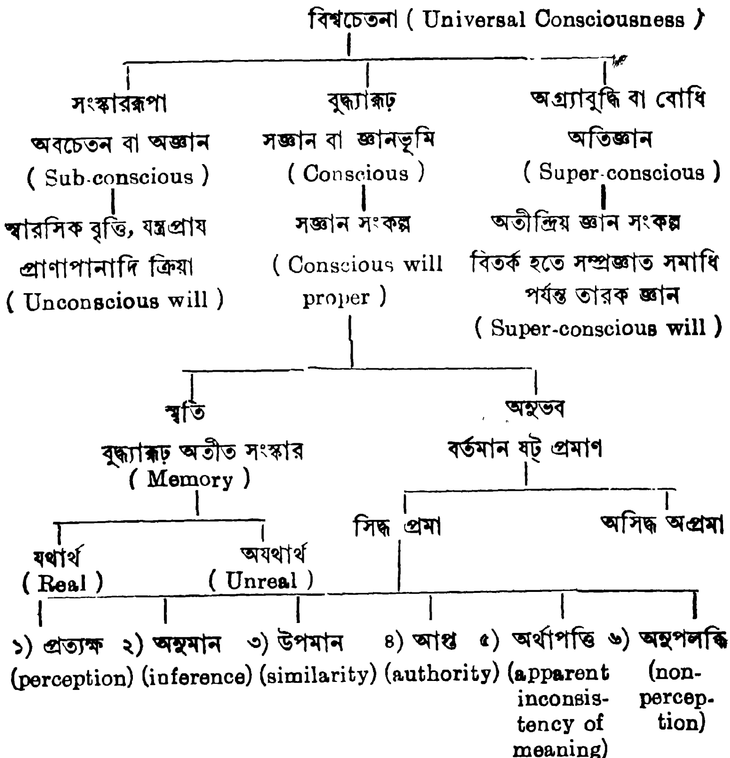
পৃথিবীর সবদেশে ভগবানের ভক্ত আছে। তারা সকলেই তাঁর উপাসনা করে নানা উপায়ে, নানা নামে ও নানা ভাবে। সৌন্দর্য ও মহত্বের উপাসনা কে না করে! সেই পরমসুন্দরই তো প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন। মানুষের অন্তরেও সেই প্রেম ও আনন্দ স্বরূপ রয়েছেন, কাজেকাজেই মানুষ ভাল না বেসে থাকতে পারে না। ভালবাসছে কাকে? নিজের স্বরূপকেই, নিজেকে বিশ্বের কোন বস্তুতে প্রতিফলিত কোরে। মানুষের দোষ, বস্তুর অন্তর্দেশে যেতে চায় না, অথচ ভেতরে প্রেমের তাড়না, সেই জন্য নিজের অন্তর্নিহিত প্রেম প্রকৃতি-দর্পণে প্রক্ষেপ কোরে নিজেকে দেখবার চেষ্টা করছে, কেউ বা তা ছাড়া আর কিছুতেই রাজি নয়। বাহিরের প্রতিফলিত সৌন্দর্য আজ আছে কাল নেই ; হে জীব! অন্তরের সৌন্দর্য উৎসে ফিরে চল—পরমানন্দ পাবে। ১৮।৫।৫২

॥ শক্তির তরতম ॥

আজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের আলাপ সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। বিদ্যাসাগর মশাই পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঈশ্বর যে জীবকে শক্তি দিয়েছেন, তাতে তরতম আছে কি, না? ঠাকুর বলেছিলেন, 'তা না হলে একজনে পঞ্চাশ জনের মওড়া নেয় কি কোরে? তোমাকে সব দেখতে আসে কেন? ভগবান যে চিত্তের ভেতর দিয়ে খেলা করেন, সেখানে তাঁর বিশেষ শক্তির প্রকাশ ঘটে বই কি। জমিদার তার জমিদারীর যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁকে তাঁর বৈঠকখানাতেই দেখতে পাওয়া যায়। ভক্তের হৃদয় হলো ভগবানের বৈঠকখানা। তিনি সেখানে বিহার করতে ভালবাসেন, সেখানে তাঁর একটু বিশেষ শক্তির প্রকাশ

দেখা যায়।' এরূপ ভক্তের লক্ষণ কি? ঠাকুর বলছেন, 'যখন দেখবে কারুর ভিতর দিয়ে কোন মহৎ কার্য হচ্ছে তখন বুঝবে সেখানে তাঁর শক্তির একটু বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে। আদ্যাশক্তি কালীই ব্রহ্ম। শক্তিকে ছেড়ে শক্তিমানকে চিন্তা করা যায় না, যেমন মণি ও মণির জ্যোতিঃ—একটা চিন্তা করতে গেলেই আর একটা আপনি এসে পড়ে।' ১৯।৫।৫২

॥ বিশ্বচেতনা ॥



—শ্রীবিবেকানন্দ পত্রাবলম্বনে॥ ২০।৫।৫২

॥ উপায় ও উদ্দেশ্য ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু উদ্দেশ্য নয়, উপায়ও বটে। তাঁর যে সর্বজনীন সাধনা সেটা তাঁর স্বাভাবিক, সংঘর্ষে পড়ে এ সামাঞ্জস্য-পূর্ণ-জীবন তিনি জ্ঞাতসারে রচনা করেন নি—এই বিশ্বজনীন ধর্ম তাঁর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি—অবচেতন ভূমি হতে প্রাণাদি ক্রিয়ার মত এই সর্বজনীন ধর্ম তাঁতে প্রকটিত হয়েছিল। তিনি ইংরেজী বা অপর কোন বৈদেশিক সাহিত্য পড়েন নি, কিন্তু তাদের যা কিছু সর্বজনীনতা তাঁর জীবনে সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত। স্বামিজী কেবল তাঁর এই জীবনবেদ পাঠ করবার সুবিধা পেয়েছিলেন এবং তিনি ঐ সকল সমন্বিত তথ্য, যা বর্তমান জগতের একান্ত উপযোগী, সকলের নিকট উপস্থাপিত করেছিলেন। ২১।৫।৫২

॥ দরকারী কথা ॥

প্রশ্ন :—মানুষ একই জায়গায় পুনঃ পুনঃ জন্মায় কি না ?

মা বলেছিলেন, 'বাসনায় একই মানুষ একই পরিবারে পুনঃ পুনঃ জন্মাতে পারে।'

প্রশ্ন :—শ্রীশ্রীঠাকুরে "মহেশ্বরী" শব্দের প্রয়োগ কোরে জপ সমর্পণ করা যায় কি না ?

মা বলেছিলেন, 'যায়। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি দুইই। তিনিই সশক্তিক ব্রহ্ম।' তিনি যোগমায়া সমাবৃত। সেই জন্য তিনি মহেশ্বর এবং মহেশ্বরী উভয়ই। তাঁকে মা বলে ডাকলে খুসী হন। মা কালীই তো দেহ ধরে রয়েছেন। যখন ওঁর খুব গলার অসুখ বেড়েছে, দেখলেন মা কালী ঘাড় বেঁকিয়ে রয়েছেন। জিগেস করলেন, 'মা অমন কোরে রয়েছ কেন ?' বল্লেন, 'গলায় বড় ব্যাথা'।'

প্রশ্ন :—সব সময় জপ ধ্যান না করতে পারলে কি করব ?

মা বল্লেন, 'মনে মনে প্রণাম করবে।' ২২।৫।৫২

।। ভারতের যীশু ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, বলি, যূপকাষ্ঠ ও জল্লাদ এক! 'একি দেখলুম মা!'—ভাবাবেগে সমাধিস্থ হলেন। চৈতন্য হলে বল্লেন, 'আমি খুব সুস্থ, এত সুস্থ কখন ছিলাম না।' কী ভীষণ ব্যাধিতে তিনি দেহ রাখলেন, কিন্তু সস্নেহ করুণামাখা হাসিটুকু তাঁর ওষ্ঠাধরে কখন অস্তমিত হয় নি। রোমাঁরোলাঁর সিদ্ধান্ত—ভারতের এই যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে বরণ করবার গৌরব অর্জন করেন নি বটে, তা হলেও জীবাদৃষ্ট গ্রহণ করায় তাঁর যন্ত্রণা ক্রুশের যন্ত্রণা অপেক্ষা অল্প তীব্র ছিল না। তিনি বলতেন, 'দেহই কষ্ট পায়, তাঁতে মন সমর্পণ করলে, আর কোন কষ্ট দেহের থাকে না।' 'দেহ ও যন্ত্রণা পরস্পরকে ব্যস্ত রাখুক, মন তুমি আনন্দে থাক। এখন আমি ও মা চিরকালের জন্য একাকার হয়ে গেছে।' ২৩।৫।৫২

।। অহিংসার দৃষ্টান্ত ঃ প্রেমের প্রদীপ ঃ অভৌগলিক ভালবাসা ।।

মহাত্মা বলছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আমাদের সত্যস্বরূপকে একেবারে মুখোমুখী প্রত্যক্ষ করবার সাহায্য করে। তাঁর জীবনের ব্যবহার ও আচরণ দেখে এ কথা কেউ বিশ্বাস না কোরে পারবে না যে, "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা"···। তাঁর বাণী কেবল পাণ্ডিত্য নয়, তাঁর জীবনবেদের এক একটী পৃষ্ঠা, যা তাঁর অভিজ্ঞানের অভিব্যক্তি ও অপরাজেয়। বর্তমান সংশয়ান্ধকারে তিনি একটী জ্বলন্ত প্রেমপূর্ণ বিশ্বাসের প্রদীপ, যা সহস্র সহস্র নরনারীর আলম্বন, নইলে হয়ত তারা আধ্যাত্মিক আলোক হতে জীবন পথে একেবারে বঞ্চিত হোত। শ্রীরামকৃষ্ণ অহিংস-জীবনীর একটী মূর্ত প্রতীক। তাঁর ভালবাসায় ভৌগলিক অথবা অন্য কোন প্রকারের সসীমতা ছিল না। তিনি দেবত্বের এক জীবন্ত বিগ্রহ ঃঃ দিব্যপ্রেমের এক অপূর্ব প্রেরণা। তাঁর জীবনী তাঁর কর্মরত মোক্ষাচরণের আত্মকাহিনী। ২৪।৫।৫২

॥ ব্রহ্মবিবর্ত ও সম্বন্ধ ॥

এক অখণ্ড সূর্য, তাতে আবৃতি নেই, রস নেই, দ্রষ্টা নেই, দৃশ্য নেই, কেবল স্বয়ং বর্তমান ও জাজ্জ্বল্যমান। হঠাৎ তাতে এক অনির্বচনীয় পরিবর্তন এলো এক অখণ্ড আলোকের গর্ভে, অনন্ত কোটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকাবর্ত ঘূর্ণিত হয়ে উঠলো; অনন্ত সেই আলোক সমুদ্রে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত জ্যোতিঃ বর্তুল—চতুর্দিক বিচ্ছুরিত ও বিকীর্ণ। ক্রমে সে সকলে এলো জলের শীতলতা, সবুজের স্নিগ্ধতা, প্রাণের অনুভূতি—এক সূর্য বহু সূর্যে বিবর্তিত হলো; এলো তাতে বহু সৌন্দর্য রসের বৈচিত্র্য; আবার বহু ধ্বংস-সংঘর্ষের বীভৎসতায় এ গর্ভ হলো উদ্বেলিত। কিন্তু সকলের মধ্যেই ঐ "একরূপ অরূপ অতীত আগামী কালহীন, দেশহীন সর্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায়।"—এক অখণ্ড অকথিত বাণী; কিন্তু অপূর্ব আকস্মিক, অনির্বচনীয় শিল্প-বিবর্ত—পরন্তু সর্ব নিম্ন হতে সর্বোচ্চ পর্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন চৈতন্য-যোগসূত্র—"কে বুঝিবে মায়া তার"। ইনিই চমৎকারিণী অনির্বচনীয়া॥ ২৫।৫।৫২

॥ সেবাধর্ম ॥

প্রভু বল্লেন, জীবই শিব। তাই বলি জীবে দযা দুঃসাহস মাত্র। ওগো, দয়া নয়, সেবা—সেবা—তাঁর অর্চনা—পূজা। মানুষকে ভগবদ্বুদ্ধিতে দেখতে হবে।

শুনে বিবেকানন্দ বল্লেন, আজ আমার হৃদয় এক মহাবাণীর আলোকে আলোকিত হলো!—এ জীবন্ত নবধর্ম আমি আজ থেকে জগতে ঘোষণা করব।

সেবাধর্মের মূল সম্বন্ধে একজন জিজ্ঞাসা করায় স্বামী শিবানন্দ বল্লেন, তাঁর সময় হতে আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যে বহু সেবাকার্য চলেছে, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তার গোড়া কোথায়, আমি বলি, ঐ দিন হতে এবং ঐ স্থান হতে, অর্থাৎ যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ মহাবাণী জগদ্ধিতায় দান করলেন।

পার্থিব সকল বন্ধন ছেদন কোরেও যে ঐ মহামানব কী গভীরতা ও আন্তরিকতার সহিত জীবাদৃষ্ট-জন্য দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে শ্রবণ করতেন এবং সে-গুলোকে লাঘব করবার জন্য ঐ দুঃখকে নিজের মধ্যে কী নিষ্ঠুর বেদনার সহিত অনুভব ও সহ্য কোরে তাদের নির্জিত কোরে ফেলতেন, তা যে না দেখেছে, সে কিছুতেই বুঝতে পারবে না। ২৬।৫।৫২

॥ বিম্ব ও প্রতিবিম্ব ॥

বিম্ব (ঈশ্বর) ও প্রতিবিম্ব (জীব)-বাদে বিম্বই প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান ; মুখাদির প্রতিবিম্বের অজ্ঞানই পরিণামী উপাদান ; দর্পণ ও বিম্বের সন্নিধি প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ। বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের অভেদজ্ঞান দ্বারা প্রতিবিম্ব ভাবের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু যে পর্যন্ত বিম্ব ও দর্পণের সন্নিধিরূপ উপাধি থাকে, সেই পর্যন্ত—প্রতিবিম্ব মিথ্যা জানা থাকলেও প্রতিবিম্বের স্বরূপের মাত্র অনুমান হয়। যখন দর্পণ অপসারিত হয়, তখন প্রতিবিম্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, কেবল মুখই বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ-শূন্য হয়ে অবস্থান করে। সেইরূপ একই অজ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ-ব্রহ্মরূপ-বিম্বে বহু জীবরূপ প্রতিবিম্ব-ভাব প্রতীত হয়। এই প্রতিবিম্ব-জীবের উপাদান অজ্ঞান, অধিষ্ঠান শুদ্ধ ব্রহ্ম ; নিমিত্ত কারণ অদৃষ্ট। জীবস্বরূপ জ্ঞানে প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হয়, তথাপি প্রারব্ধ হেতু উহার বর্তমানতা প্রতীয়মান হয়। প্রারব্ধাবসানে বিদেহ মোক্ষ। (পঞ্চদশী) ॥ ২৭।৫।৫২

॥ ধ্যানীর কর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম ॥

উপাস্য-ভিন্ন-বস্তুর আকার-বিশিষ্ট বিরোধি-বৃত্তিকে পরিত্যাগ কোরে নিরন্তর উপাস্য বস্তুকে অবিচ্ছেদে ভাবনা করতে থাকলে সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থায়ও সেই ধ্যানের প্রাপ্তি ঘটে। স্বীয় প্রারব্ধভোগ করতে করতে লোকে অবস্থার ও বিশ্বাসের প্রবলতা হেতু, বিষয়াসক্ত পুরুষের বিষয় চিন্তার ন্যায়, অবিচ্ছেদে ধ্যান করতে সমর্থ হয় ; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরপুরুষ সঙ্গাভিলাষিণী নারী আপনার দেহকে গৃহকর্মে নিরত রাখলেও অন্তরে সেই পরপুরুষ সঙ্গের আনন্দ আস্বাদ করে। তার গৃহকার্য ভঙ্গ হয় না বটে কিন্তু উদাসীনের মত হয়। সেইরূপ ধ্যানীর কর্ম উদাসীন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী নিজের স্বরূপ অচল অটল বলে জানেন, তাঁর প্রারব্ধ কর্মে ঔদাসীন্য থাকে না। অজ্ঞানীর ন্যায় দক্ষতার সহিত, পরন্তু ক্রীড়াবৎ তিনি যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন—দেহ ও বুদ্ধি তাদের কর্ম-করুক, তাতে আত্মার কী !—(পঞ্চদশী) ॥ ২৮।৫।৫২

॥ দুটী পথ ॥

স্বামিজী একবার বলছেন, দুটী পথ খোলা পড়ে আছে। একটী, সমস্ত আশা ভরসা ত্যাগ কোরে এ জগৎ যেমন চলছে সেই ভাবেই গ্রহণ করা, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে একআধটুকরো সুখের আশায় জগতের সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে যাওয়া; অপরটী, সুখকেও দুঃখেরই অপর মূর্তি-জ্ঞানে একেবারে তার অন্বেষণ পরিহার কোরে সত্যের সন্ধান করা। যারা এ ভাবে সত্যের অনুসন্ধানে সাহসী, তারা সেই সত্যকে সদাবিদ্যমান এবং নিজের ভেতরই অবস্থিত বলে দেখতে সমর্থ হয়। তখনই আমরা এও বুঝি যে সেই একই সত্য কিরূপে আমাদের বিদ্যা ও অবিদ্যারূপ এই দুই আপেক্ষিক জ্ঞানের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। আরও বুঝি, এই সত্য আনন্দ স্বরূপ এবং তা ভালমন্দ এই দুই রূপে জগতে প্রকাশিত। আর তার সঙ্গে সেই যথার্থ সত্তাকেও জানি, যা জগতে জীবন ও মৃত্যু উভয়রূপেই আত্মপ্রকাশ করছে। ২৯।৫।৫২

॥ ঝঞ্ঝাট থেকে মন টেনে নেওয়া ॥

স্বামিজী এ সম্বন্ধে একটী কৌশল বলেছেন,—ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ করার উপদেশ যে গীতায় আছে, সেটা মনে মনে ঠিক ঠিক অভ্যাস করার প্রকৃত উপায় আমি আবিষ্কার করেছি। ধ্যান, মনোযোগ বা একাগ্রতার সাধন সম্বন্ধে আমি এমন একটা আলোকের সন্ধান পেয়েছি যে তার অভ্যাস করলে আমরা সর্বপ্রকার উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যাব। মনটাকে ইচ্ছানুসারে এক জায়গায় ঘিরে রেখে দেওয়ার কৌশল ছাড়া এটা আর কিছু নয়। যে অবস্থাটা তিক্ত হয়ে উঠেছে, তখন সে পরিবেশ ত্যাগ কোরে, আর একটা পরিবেশ, নিজের যা মনের অনুকূল, বেছে নিয়ে তাতে ডুব দেওয়া অর্থাৎ কাজে ডুবে থাকা, পূর্বটার কথা কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখা। জগতে চিরকাল কোন জিনিষই থাকে না, তা যতই তীব্র বা গভীর হোক। নিশ্চয় জেন কিছুকাল পরে পূর্বের তিক্ততা নষ্ট হবে। ৩০।৫।৫২

॥ নিশ্চিন্ত ॥

একদিন ভগবান শ্রীবুদ্ধ এক গোয়ালার ঘরের দেওয়ালের ধারে ছেঁচ তলায় আশ্রয় নিয়েছেন। বর্ষার রাত্রি, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও বাড়ছে। জানলা দিয়ে গোয়ালা দেখলে গেরুয়া কাপড়। হেসে বললে, 'সন্ন্যাসী! তোমার ঐ উপযুক্ত স্থান, ওখানেই থাক।' তার পর গান ধরলে, 'গরু বাছুর আমার ঘরে তোলা হয়েছে, ঘরে খাসা আগুন জ্বলছে, আমার স্ত্রী নিরাপদে আছে, আমার শিশুরা বেশ নিরাপদে ঘুমুচ্ছে—মেঘ! তুমি আজ খুব বর্ষাও সারা রাত্রি ধরে।'

বাইরে থেকে শ্রীভগবান উত্তর দিলেন, 'আমার চিত্ত সংযত হয়েছে, আমার ইন্দ্রিয় সকল কুড়িয়ে এনেছি, হৃদয় আমার দৃঢ়, হে সংসার মেঘ, আজ যত পার দুঃখ বর্ষণ কর, যত তোমার ইচ্ছা হয়।' (সুত্তান্ত, বৌদ্ধগাথা) ॥ ৩১।৫।৫২

॥ জীবন সংগ্রামে ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী ॥

যুদ্ধ, না আপনার কোরে নেওয়া?—পাশ্চাত্যেরা মনে করে জীবন সংগ্রামই বৃদ্ধির চিহ্ন। আমরা হিন্দুরা কিন্তু তা মনে করি না। আমরা মনে করি আপোষে আপনার কোরে নেওয়াই জীবনের চিহ্ন। হিন্দুর মহত্ত্ব ঐখানেই। যুদ্ধ জিনিষটাকে আমরা আমাদের সমাজে বড় বিশেষ স্থান দেই না। তবে যখন আমাদের ধর্ম ও গৃহ কেউ একেবারে বিপন্ন কোরে তোলে, তখন আমরা অবশ্য দু এক ঘা দিয়েছি, তা-ই আততায়ীদের পক্ষে যথেষ্ট। অকারণ যুদ্ধ বা দেশজয়ের প্রবৃত্তি ভারতীয় আর্যেরা ঘৃণা করেন, ও হলো লঙ্কা, ব্যাবিলোন, মেসিডোন ও রোমের সভ্যতা। হিন্দু নীতি হচ্ছে উন্নততর ধর্ম গ্রহণ ও দান, উন্নততরা কৃষ্টির বিনিময় দ্বারা সর্বগোষ্ঠি ও সম্প্রদায়কে নিজেদের মধ্যে মিশিয়ে নেওয়া। যতদিন হিন্দুর মধ্যে ত্যাগ, সেবা, আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বর প্রেম থাকবে, ততদিন ভারতে বিদেশীর আক্রমণ হলেও, শেষে তারা এই বিরাট শরীরের অঙ্গীভূত হয়ে পড়বে। ১।৬।৫২

॥ প্রেম ॥

কথামৃতের আলোচনা চলছে—নারদের প্রার্থনায় রামচন্দ্র প্রীত হয়ে বল্লেন, "নারদ তুমি বর নাও।" নারদ বল্লেন, "প্রভু! তোমার ভুবনমোহিনী-মায়ায় যেন না ভুলি।" রাম বল্লেন, "তাই হবে, কিন্তু তুমি আর কিছু বর নাও।" নারদ বল্লেন, "প্রভু! আমি আর কিছু চাই না।" সনৎকুমার সংহিতার এই অহৈতুকী ভক্তির দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রীঠাকুর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করতেন।

এই প্রেমলাভের উপায় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের নারদীয় উপাখ্যান অবলম্বন কোরে বলছেন, 'প্রথম সাধু সঙ্গ; এই সাধু সঙ্গ হতে প্রথম শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়, তখন শ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস আসে। শ্রদ্ধা যখন ইষ্টে খুব একাগ্র হয়, তখন তাকে বলে নিষ্ঠা। তখন সে, মাত্র ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম করে। নিষ্ঠার পর ভক্তি, ভক্তি পরিপুষ্ট হয়ে ভাব হয়, ক্রমে তা মহাভাবে পরিণত হয়। মহাভাবের শেষকথা প্রেম। এই পরা-প্রেম লাভ হলে ঈশ্বর দর্শন হয়েছে বুঝতে হবে।' ২।৬।৫২

॥ জ্ঞানের প্রকার ॥

সংসারী, ভক্ত এবং অবতারের জ্ঞান এক রকম নয। সংসারীর জ্ঞান যেন মিট মিটে প্রদীপ, কোন প্রকারে অন্ধকারে খাওয়া পরা ঘরের কাজ চলে। ভক্তের জ্ঞান যেন চাঁদের আলো—ঘরেও আলো, বাইরেও আলো, কিন্তু খুব দূরের জিনিষ দেখা যায় না, বা সূক্ষ্ম কাজ করা যায় না। কিন্তু অবতারের জ্ঞান সূর্যের আলোর মত, ধক্ ধক্ করে, তার সাহায্যে তাঁরা ভেতর বার দেখেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ সব দেখতে পান।

সংসারীর মন যেন ঘোলা জল, তলায় মাণিক পড়ে আছে, দেখা যায় না। কিন্তু নির্মলী দিয়ে ঘোলা জল পরিষ্কার করা যায়। এই নির্মলী হলো বিবেক-বৈরাগ্য।

উপদেশ শোনা ভাল, কিন্তু সময় না হলে উপদেশ কার্যকরী হয় না।—এ সব শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা। ৩।৬।৫২

॥ "নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী"—কবির ॥

একজন তামাক খাবে বলে প্রতিবেশীর বাড়ী টিকে ধরাতে গেছে। রাত অনেক, তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেক ডাকাডাকির পর একজন দোর খুলে নেমে এলো। জিগেস কল্লে, 'কিগো, এত রাত্রে কি মনে করে?' সে বল্লে, 'আর ভাই তামাকের নেশা, জান তো! টিকে ধরাতে এসেছি।' তখন গেরস্থ হেসে বল্লে, 'বাঃ! তুমি তো বেশ লোক দেখছি। এত কষ্ট কোরে এত রাত্রে এসে দোর ঠেলাঠেলি, আর তোমার হাতে লণ্ঠন?' লোক যা চায় তা কাছে। অথচ নানা তীর্থ বনবাদাড় ঘুরে বেড়ায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, "সে বস্তু নিজের কাছেই আছে।" ৪।৬।৫২

॥ সিদ্ধি ॥

জীবন্মুক্ত সিদ্ধ যোগী আত্মাতে, বাহ্য বস্তুতে ও অন্তরে যে নিত্যানন্দ রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হন, তাই তাঁর সিদ্ধির ফল। জ্ঞান হলো বৈরাগ্যের ফল, উপরতি হলো জ্ঞানের ফল, উপরতির ফল ব্রহ্মানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দের ফল মুক্তি। যেখানে মুক্তি নেই সেখানে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয় নি, যেখানে ব্রহ্মানন্দ নেই সেখানে ত্যাগ নেই, যেখানে ত্যাগ নেই সেখানে জ্ঞান লাভ হয় নি, যেখানে জ্ঞান নেই, সেখানে বৈরাগ্য উদিত হয় নি। সেই জন্য স্বতঃস্ফূরিত আত্মানন্দই পরমাতৃপ্তি বা নিবৃত্তি। দুঃখ উপস্থিত হলেও যে উদ্বেগরাহিত্য, তাই জ্ঞানের প্রকৃত ফল। ভ্রান্তিকালেই ঘৃণিত কর্ম লোকে করে, বিবেক উদিত হলে কে আর কবে অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়! মরীচিকা-জ্ঞানী এবং মরীচিকা-অজ্ঞানীর মরীচিকা দর্শন ফল দেখেই এ কথার তাৎপর্য বোঝা যায়। (পঞ্চদশী) ॥ ৫।৬।৫২

॥ রাজযোগ ॥

রাজযোগ সুসম্পন্ন হলে আর কোন লক্ষ্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না, চিত্তবন্ধ, ধ্যানধারণাদি জনিত পরিশ্রমও প্রয়োজন হয় না। যিনি অদ্বৈত রাজযোগে অবস্থান করেন, তাঁর দৃষ্টি সমস্ত দৃশ্য পদার্থকে জয় করে, অর্থাৎ কোন বিষয়েই আর চিত্ত আকর্ষিত হয় না। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জীবিত, মৃত, চঞ্চল

বা সংযত অবস্থা বলে আর কিছু থাকে না। রাজযোগে যাঁদের চিত্ত স্থির হয়েছে, তাঁরা 'আমি আমার' ইত্যাদি মায়িকভাব পরিত্যাগ কোরে থাকেন, তাঁদের দ্রষ্টা বা দৃশ্য বলে কিছুই থাকে না, তাঁদের একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানই বর্তমান থাকে। তখন চোখের পাতা আর পড়তে চায় না, শ্বাস প্রশ্বাস স্থির হয়ে আসে, মনের সংকল্প বিকল্প নাশ পায়—"মনোন্মনী সা ময়ি সন্নিধত্তাম্"—সেই মনোন্মনী শক্তি আমাতে সন্নিহিত হোক। ইন্দ্রিয় ও চিত্ত চির-নিগ্রহকারী নির্বাতস্থ দীপের ন্যায় সেই মনোন্মনী শক্তি আমাতে সন্নিহিত হোক।

(যোগতারাবলী)—শ্রীশংকর॥ ৬।৬।৫২

॥ মাতৃভাব ॥

বেদে দেখা যায় অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বলছেন, "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম্"। মাতৃভাবে উপাসনা একটী স্বতন্ত্র দর্শন। এখানে সর্ব ধারণার মূল—শক্তি। সব জীবই শক্তির অধীন। শক্তিহীন হলেই জীবকে জড় বলে। জীব সর্বদা বাহ্য শক্তির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে, আবার ভেতরেও সেই শক্তির প্রেরণা জীব অনুভব করে। আন্তর ও বহিঃ শক্তির সংঘর্ষে ও সমন্বয়ে এই জগৎ ক্রিয়া চলেছে। শক্তিমানই জগৎকে শাসন করেন। শক্তিমানই সকলকে সমান ভাবে দেখতে পারেন। সূর্য সমভাবে সকলকে তাপ দান করেন। মহাশক্তিই আমাদের পালন করেন, শক্তি সংঘর্ষে আমরা ধ্বংস হই। পুরুষ নিরপেক্ষ দ্রষ্টা, শক্তিই ক্রীয়াশীলা। আবার মা থেকেই আমরা জন্মাই, এটা প্রত্যক্ষ, মা-ই আমাদের পালন করেন। সকলে ত্যাগ করলেও, মা কখন সন্তান ত্যাগ করে না। এজন্য মাতৃত্বের উপাসনা। ৭।৬।৫২

॥ নববাণী ॥

ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র বাক্যমনাতীত ব্রহ্মবস্তুর দুটো প্রতীকের কথা বলেছেন,—'প্রথম বহুবিধ মূর্তি এবং দ্বিতীয় বহুবিধ সংশয়বাদ। প্রথমটী অজ্ঞ শিশুর ক্রীড়া পুত্তলিকা, আর দ্বিতীয়টী বুদ্ধিমানের আদর্শ পুত্তলিকা।' তোমার স্বর্গ তো তোমার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও শুদ্ধির ভেতরই। তোমার চিরানন্দ

তোমাতে চিরবর্তমান—এ উৎসের জল যতই তুলবে ততই স্বাদু। সকল দ্রষ্টা, ঋষি, মুনি, সাধু, সন্ত, সহীদ, প্রচারক এই জল পান কোরেই তো অপরকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন, তাই তো তাঁদের সকলকেই সম্মান করতে হয়। বর্তমান দ্রষ্টাদের নমস্কার কর, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাদের জন্য অপেক্ষা কোরে থাক। ভারতীয় বেদের আর পরিসমাপ্তি কোথায়! প্রত্যহই তো এর নূতন পৃষ্ঠা আমরা পড়ছি, এখনও তো এর অসংখ্য পৃষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের অপরিচিতি রয়ে গেছে। ৮।৬।৫২

॥ মূর্তি—ধ্যানলোকে ॥

স্বর্ণবর্ণ দীর্ঘাকৃতি পুরুষসিংহ, অর্ধ নিমিলিত দীর্ঘায়ত চক্ষু, তাতে স্নিগ্ধালোক ঝলমল করে; দৃষ্টি একটু বাঁকা, একটু অবগুন্ঠিত, যেন বিশ্বের অন্তর্বহির্ সকল রহস্যের সহিত ক্রীড়ামোদী। অর্ধ বিকশিত অধরোষ্ঠে কুন্দকলিরদ্যুতি; মায়াময়ী হাসি মায়ের মত কখন স্নেহরুষ্ট, সখার মত কখন প্রেম বিদ্রূপ সম্পন্ন। ঐ নয়ন-বাতায়নে জীবের দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার সুখ দুঃখের গোপন হাওয়াই প্রবেশ করতো এবং চিত্তকে তদাকারিত করে তুলতো এক অপূর্ব সহানুভূতির সহিত। সে মুখের সামনে অপরের মুখখানি এমন এক জীবন্ত মুকুরে বিকশিত হয়ে উঠতো যে তার অন্তস্তলের সর্ব কাহিনীই প্রতিফলিত হয়ে ঐ চক্ষে ধরা দিত। প্রথম দেখে মনে হয়, এ উন্মাদ, এ নির্বোধ, কিন্তু শেষে সেই মূর্তিই সুসংযত অতিচ্ছন্দ ও অতীন্দ্রিয় হয়ে ধীরে ধীরে আমাদের হৃৎপুণ্ডরীকের দহরাকাশে বিকশিত হয়ে ওঠে।—মূর্তিখানি রোমাঁরোলাঁর ভাষাঙ্কিত চিত্রাবলম্বনে॥ ৯।৬।৫২

॥ দর্শনানন্দ ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আলোচনা হচ্ছে—শ্রীশ্রীঠাকুর গোলাপমার বাড়ী আসছেন দেখে গোলাপ মা আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বল্লেন, 'আমার এত আনন্দ সইবে না গো সইবে না! এবার আমি মলুম—এখন তোমরা বল আমি বাঁচি কি কোরে! আমার মেয়ে চণ্ডী সেপাই সান্ত্রী নিয়ে যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো, তখনও আমার এত আনন্দ হয় নি গো, এত আনন্দ হয় নি।

হায়! হায়! তার মরণের দুঃখও আজ আমার লেশ মাত্রও নেই। আমি ভেবেছিলুম, পরমহংসদেব বোধ হয় আসবেন না, যদি না আসতেন তো আমি সব জোগাড় গঙ্গায় ফেলে দিতুম, আর কখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলতুম না। যদিই বা হঠাৎ কোথাও দেখা হতো, দূর থেকে দেখে চলে যেতুম, সামনে আর কখনও যেতুম না। যাই সকলকে বলিগে, 'একবার তোরা আমার আনন্দ দেখে যা', যাই যোগিনকে বলিগে, 'একবার আমার ভাগ্যি দেখে যাক'। একবার এক মুটে লটারীতে লাখটাকা পেয়েছিল শুনে আনন্দে মারা গেল। আমারও বোধ হয় তাই হলো, তোমরা আমায় বাঁচাও।' ১০।৬।৫২

॥ মার্‌থা ও মেরী ॥

আলোচনা চলছে—শ্রীম একবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছেন, 'গোলাপমাদের দেখে বাইবেলের মার্থা-মেরীর কথা মনে পড়ে।' ঠাকুর বল্লেন, 'গল্পটা কি বলতো একবার?' শ্রীম বলতে লাগলেন, 'আপনার মত ভগবান যীশু একবার এক ভক্ত বাড়ী গিয়েছিলেন। তাঁকে সামনে দেখে এক ভগ্নির চিত্ত ভাবানন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। গৌরাঙ্গকে দেখেও একজনের ঐরূপ হয়েছিল, "আমার দুটো আঁখি আজ গৌরাঙ্গের রূপে ডুবে মরেছে, আর আমার কাছে ফিরে এলো না, জগৎ আর আমার দেখা হবে না। আমার পোড়া মনও ডুবল, সে সাঁতার ভুলে গেছে, সংসার আর তার দেখতে হবে না।"

'আর একজন বোন, প্রভু এসেছেন দেখে খাবার-দাবার জোগাড় করতে ব্যস্ত হলো। শেষে এসে বল্লে, "প্রভু! বিচার কর, আমার বোনের ব্যাপার দেখ। সে সারাদিন কেবল তোমার ঘরে বসে, আর আমি কেবল খেটে খেটে মরছি।" ভগবান বল্লেন, "তোমার বোনই ধন্য, সে সব ছেড়ে ভক্তির আশ্রয় করেছে'।'

অর্থাৎ পরা ভক্তিতে সর্বকর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। ১১।৬।৫২

॥ মুচির গল্প ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাই আলোচনা চলছে—মায়াকে চিন্তে পারলে সে তখুনি পালায়। এক গুরু শিষ্যবাড়ী যাচ্ছিলেন ; তল্পি বওয়ার লোক না পেয়ে এক

মুচিকে ধরলেন। মুচি কিন্তু রাজি নয়, যদি লোকে টের পায় মুচি, তো সকলে মিলে তাকে ঠ্যাঙাবে। গুরু বল্লেন, "তুই পরিচয় দিবি নি, বেশ আদরে থাকবি।" অগত্যা মুচি সম্মত হলো। একদিন গুরু সন্ধ্যাহ্নিক করছেন, আর একজন ব্রাহ্মণ এসে চাকরটাকে বল্লেন, "ঐঃ, আমার জুতো জোড়াটা নিয়ে আয়তো।" মুচি তাতে অপমান বোধ করলে, কারণ এখন তো সে বড় জাত, সে কোন উত্তরই দিলে না। ব্রাহ্মণ তাকে জুতো আনবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন। সে কিন্তু নির্বাক। তখন ব্রাহ্মণ চটে বল্লে, "ব্রাহ্মণের কথা শুনিস না, বেটা মুচি না কি?" ভৃত্য তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গুরুর কাছে গিয়ে বল্লে, "ঠাকুর মশায়! আমি চল্লুম, আমায় চিনে ফেলেছে।" ১২।৬।৫২

॥ বেড়া দেওয়া ॥

গাছ জন্মালে তাকে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, নইলে গরু ছাগলে মুড়িয়ে খাবে, একেবারে তাকে নষ্ট কোরে ফেলবে। কিন্তু গাছ বেশ বড় হয়ে গেলে আর সে ভয় থাকে না, তখন কত গরু, বাছুর, পথিক তার তলায় আশ্রয় নেয়, তার ছায়ায় বিশ্রাম করে, তার পাতায় ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। সেই রকম সাধনার প্রথম অবস্থায় নিজেকে সংসার, বিষয়-বুদ্ধি প্রভৃতি থেকে রক্ষা করতে হলে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, তখন নির্জন বাস করতে হয়, মৌনী হয়ে থাকতে হয়, লোক সংগ করতে নেই, নইলে সব ধর্মভাব চলে যায়। কিন্তু একবার সিদ্ধ হলে আর কোন ভয় নেই, প্রলোভনের বস্তু আর তাকে মুগ্ধ করতে পারে না। আর তা ছাড়া কত লোক তার কাছে শান্তি পায়, কত অসৎ লোক তার সংস্পর্শে সৎ হয়ে যায়, তার জীবন দেখে কত লোক এই অজ্ঞানান্ধকারে আলোর পথ দেখতে পায়।—প্রবর্তক সাধকদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এইসব উপদেশ ছিল। ১৩।৬।৫২

॥ "মাহুত নারায়ণ" ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আলোচনা চলছে—গুরু বল্লেন, "সবই ঈশ্বর।" শিষ্য সরল ভাবে তাই গ্রহণ করলে। একদিন রাস্তা দিয়ে একটা মস্ত হাতী আসছে, মাহুত ওপর থেকে বলছে, "সরে যাও, সরে যাও, হাতীটা ক্ষেপেছে।" শিষ্য

ভাবলে, "কেন সরবো, আমিও নারায়ণ, হাতীও নারায়ণ, এখানে আবার অনিষ্টের কি সম্ভাবনা?"—বলে, দাঁড়িয়ে রইলো। হাতীটা তাকে শুড়ে জড়িয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললে। শিষ্য খুব আঘাত পেয়ে গুরুর কাছে জানালে। গুরু বল্লেন, "তুমিও নারাযণ, হাতীও নারায়ণ, কিন্তু মাহুত নারায়ণ যে তোমাকে দূর থেকে সরে যেতে বলেছিল, তার কথা শুনলে না কেন?" সবই ঈশ্বর, কিন্তু মায়ায় ভেদ আছে; কোথায়ও প্রণাম করতে হয়, কোথায়ও দূর থেকে নমস্কার করতে হয়, কোথায়ও কাছে যেতে নেই, দেখলে পালাতে হয়। ১৪।৬।৫২

।। দৈব ও পুরুষকার ।।

শ্রীশ্রীপ্রভুর সমাধান—এক জ্ঞানী ও এক ভক্ত জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ কিছু দূরে এক বাঘ দেখতে পেয়ে জ্ঞানী বললে, "আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, কেন আমরা পালাব? ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনিই আমাদের রক্ষা কোরবেন। পুরাণে শোনা যায়, কত লোককে তিনি কতবার মৃত্যুমুখ হতে রক্ষা করেছেন।" ভক্ত বললে, "না ভাই, প্রভুকে আমাদের এই সামান্য রক্তমাংসের শরীরের জন্য অতটা খাটাতে রাজি নই, বরং এসো আমরা নিজেরা একটু পরিশ্রম কোরে সরে যাই, তা হলে সব গোল মিটে যাবে। তাঁকে আর অনর্থক পরিশ্রম করিয়ে কি হবে?" বিশ্বাস-হীনের বড় বড় কথা প্রলাপ মাত্র; বরং তার চাইতে পুরুষকার ভাল। যথার্থ বিশ্বাসীকে ভগবান সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। ১৫।৬।৫২

।। জন্মান্তর ।।

মৃত্যুর পূর্বে তোমার যে মনের ভাব হবে, পর জন্মে তুমি সেই আকার ধারণ করবে। মৃত্যুর পূর্বে যার সৎ ভাবের উদয় হয়, সে পরজীবনে উন্নতাবস্থা লাভ করবে। কাঁচা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর ফেব তাতে হাঁড়ি তৈরী করে, কিন্তু পোড়া হাঁড়ি ভাঙলে কুমোর আর তা গ্রহণ করে না। সেই রকম অজ্ঞানাবস্থায় মরণ হলে আবার তাকে জন্মাতে হবে, কিন্তু জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হয়ে মরলে আর তার জন্ম হয় না।

জ্ঞান হলে মানুষ বুঝতে পারে আত্মা সর্বব্যাপী শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব, তার জন্ম মৃত্যু নেই, জন্মান্তরও নেই। অজ্ঞানী কখন স্থূল দেহকে 'আমি' বলে, কখন বা মনটাকে 'আমি' বলে, কিন্তু পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে যেমন পেঁয়াজ বলে আর কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে 'আমি' বলে আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৬।৬।৫২

।। জীবের প্রকার ভেদ ।।

শ্রীশ্রীপ্রভু জীবের বিভাগ করছেন—মুক্ত, সংসারী ও বদ্ধজীব : : একাগ্র, বিক্ষিপ্ত ও মূঢ়।—লবণের পুতুল, কাপড়ের পুতুল ও পাথরের পুতুলকে সমুদ্রে বা জলে নিক্ষেপ করলে লবণের পুতুল একেবারে জলের সহিত মিশে যায়, তার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কাপড়ের পুতুলে জল প্রবেশ করে বটে কিন্তু তার স্বতন্ত্রতা যায় না; বরং ইচ্ছা করলে তাকে জল হতে পৃথক করা যায়। পাথরের পুতুলের ভেতর জল কোন প্রকারে প্রবেশ করতে পারে না।

মুক্ত জীব লবণের পুতুল : : বেল ফুলের মত সাদা খই : : চকমকি পাথর—হাজার বছর জলে থাকলেও, ঘা মারলেই আগুন বেরুবে। সংসারী ভক্ত কাপড়ের পুতুল : : দাগী খই। বদ্ধজীব পাথরের পুতুল : : বদ্ধজীব পাষাণের মত, গায়ে পেরেক বসে না। কুমীরের পিঠের মত, বর্শার আঘাত করলে বর্শা ঠিকরে পড়ে। তোতাপাখীর মত, বিড়ালে ধরলে রাধাকৃষ্ণ ভুলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। ১৭।৬।৫২

।। দরকারী কথা ।।

ভাব ভক্তি কী কোরে রক্ষা করতে হয়?—ঠাকুর বলতেন, "কলসীতে জল পুরে সিকেয় টাঙিয়ে রাখলে কিছু দিন বাদে জল শুকিয়ে যায়। কিন্তু কলসী গঙ্গাজলে ডুবিয়ে রাখলে জল শুকায় না, সেই রকম প্রেমময় ঈশ্বর-সত্তায় যে চিত্ত নিমগ্ন, তার প্রেম-ভক্তি কখন শুকায় না।"

ঈশ্বরের ধ্যান-জপ, পূজা-পাঠ, সেবাই ঈশ্বর-সত্তায় বাস। যত এই সব অনুশীলন করা যায় তত প্রেম-ভক্তি বৃদ্ধি হয়। মা বলতেন, "চন্দন না ঘসলে

গন্ধ পাওয়া যায় না। এই রকম সাধন-ভজন করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখন ঈশ্বরের কৃপা হয়, এই কৃপা হলে প্রেম-ভক্তি লাভ হয়। ঈশ্বর এই প্রেম-ভক্তির বশ, অন্য কোনরূপে ঈশ্বর লাভ হয় না। ঠাকুর বলতেন, 'গুবরে পোকাকে পদ্মের মধ্যে বসিয়ে দিলে ছটফট করে', বিষয়ীরা ঠিক তেমনি। ঈশ্বরীয় সুবাসে তারা বাস করতে পারে না।" ১৮।৬।৫২

।। তিন রকমের সাধক ।।

তিন রকমের সাধনের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—পাখীর মত, বানরের মত এবং পিঁপড়ের মত। পাখী উড়ে এসে এ ফলটা ঠোকরাচ্ছে ও ফলটা ঠোকরাচ্ছে, শেষে হয়ত পাকা ফলটা পড়ে গেল। শুধু ঠুকরে কি হবে? এ সাধন একটু, ও সাধন একটু কোরে লাভ নেই। ধীরে ধীরে ফলটা আস্বাদ করতে হবে, যেন সাধন স্খলিত না হয়। আবার বানরটা তাড়াতাড়ি ফল মুখে কোরে লাফ মারলে, অসাবধানে মুখের ফলটা গেল পড়ে। চঞ্চল ছট্‌ফটে সাধনের ফল হয় ঐ রকম, ধৈর্যের সহিত ধীরে ধীরে সাধন ভজন করতে হয়। "মন ভেবেছ কপটভক্তি কোরে শ্যামা মাকে পাবে। এ ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।" সাধন করতে হবে পিঁপড়ের মত, ধীরে ধীরে খাদ্য সঞ্চয় কোরে ভোগ করা। পিঁপড়ে খুঁজে খুঁজে আহারের সন্ধান পেলে, ধীরে ধীরে মুখে কোরে আশ্রয়ে নিয়ে গেল, নির্জনে আশ্রয়ে বসে উপভোগ করলে। ১৯।৬।৫২

।। জ্ঞানাভ্যাসের স্থানকাল ।।

স্বামিজী বলছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রেও জ্ঞানাভ্যাস করা যায়। গীতা যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রচারিত হয়েছিল। মনের তিনটে অবস্থা আছে—ক্রীয়াশীল, উদাসীন এবং প্রসন্ন। উদাসীন মনের স্পন্দন খুব মৃদু, ক্রীয়াশীল মনের স্পন্দন প্রচণ্ড, প্রসন্ন মনের স্পন্দন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। আত্মা দেহ-রথে বসে আছেন, বুদ্ধি-সারথি মন-লাগাম সাহায্যে তার ইন্দ্রিয়রূপ ঘোড়াগুলো নিজের ইচ্ছামত চালাচ্ছে। এই রথে কোরে মায়া-প্রান্তর পার হতে হবে—এ জগৎ অতিক্রম করতে হবে, চরম

সত্য-জ্ঞানানন্দ লাভ করতে হবে। যতক্ষণ মানুষ ইন্দ্রিয়ের অধীন, ততক্ষণ এই সংসার, যেই ইন্দ্রিয় জয় হলো, তখন সে ত্যাগী সন্ন্যাসী। ২০।৬।৫২

।। আত্মানাত্ম বিবেক ।।

কোন্‌টা আত্মা, আর কোন্‌টা অনাত্মা বিচার করতে করতে, খোল আর শাঁস, দেহ ও আত্মা পৃথক বলে বোধ হয়। সাধারণ নারকেলে পেরেক বেঁধালে পেরেক শাঁসে গিয়ে লাগে। কিন্তু খুড়রি নারকেলের খোল ও শাঁস আলাদা হয়ে যায়, পেরেক ফোটালে খোল ভেদ হয়, কিন্তু শাঁসে লাগে না। যীশুখৃষ্ট ছিলেন খুড়রি নারকেল; তাঁর খোল ও শাঁস অর্থাৎ দেহ ও আত্মা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ইহুদীরা তাঁর দেহ ক্রুশে তুলে পেরেক ফোটালো, তাতে খোলটা বিঁধলো, কিন্তু আত্মার কিছু হলো না। সেই জন্য পেরেক ফোটার নিদারুণ যন্ত্রণা পেয়েও তিনি শত্রুদের মঙ্গল কামনা কোরে পিতার নিকট প্রার্থনা করলেন। যত আত্মা ও অনাত্মার বিচার করবে, তত দেহের সুখ দুঃখ আত্মায় কম বোধ হবে। ২১।৬।৫২

।। নির্বাণের দাবী ঃ প্রারব্ধের শেষ ।।

"একদিন তথাগত চলেছেন রাস্তা দিয়ে
আমার বাড়ীর পাশের।
—আমার বাড়ী, একজন নাপিতের!
আমি দৌড়ে পালাচ্ছি, তিনি ফিরে থামালেন আমাকে।
—আমাকে থামালেন, আমি একজন নাপিত!
আমি বল্লুম—'প্রভু! আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলার অধিকারী?'
তিনি বল্লেন—'হাঁ বৎস!'—আমাকে, আমি একজন নাপিত!
জিজ্ঞাসা করলুম, 'প্রভু! আমার মত লোকেও কি নির্বাণের অধিকারী!'
বল্লেন, 'হাঁ বৎস!'—আমার মত, একজন নাপিতও!
'প্রভু! আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি?'
বল্লেন, 'নিশ্চয়!'—এমন কি আমিও, একজন নাপিত!

'প্রভু! আমি কি আপনার নিকটে থাকতে পারি?'
বল্লেন, 'পার।'—আমিও পারি—একজন দরিদ্র নাপিত!"

(অনুবাদ) —বৌদ্ধ গাথা॥ ২২।৬।৫২

॥ বিবেকানন্দের গুরু ॥

রোমাঁরোলাঁ বুঝেছিলেন, স্বামিজী কিরূপ শিক্ষক চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দের স্বভাব ছিল সকল দুঃখিত উৎপীড়িতদের সহিত নিজেকে এক কোরে চিন্তা করা। এই জন্য তিনি গুরু চেয়েছিলেন পৃথিবীর ধাতুতে গড়া এমন একটী মানুষ, যিনি আমাদেরই মত রক্ত মাংসে গড়া, আমাদের সুখ দুঃখে সুখী দুঃখী, আমাদের মর্ম বেদনায় সহানুভূতিতে পূর্ণ। যিনি অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অগ্নির সন্ধান শুধু দেওয়া নয়, সেই অগ্নি এনে আমাদের দিতে পারেন। যিনি আমাদের মধ্যে থেকে বলতে পারেন, 'আমি সেই চরম সত্য দর্শন করেছি, স্পর্শ করেছি, তাঁর সঙ্গে আমি একীভূত হয়ে আছি।' যুক্তির সময় হয়ত নরেন্দ্রনাথ অজ্ঞেয় বাদী হযে পড়তেন, সংসারে সয়তানের ক্রীড়া দেখতেন, কিন্তু এ বাহিরের দাঁতটী তাঁর আসল স্বরূপ নয়। পরন্তু যে দাঁতে তিনি খেতেন, সেটী দ্বৈতানুরঞ্জিত প্রিয় ও প্রিয়তমের সম্বন্ধাত্মিকা রাগানুগা ভক্তি। ২৩।৬।৫২

॥ প্রত্যক্ষ উপদেশ ॥

কোন ভক্ত দেখলে ঠাকুর তাকে কখন অগ্রাহ্য করতেন না, তার চিত্তের উপরিভাগে হয়ত ভাব ভক্তির অভাব, কিন্তু তার চিত্ততলে নিশ্চযই কিছু সঞ্চিত আছে; যা নিয়ে সে সংসার-বিদেশে কিছু ক্রয় করতে এসে রাস্তা হারিয়ে ঘুরে মরছে। সকল চিত্তের অন্তস্তলে সেই এক মহারত্নাকর রয়েছেন। তিনি স্বীয় 'হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিয়ে' সকল চিত্তের ভাব সম্পদের সন্ধান পেতেন। যখন উঠে আসতেন, তখন ঐ ডুবুরীর চোখে মুখে সেই মহাসমুদ্রের তলদেশের অতুল সম্পদের কোন না কোন জীবন্ত স্বর্গীয় ভাবের শৈবাল, গন্ধাদি লেগে থাকত—ভক্তেরা সেই অতল গভীর অজানার কিছু না কিছু তাঁর সেই সমাধ্যুত্থ চোখ মুখের ভাবভঙ্গী ও অস্পষ্ট বাণীর মধ্যেই প্রত্যক্ষ কোরে মুগ্ধ ও কৃতার্থ হোত। ২৪।৬।৫২

॥ ভারতের ধর্মযোদ্ধা ॥

রোমাঁরোলাঁ ভারতের এক মহান ধর্মযোদ্ধারূপে বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন। এ ঝড়-বিদ্যুতের মানুষটীর কপালটী ছিল যেন প্রাকৃতিক সংঘর্ষে ক্ষত বিক্ষত একটা অমসৃণ পর্বত চূড়ার মত; চতুর্দিকের এলোমেলো ক্ষয়কারী দুরন্ত হাওয়া সে দীপ্ত ললাটে ক্রমাগত আঘাত করেছে। ঐ দৃষ্টি আধ্যাত্মিক জীবনের প্রারম্ভভাগ ছাড়া আমৃত্যু কখন শ্রীরামকৃষ্ণের শান্ত মধুর আনন্দ ও শান্তি-আকাশের মুখ দেখে নি। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ঝড় বৃষ্টির উপক্রম দেখলেই শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্ত-পক্ষীটী সংসার মেঘের উর্ধ্বদেশে শান্ত স্বচ্ছ নির্মল চিদাকাশে বিশ্রাম করত। কিন্তু তাঁর এই অসীম শক্তি সম্পন্ন সেবকটী এই জীবনের তুমুল সংগ্রামেই পেত আনন্দ। প্রাচ্যের স্বপ্ন ও পাশ্চাত্যের বাস্তবের সংঘর্ষের স্থানটী ছিল ঐ প্রশস্ত ললাটাভ্যন্তর, যেখানে তারা ভবিষ্যতের একটা সমন্বিত গঠন ভাব প্রাপ্ত হয়েছিল। ২৫।৬।৫২

॥ আত্মার গান ॥

"পৃথিবীর সর্বকালে যে আছ যেখানে
জগতের যত পুরোহিত
আমি কাহারেও ঘৃণা নাহি করি।
আমার এ ধর্মমত গড়িয়াছি, দিয়ে সব ছোট ও বড়
মধ্যে এর পূজা হয় প্রাচীন প্রতিমা,
তথা যত নবীন প্রতীক
যাহা কিছু উপাসনা অতীত বা আধুনিক।
হে হতাশার কালো সংশয়াত্মা! শান্তি হোক তব।
তোমাদের সাথে যেন সুখে বাস করি
যেমন নিবাসি আমি অপরের সাথে।"

(Walt Whitman's "Song of myself" অবলম্বনে) ॥

এটী শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথের" দূর প্রতিধ্বনি। ২৬।৬।৫২

॥ বিবৃতি ॥

স্বামিজী একবার নিজ হৃদয়ের "মরমের কথা"র বিবৃতি দিয়েছেন—তোমরা ভাব তোমরা আমার চাইতে রামকৃষ্ণকে বেশী বুঝেছ। তোমরা ভাব জ্ঞান বড় শুষ্ক মরুভূমির রাস্তা, হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি নষ্ট কোরে ফেলে। কিন্তু জেন ভাব প্রবণতা ভক্তি নয়, এতে মানুষ একেবারে নির্বীর্য হয়ে পড়ে। তোমরা যে ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করতে চাও, সেটা তাঁর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দিক্। এ কর্মচক্র হতে তোমাদের হাত সরিয়ে নাও। তোমাদের কল্পিত ওরূপ রামকৃষ্ণকে কে চায়? কেই বা চায় তোমার ভক্তি ও মুক্তি? তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে, তাই বা কে গ্রাহ্য করে? আমি আনন্দে সহস্র নরকে যেতে রাজি আছি, যদি তমো আচ্ছন্ন আমার দেশবাসীকে নিজের পায়ে খাড়া করতে পারি, যদি একবার কর্মযোগে তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারি। আমি রামকৃষ্ণের দাস নই, আমি কেবল তাদেরই দাস, যারা নিজেদের ভক্তি মুক্তি ফেলে দিয়ে অপরের সেবা ও সাহায্য করে। ২৭।৬।৫২

॥ কর্তব্য ॥

স্বামিজী সাধারণ লোকের কর্তব্য বুদ্ধিটাকে খুব সন্দেহের চক্ষে দেখতেন—কর্মযোগের তুলনায় আমরা সাধারণতঃ যেটাকে কর্তব্য বলে বুঝি সেটা অনেকটা নিম্নস্তরের। তা হলেও আমাদের কর্তব্য করতে হয় এবং সেটা আমাদের এমন একটা বন্ধন যে সেটা অনেক সময় আমাদের দুঃখের হেতু হয়ে পড়ে। কর্তব্য নয়তো, যেন একটা ব্যায়রাম। জীবনের যেন একটা পাপ। কর্তব্যের কৃতদাসের দুর্দশা দেখ, তারা বুঝতে পারে না যে এটা একটা মহাশক্তিজাত বন্ধন, তাদের নাইবার-খাবার, পূজা-পাঠের সময় নেই। কর্তব্যের ভূত সর্বদা তাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। বাড়ীর বাইরে কাজ, ভেতরে কাজ, কর্তব্য দৈত্যের মত সিন্ধাবাদের কাঁধে চেপে বসে আছে—একটা কৃতদাসের জীবন, তারপর হঠাৎ একদিন রাস্তায় পড়ে মরা। এতে অনাসক্তি নেই, প্রেম নেই, বিশ্রাম নেই, স্বাধীনতা নেই, যেগুলো হলো কর্মযোগের লক্ষণ। ২৮।৬।৫২

।। ধর্মে যুক্তির স্থান ।।

স্বামিজী যুক্তিহীন ধর্মকেও খুব সন্দেহের চক্ষে দেখতেন, বলতেন, যদি আমায় কেউ জিজ্ঞাসা করে, ধর্মে বিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন করা চলে কি না? আমি বলব এখুনি। যুক্তি ও বিশ্লেষণ যে ধর্ম সহ্য করতে পারে না, তাদের জগতে না থাকাই ভাল, কারণ তা হলে বুঝতে হবে, সে সব কাল্পনিক মিথ্যা স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। যা সত্য তা নিশ্চয়ই ত্রিকালে সত্য অর্থাৎ অবিনাশী—বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা গবেষণা তার আর কী করবে? ধর্মের কী অধিকার আছে বলবার যে তারা যুক্তির বাইরের জিনিষ? বরং নাস্তিক হওয়া ভাল, তবুও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধার্মিক হওয়া ভাল নয়। এতে মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়—বিবেক না থাকলে মানুষের আর কি রইল! হয়ত ঋষি মহাপুরুষরা সব আছেন, তাতে তোমার কি এসে গেল, তুমি তোমার চিত্ত হতে যুক্তিকে কেন নির্বাসিত করবে? ঋষি, মহাপুরুষ হয়ে, তারপর তাঁদের কথায় বিশ্বাসী হওয়া উচিত। ২৯।৬।৫২

।। আত্মা ঃ ঃ প্রেম ও শক্তি ।।

স্বামিজী আত্মা বলতে অনন্ত প্রেম ও শক্তিকেই বুঝতেন—যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। যদিও এটা আত্মকেন্দ্রিক তথাপি স্বার্থপর বিশ্বাস নয়। এর অর্থ সকলেতে বিশ্বাস, কারণ আমার আত্মাই তো সকলের আত্মা। আত্মাকে ভালবাসা মানে সকলকে ভালবাসা; সেইজন্য আমার আত্মাতেই জগতের ঐক্য। সত্যের লক্ষণ ঐক্য। যা একত্বের বিধান করে, তাই সত্য। প্রেম সত্য কেন? কারণ প্রেম আমাদের সংহতির দিকে নিয়ে যায়। পরন্তু ঘৃণা মিথ্যার লক্ষণ, কারণ ঘৃণা ঐক্যের পরিপন্থী—ঘৃণাই ব্যক্তি, সমাজ, সংঘকে ছিন্ন ভিন্ন কোরে ফেলে। ঐক্যে প্রেমই সেনাপতি। প্রেম হলো জীবনের হৃৎস্পন্দ, যার অভাবে সমস্ত সংহতি, সংঘ, সমবেত প্রচেষ্টা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে। কাজেকাজেই প্রেমকে মহাশক্তি বা সর্বশক্তির প্রেরণা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। ৩০।৬।৫২

॥ সংকোচ ও বিকাশ ॥

মানুষই হোক বা একটা ফুলই হোক, শুধু তার বিকাশ স্বীকার করা চলে না, যদি না যে শক্তিটী বিকশিত হয়ে উঠছে তার পূর্ব-ভাবটী সুপ্তিরূপে স্বীকার না করি। তা না হলে কিছু নেই থেকে কিছুর উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। একটা যন্ত্র চালাতে গেলে জল, কয়লা, তেল, পেট্রোল, যা হোক একটা যান্ত্রিক ক্রিয়া-শক্তির সুপ্তি ভাব স্বীকার করতে হবেই। দস্তা, তামা, এ্যাসিডের মধ্যে বিদ্যুতের সুপ্তি ভাব স্বীকার করতে হয়। বিদ্যুদাধারের পরিমাণ অনুযায়ী বিদ্যুদস্ফুরণ যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তখন প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বে, তার সংকুচিত ভাবটা স্বীকার করতে হবেই। প্রাণের একটা অতি নিম্নস্তর, যেমন ধর একটা 'মোলাস্ক্' ;—পাতঞ্জল মতে তার মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে প্রাণের অতি উচ্চস্তর—বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি। ঐ জীবাণুটাই একদিন নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত হবে বুদ্ধত্ব। ১।৭।৫২

॥ পরার্থে ত্যাগ ॥

কথাটা হলো অহংকারের ত্যাগ, অহং-এর আলোকেই জগৎটা ভাসছে। স্বার্থ হলো ঐ প্রদীপের তৈলবর্তিক। যে তিল তিল করে নিজেকে পরার্থে বিলিয়ে দিতে পারে তারই ঐ অহংএর দীপশিখাটী নিভে যায়—তখন থাকে কেবল "শূন্যম্" "গম্ভীরম্"। একজন হয়ত দর্শন শাস্ত্রের একখানি বইও পড়ে নি, পূজা-পাঠ, প্রার্থনাদি কিছুই জানে না, কিন্তু সে পরার্থে জীবন উৎসর্গ কোরেছে, জনসেবায় কালক্ষয় করে, ধীরে ধীরে তার অহংএর নাশ হয়ে তার অন্তর্বর্তী সত্যসূর্য প্রকাশিত হবেন। মানুষের চিত্তে এক নিরন্তর স্রোত চলেছে— অহম্-অহম্-অহম্—স্বার্থ-স্বার্থ-স্বার্থ। প্রতি সেবায় ও ত্যাগে এই অহংএর পাহাড়টী ধ্বসে পড়ছে, আখেরে একেবারে ধ্বংস হবেই। ২।৭।৫২

॥ "স্বর্গরাজ্য তোমারই ভিতর" ॥

বাসনা ও বিপদ উভয়েরই মূল্য আছে। সুখে মহত্ত্ব আছে, দুঃখেও মহত্ত্ব আছে। তুমি যে অনেক দোষ করেছ, আবার অনেক ভাল কাজও

করেছ, তার জন্য তুমি আনন্দিত হও। তুমি যে সত্য পথে চলেছ বা ভুল পথে চলেছ, উভয়েরই জন্য তুমি সুখী হও,—কারণ তারা উভয়েই তোমায় যথেষ্ট শিক্ষাদান কোরে গেছে। ঐশ্বর্য এসেছে, তাতে ভয়ের কারণ কী? কেবল সত্য পথে চল এবং সত্য অনুভব কর, তা হলেই হলো। সবই শ্রীভগবানের। তোমার প্রত্যেক ইচ্ছা ও প্রযত্নে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। নিজের আমিটাকে একবারে মুছে ফেল। তোমার শরীরটা যেন ঈশ্বর-চালিত যন্ত্র হোক, দেখবে জগৎ তার জঘন্য ভীতিময় কলেবর ত্যাগ কোরে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হচ্ছে। প্রভু বলেছেন, "স্বর্গরাজ্য তোমার ভেতরেই।" তুমি ভিন্ন কেউ তা তোমার হয়ে আবিষ্কার করতে পারবে না। ৩।৭।৫২

।। অন্তর্যামিত্বের অনুভূতি ।।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহানুভূতির বিষয় আলোচনা হচ্ছে—কালী বড় মাছ ধরতে ভালবাসেন। ঠাকুর একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই এত নিষ্ঠুর কেন?" কালী বল্লেন, "আমি আর কি অপরাধ করেছি, আত্মা তো অবিনাশী।" ঠাকুর বল্লেন, "বাছা! তুমি নিজেকে ঠকাচ্ছ। যে মানুষ নিজের মধ্যে অন্তর্যামী ভগবানকে উপলব্ধি করেছে, সে কখনও অপরকে হিংসা করতে পারে না, তা হলে সেই অন্তর্যামী নিজের আত্মাকেই হিংসা করা হয়।" ঠাকুরের এই অবস্থাটা এমন গভীর হয়ে চিত্তে দেখা দিয়েছিল যে তিনি গাছের ফুলটী পর্যন্ত ছিঁড়তে পারতেন না, কচি ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে তাঁর বুকে কালসিটে পড়তো। গঙ্গার চাঁদনী ঘাটে একজন মাঝি আর একজনকে মারলো, তাঁর পিঠে চড়ের দাগ উঠলো, চিৎকার কোরে উঠলেন। কী অপূর্ব অনুভূতি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃখেরও কী সূক্ষ্মানুভূতি একবার বোঝ! ৪।৭।৫২

।। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ।।

পাশ্চাত্যের এক মহা সমস্যা! রোমাঁরোলাঁ দেখলেন, শয়তান এসে বুদ্ধির এক সূচ্চস্তরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'ঐ দেখ নিম্নে বিরাট সাম্রাজ্য, এই দেখ তার শাসনের বৈজ্ঞানিক যাদুকাঠিটী আমার করায়ত্ত। এখন কী

চাও? নিরীহ দুর্বল খৃষ্টের জগৎ, না, বিপুল ঐশ্বর্যময়ী ধরা? সংযম ও দারিদ্র্য, না, ভোগ ও আমোদ? ইউরোপ ঐ যাদুকরের কথা শুনলো এবং পেল এক ভোগৈশ্বর্যময়ী বিস্তীর্ণা পৃথিবী। কিন্তু এই প্রবর্তক যাদুকরেরা এখন মহা বিপন্ন; জড় শক্তির ভূতপ্রেতগুলো কারাগার ভেঙে বেরিয়ে পড়ছে। তাদের বশীভূত করবার মন্ত্রগুলি তাদের জানা নেই—কোন্ শক্তি এই জড় পৈশাচিক নিষ্ঠুর ভয়ঙ্করদের আয়ত্ত কোরে ফের তাদের কারারুদ্ধ করতে পারে। তাই আজ পাশ্চাত্য শীর্ণ প্রাচ্য-যোগীদের শরণাপন্ন। ৫।৭।৫২

॥ যোগ প্রক্রিয়া ॥

শরীরের ভেতর যে সব সূক্ষ্ম নাড়ী আছে, সে সব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, তারাই স্থূলগুলোকে চালায়, অনুমানের দ্বারা তাদের স্বীকার করতে হবেই। আবার তাদের পেছনে আরও সব সূক্ষ্মক্রিয়া রয়েছে, যাদের আমরা চিন্তা বলি। এই চিন্তার পেছনে রয়েছে এক সাক্ষী, জ্ঞানালোক, যাকে আমরা আত্মা বলি। এ সব বুঝতে গেলে আমাদের অনুভূতিকে সূক্ষ্ম করতে হবে। যন্ত্রপাতি দিয়ে কোন কালে এখান হতে প্রবাহিত এর তরঙ্গগুলো সামনাসামনিভাবে প্রত্যক্ষ হবে না। এ করণহীন বা যন্ত্রহীন স্বানুভূতিগুলি প্রত্যক্ষসমানাকাবা অর্থাৎ প্রত্যক্ষেরই মত। এই আন্তর প্রক্রিবাগুলি জানবার জন্য অস্মদ্দেশীয় যোগীরা একটা মনসংযোগ-পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন, যাকে স্বামিজী রাজযোগ বলেছেন, যে সব অভ্যাসের দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণের সব যন্ত্রাগ্রাহ্য ক্রিয়াগুলি এবং তাদের মূল-শক্তি সংস্কারগুলি প্রত্যক্ষের ন্যায় নিজেদের আত্ম-প্রকাশ করে। ৬।৭।৫২

॥ জীবন চিহ্ন—বৈচিত্র্য ॥

স্বামিজী একবার একজনকে লিখছেন, 'আমি একটা গোরস্থানে বাস করতে রাজি নই। আমি জীবন্ত মানুষের মধ্যে জীবন্ত মানুষ হয়ে বাস করতে চাই। বৈচিত্র্য হলো জীবনের চিহ্ন। মত-বিরোধটাই হচ্ছে চিন্তার সর্ব-প্রথম অভিব্যক্তি। প্রার্থনা করি, তারা যেন ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং

সর্বশেষে সকলেরই জন্তে একটা কোরে দল হয়। ঘূর্ণীচাক তৈরি হয় কোথায়? —যেখানে জলের প্রচণ্ড প্রবাহ অর্থাৎ একটা জীবন্ত স্রোতস্বিনীতে। চিন্তার সংঘর্ষই নবনব চিন্তার উদ্ভব করে। প্রত্যেকের ধর্ম সম্বন্ধে নিজনিজ অভিমত থাকুক তাতে ক্ষতি নেই। এ চিরকালই ছিল এবং থাকবে। এই হলো স্বাধীনতা—প্রত্যেকেই স্বস্ব ভাবে চিন্তা করবে—কিন্তু এই স্বাভাবিক রাস্তাটা চিরকালই বাধা প্রাপ্ত হযে আসছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু এতে হবে কি? না, পুনঃপুনঃ অভিনব চিন্তার উদ্ভব।' ৭।৭।৫২

॥ শ্রেষ্ঠ দান ॥

স্বামিজী আবার একজনকে লিখেছেন,—"সোনা রূপা আমার কিছু নেই, তবে যা আমার আছে, তা মুক্ত হস্তে দান করছি।" সেটা হচ্ছে জীবের স্বরূপ-জ্ঞান, যা সোনা রূপার সারবস্তু এবং সর্ব নরনারীরও সারবস্তু। সর্ব প্রাণীর সর্ব উদ্দেশ্য ঐ তত্ত্বকে জানা; ঐটে জানতে গিয়ে জগতে নানা বিবর্তন চলছে। আসল কথা হলো ব্রহ্ম আমাদের স্বরূপ; তিনিই শাশ্বত দ্রষ্টা—তাঁকে কখন ইন্দ্রিয়গোচর করা যাবে না—তাঁকে টেবিলে রেখে পরীক্ষার অপচেষ্টা কেউ যেন কখন না করে। এইটে বুঝতে পারার নাম সন্ন্যাস। যত অন্তরাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তত কামাদি সুখদুঃখাদিজন্য শারীর-বিবর্তন কমতে থাকবে। পরমাত্মা অশরীরী। 'আমি চৈতন্যস্বরূপ', 'আমি জড় নই', এইটে ভাবাই হচ্ছে ধ্যান, ধারণা, সমাধির উদ্দেশ্য। মানুষ এই ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা করতে পারে বলে মানুষ। ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয় গ্রহণ করতে পারলেই মানুষ হয় না, তাদের প্রাণী বলা যেতে পারে। ৮।৭।৫২

॥ ত্যাগ ও স্বার্থ ঃ ঃ প্রেম ও ঘৃণা ॥

স্বামিজী বলছেন যে, আমাদের ঋষিরা সামাজিক যা কিছু ব্যবস্থা করেছেন, সবই ত্যাগ জিনিষটা শেখাবার জন্য। আমাদের শাস্ত্রে বিবাহাদি সামাজিক জীবন বলতে ইচ্ছাশক্তি বা বাসনাসমূহের সংযম বোঝায়। হিন্দু সমাজের প্রধান চাকা ঘুরছে বাসনা ত্যাগ বা অধ্যস্ত আমির বিসর্জনোদ্দেশ্যে—'নাহম্', 'নাহম্'।

আত্মাকে কেউ কখন বিষয় করতে পারবে না, কারণ যে করবে সে নিজেই আত্মা ; আত্মাকে বিষয় কোরতে গেলেই, বিষয়ী ও বিষয় উভয়ই অন্তর্ধান হবে। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ মানে এই অহমিকার বাসনা-শক্তি রোধের চেষ্টা। সর্বভূতস্থিত একাত্মার সেবা বা প্রেম হচ্ছে সব চাইতে অনায়াস-সাধ্য উপায়, যাতে এই মিথ্যা অহমিকার স্বাতন্ত্র্য নাশ পায়। দ্বৈত থেকে ঘৃণার উৎপত্তি। আমি জগৎ এবং অন্যান্য জীব হতে ভিন্ন, আমার স্বার্থ এবং অস্তিত্ব আগে। এই স্বার্থরক্ষা সংগ্রামের নায়ক ঘৃণা। প্রেম তার বিপরীত পক্ষ। ৯।৭।৫২

॥ স্বর্গরাজ্য ॥

স্বামিজী আন্তর দিব্যধামের খবর দিচ্ছেন—মানুষকে নানারূপ ইন্দ্রচন্দ্র উপাখ্যানের ভেতর দিয়ে, স্বর্গ-নরকের গল্পের মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে আত্মরাজ্যে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হযেছে। কেবল জ্ঞানীরা গল্পের মাধ্যম ত্যাগ কোরে, বরাবর আত্মায় পৌছবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের তিনটে জিনিষ ছিল সহায়—জগতের অনিত্যতা, আত্মবোধের বিশ্লেষণ এবং বাসনা ত্যাগ। খৃষ্টানদের ভূস্বর্গ ইতিপূর্বেই প্রতি জীবের অন্তরে অনাদিকাল ধরে স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান। যেমন কস্তূরীমৃগ, নাভির গন্ধে চারি পাশে ছুটে বেড়ায়, সেইরূপ আমরাও আত্মানন্দকে বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। বাইরে জীবনের অনুসন্ধান করছি—জীবন যত দীর্ঘ হবে সুখ দুঃখের নেশাও তত দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। এ জগতে ঢিলের সঙ্গে পাটকেলটা থাকবেই—আর সূর্য যত পথ অতিক্রম করবে, তার ছায়া, যা তার বিপরীত, ততই দীর্ঘ হবে। ১০।৭।৫২

॥ ধর্ম ও সমাজ ॥

স্বামিজী একজনকে লিখছেন যে, কেউ যেন অপরের অধিকারে হাত দিতে না যায়, আপন কর্মসীমার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে নিযুক্ত রাখাই উচিত। শিক্ষা হচ্ছে, প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত অনাদি পূর্ণত্বকে জানা, আর ধর্ম হচ্ছে মানবের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মত্বের স্বরূপ-জ্ঞান। ধর্মের কাজ কেবল আত্মাকে নিয়ে; সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্মের কোন সংশ্রব না রাখাই ভাল।

সমাজতত্ত্ব একটা ভিন্ন বিষয়,—অবস্থানুযায়ী মানবগোষ্ঠির রক্ষার জন্য ব্যবস্থা, এতে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাহায্যও দরকার, কু-সংস্কার দূর করবার জন্য। এতদিন ধর্মের ভয়ানক ভ্রম হয়েছে সমাজের সহিত ধর্মের, অবিদ্যার সহিত বিদ্যার সামঞ্জস্য বিধান করবার জন্য মাথা ঘামান। বিজ্ঞান যেমন দৃশ্য জগতের আবিষ্কার কোরে লোক-চক্ষে সেগুলোকে ধরে দিয়েই খালাস, ধর্মও তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের সত্যগুলো আবিষ্কার কোরে, তার ফল-গুলোকে লোকের চোখের সামনে ধরে দিয়ে খালাস। সমাজ কিরূপ হবে না হবে, তা সমাজ সভ্যদের চিন্তার বিষয়। ১১।৭।৫২

॥ বর্তমান বীর ॥

বর্তমান সমস্যায় স্বামিজীর মত—'ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা অনেকেরই আছে, কিন্তু তিনিই বীর যিনি সংসার-তরঙ্গ দেখে ভয় পান না। যিনি এক হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে অপরকে সাহায্য করেন।' একদিকে জড়বৃক্ষবৎ কষ্ট সহিষ্ণু লোকারণ্য, আর এক দিকে ধৈর্যহীন কুঠার-হস্ত সংস্কারকগণ—কল্যাণের পথ এর কোনটাতেই নেই। একটা পুতুলকে ভাল বাসলে নাকি পুতুলটাও জীবন্ত হযে ওঠে, হে বন্ধু! এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদ-বিদলিত, চিরবুভুক্ষু, কলহশীল, পরশ্রীকাতর তোমার এই স্বদেশীদের যদি ভালবাসতে পার, আশা করি একদিন তারা জড়নিদ্রা ত্যাগ কোরে জীবন্ত হয়ে উঠবে। হে সখে! শতশত মহাপ্রাণ নরনারী কি কখন ভোগ সুখেচ্ছা বিসর্জন দিয়ে কায়মনোবাক্যে অভাব ও অজ্ঞানের আবর্তে মজ্জমান আমাদের এই দেশবাসী রাম শ্যাম, প্যালা পঞ্চাকে কল্যাণের পথ দেখাতে পারবে? ১২।৭।৫২

॥ সনাতন রথচক্র ॥

স্বামিজী তাঁর একটা জীবনের অভিজ্ঞান প্রকাশ করছেন—সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সমাজটা অন্যান্য জাতির আয়ুকে পরাজিত কোরে এখনও যখন বেশ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, তখন তাকে আজ হঠাৎ বলা চলে না,

যে 'এটা একটা দুঃস্বপ্ন'। সমাজ বলো, আর যা কিছু বলো, সব চলছে, ক্রমাগত চলছে, দাঁড়িয়ে বিশ্রাম মানে তুমি পরাভূত। আমাদের সমাজ কয়েকদিনের জন্য সত্যই একটু দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু এইবার আমরা কোটী কোটী লোক এই সমাজ-রথে এমন সমবেত ধাক্কা দেব যাতে এই বিরাট রথচক্র আবার দুর্বার গতিতে চলতে থাকবে এবং এর সুমহান উদ্দেশ্যে গিয়ে পৌছুবে। অমনি বললেই হলো, 'হে মূর্খগণ! তোমরা তোমাদের ঐ জাতীয় ও সামাজিক সংহিতাগুলি ছিঁড়ে ফেল, আর আমার এই বছর কয়েকের বাতাসার রং করা মঠ এবং মাটির খেলনাগুলো গ্রহণ কোরে আনন্দ কর।'—এ বাতুলতা; পার তো সাহায্য কর, নইলে সরে পড়। কোন প্রতিদান চেও না। নইলে, 'পৌত্তলিকদের খৃষ্টান্ করবার জন্য এত টাকা দিচ্ছি'—এটা দান নয় পৌরহিত্যের ব্যবসায়। 'আমার কথা শুনলে সাহায্য করব'—ঐ একই স্বার্থপরতা। ১৩।৭।৫২

॥ সার্বভৌম মহাব্রত ॥

স্বামিজী আবার আর একজনকে লিখছেন 'মতামত কি অন্তর স্পর্শ করে? কাজ! কাজ!—জীবন দেখান চাই, মতে ফতে কি এসে যায়। যাগযজ্ঞ, হৃষীকেশ, উত্তরকাশী, ঠাকুর ঘর, উৎসব—এ সব ব্যক্তিগত বা কোন বিশিষ্ট কালের ধর্ম হতে পারে,' কিন্তু পাতঞ্জলির সার্বভৌম মহাব্রত হচ্ছে—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। গীতা বলছেন, "সর্বভূত হিতে রতঃ।" স্বামিজী আবার বলছেন,—'সেবাই একমাত্র সার্বভৌম মহাব্রত।' এ ধর্ম শুধু মানুষে নয়, পশুও বুঝতে পারে। মানুষের চাইতে পশুরা হিতকারীর অতি-শীঘ্র বশ হয়। শুধু নেতিমূলক ধর্মে কি হবে?—শুধু 'এ কোরো না', আর 'তা কোরো না'। পাথর ব্যভিচার করে না, গরু মিথ্যা কথা বলে না, গাছ ডাকাতি করে না; কিন্তু তবুও এরা মানুষের চাইতে নিশ্চয়ই ছোট। বাপু হে! তোমার স্বার্থকেন্দ্রিক আট ঘণ্টা ধ্যানে ব্রহ্মের বা জগতের কি এসে গেল? ১৪।৭।৫২

॥ আদান প্রদান ॥

স্বামিজী ভারত-ভারতীকে উদ্দেশ কোরে একবার লিখছেন, 'প্রকৃতির ব্যাপার চলেছে আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে। কেবল নিয়ে বা কেবল দিয়ে কেউ পুষ্ট হতে পারে না। ভারতকেও যদি নিজের পুষ্টি বিধান করতে হয়, তা হলে নিজের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার অপরের কাছে খুলে দিতে হবে এবং অপরের যা ভাল তা বিচার পূর্বক গ্রহণ করতে হবে। জীবনের চিহ্ন সম্প্রসারণ ; জীবনের সঙ্কোচই হলো মৃত্যু। ঐক্যই জীবন, বিচ্ছেদই মৃত্যু, প্রেমই জীবন, দ্বেষই মৃত্যু। যে দিন থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করলুম যে আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বা বর্ণ, সেই দিন হতেই ভারতের সর্বনাশ আরম্ভ। আবার যতদিন না আমরা প্রেম ও সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে আমাদের যে অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে, তা সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে দেব, ততদিন আমাদেরও জীবন ধারণের উপযোগী সাহায্য আমরা অপরের কাছ থেকে পাব না। যত পৃথিবী ভ্রমণ করবে, তত নিজেদের "কূপ-মণ্ডূকত্ব" দূর হবে।' ১৫।৭।৫২

॥ ভালমন্দ ॥

স্বামিজীর অভিজ্ঞান—ভালমন্দে জগৎ মেশান। কেবল ভালটা বা কেবল মন্দটা দেখে কোন জিনিষের তাৎপর্য গ্রহণ করা উচিত নয়। অসৎ দিয়ে একটা দেশ বা ব্যক্তিকে বিচার করা চলে না। অসৎ হচ্ছে দেশের আগাছা। খুঁজে বার করতে হবে সে দেশে ভাল গাছ আছে কিনা, তা দেখেই সে দেশের মাটীর উদ্ভাবনী শক্তি বোঝা যাবে। কোন দেশের অসচ্চরিত্রদের দিয়ে সে দেশের বিচার চলে না ; জাতির সাধু জীবনের ভেতর দিয়ে বোঝা যায় যে জাতি কি রকম নির্মল ও সতেজ। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে যদি অপক্ক, অপরিণত, কীটদষ্ট ফলের সঙ্গে একটীও ভাল ফল পাওয়া যায়, তা হলেই বুঝতে পারা গেল গাছটীর উৎপাদনী শক্তি কিরূপ। ভারতকে সব দেশের গাছের তলায় ঘুরে ঘুরে ভাল ফল জোগাড় করতে হবে ; কীটদষ্ট অপরিণত ফল দেখে অনুসন্ধান ছাড়লে চলবে না। ১৬।৭।৫২

॥ বিবেকানন্দের উপাসনা ॥

আমি তুমি আর যা কিছু সব ব্রহ্ম। নিজের উপাসনা কর, সেই সঙ্গে সকলের উপাসনা কর। মন্দির আর কোথায়, এই দেহই মন্দির, একে ক্রমাগত ধৌত কর, ক্রমে সব ময়লা, সব কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে। হিন্দুদের ত্রিসন্ধ্যাস্নান, সন্ধ্যামন্ত্র সব দেহের ও মনের ময়লা ধোয়ার প্রতীক, বাইরের মন্দিরে তুমি যাও আর না যাও তাতে কিছু এসে যায় না। দেবতা তোমার দেহের ভেতর। তাঁকে বাইরে থেকে কখনও ভেতরে আনা যাবে না, তিনি হৃদয়ে রয়েছেন চিরন্তন, অমর অনাদি হয়ে। প্রত্যেকের দেবতা এই এক দেহ মন্দিরে বাস করেন, সর্বদা একে পরিষ্কার রাখ, কখন অশুচি হতে দিও না। এই হলো একমাত্র মন্দির, এর ভেতর সেই রাজাধিরাজ বাস করেন। এঁর সন্ধানে ফিরেই আমরা জোগাড় করি পাথরের পুঁতুল এবং তাই নিয়ে খেলা জুড়ে দেই। গঙ্গার ধারে বাস কোরে জল খুঁজে বেড়াই। চারিপাশে ব্রহ্ম, তবুও আমরা ব্রহ্ম খুঁজে বেড়াই। ভেতরের ব্রহ্মকে বাইরে রূপ দিয়ে আমরা কত সুখই না পাই! ১৭।৭।৫২

॥ উদারতা ॥

স্বামিজী একবার লিখেছিলেন, অবতার-জীবন দেখা যায় মহা উদার, যা ঈশ্বরের বাণী, তাও মহা উদার। স্মৃতি পুরাণাদি সামান্য-বুদ্ধি মানুষের তৈরী, সেইজন্য ভ্রম, প্রমাদ, ভেদ-বুদ্ধি এবং বিদ্বেষে জর্জরিত। তার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ সেইটুকুই গ্রাহ্য, বাকি ত্যজ্য। উপনিষদ্, গীতা যথার্থশাস্ত্র ; রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতিই যথার্থ অবতার। এঁদের হৃদয় আকাশের ন্যায় উদার, নির্মল, প্রশস্ত এবং সকলের ওপর রামকৃষ্ণ—সর্ব ধর্ম, মত, পথ, দীন, দুঃখীর বন্ধু। শঙ্কর রামানুজে এ হৃদয় কোথায়?—এ প্রীতি, এ পরদুঃখ কাতরতা বুদ্ধে, চৈতন্যে আছে—কিন্তু তাঁদের রাস্তা মাত্র একটী। সংক্ষেপে পরোপকারই কর্ম, আর সব বিকর্ম, আর ব্রহ্মজ্ঞানই অকর্ম। যারা কেবল নিজের মুক্তি খুঁজে বেড়ায়, তাদের অহমিকা সারে কি কোরে? ১৮।৭।৫২

॥ অন্তর্ ও বহিঃ সংযম ॥

বিভিন্ন জাতি প্রকৃতিকে সংযত করবার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। একটা সমাজের লোকেরা হয়ত বহিঃপ্রকৃতির সংযম নিয়ে ব্যস্ত, আবার অপর সমাজ হয়ত আন্তর প্রকৃতি জয় নিয়ে ব্যস্ত। আবার বিভিন্ন সমাজ নিয়ে একটা জাতি হয়, সেইজন্য এক একটা জাতির প্রচেষ্টারও ভিন্নতা দেখা যায়। প্রত্যেকেই মনে করে তাদের চেষ্টা অপরের চেষ্টা হতে ভিন্ন এবং ঠিক, পরন্তু অপরের গুলো ভুল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এক মহাশক্তিই দুটীরূপে বিভক্ত হয়ে খেলা করছেন—চিত্তশক্তি এবং বিশাল বাহ্যজগৎ। যখন উভয় পক্ষ তাদের বিশ্লেষণ প্রণালীর চরমে গিয়ে পৌঁছয়, তখন দেখে যে তারা একটা বৃত্তের একই বিন্দু থেকে বিপরীত দিকে রওনা হয়েছিল, এখন অবশেষে তারা পরস্পর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অব্যয়-দার্শনিকেরা দেখে জগৎ ও মন ঐ অব্যয়েরই দুটো অভিব্যক্তি এবং জড়-বৈজ্ঞানিকেরাও এসে পড়ে সেই একই অব্যয় সত্তায়। ১৯।৭।৫২

॥ বিদ্যার সংসার ॥

আজকের কথামৃত আলোচনার সার কথা হলো—ঈশ্বর জেনে সংসার করলে আর গোল থাকে না, তারা জানে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। তারা ছেলে-পুলেকে গোপাল বলে জানে, বাপ-মাকে হর-পার্বতী জ্ঞানে সেবা করে, স্বামী স্ত্রী নিজেদের দেহ ভুলে তাঁর পূজা, অর্চ্চা, হরিনামে বিভোর থাকে। আর নইলে একজনকে ছেড়ে আর একজন ধর্ম করতে গেলেই বাধবে গোলমাল—স্বামী ভাববে স্ত্রী তার অনুগত নয়, স্ত্রী ভাববে স্বামী তার কর্তব্য করছে না। আবার দুঃখ-দারিদ্র্য এলে পরস্পর পরস্পরকে গালমন্দ করে। স্বামী বলে, আমার দেখবার কেউ নেই, স্ত্রী বলে আমার গয়নাগাঁটী হলো না। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে ভণ্ড মনে করে। সংসারধর্ম বড় জটীল, তার ওপর আবার নিত্যি রোগ, দুঃখ, অভাব, অনটন, মনের গরমিল, অবাধ্য ছেলেপুলে—বোকা, গোঁয়ার—এই সব নিয়ে চলতে হয়। উপায় নির্জনে কেঁদেকেঁদে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। ২০।৭।৫২

॥ পণ্ডিত ও সাধু ॥

আজও পড়া চলছে। পণ্ডিত ও সাধুতে অনেক তফাৎ। পণ্ডিতের মন কামকাঞ্চনে আবদ্ধ, আর সাধুর মন থাকে হরিপাদপদ্মে। পণ্ডিত বলে এক, কিন্তু কাজে করে আর এক। কিন্তু সাধুর ভাবের ঘরে চুরি নেই, তার মনমুখ এক। সাধুর ভেক নিয়ে ভাবের ঘরে চুরি থাকলে, মন মুখ এক না হলে, সেও চোর। কাশীতে এক সাধু ছিল নানকপন্থী, শ্রীশ্রীঠাকুরকে সে বলতো, প্রেমিক সাধু। তাদের মঠের মোহান্তের প্রকৃতিভাব, যেন গিন্নি। দেহে প্রকৃতি-ভাব এলে কাম জয় হয়। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "উপায় কী ?" তিনি উত্তর দিলেন, "নারদীয় ভক্তি," অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—ভগবানে প্রেমও থাকবে, আবার ইষ্টানিষ্ট বিচারও থাকবে। তিনি একখানি বই থেকে স্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন, "জলে বিষ্ণু, স্থলে বিষ্ণু, অনলে অনিলে বিষ্ণু, পর্বতে বিষ্ণু, আকাশে বিষ্ণু, সর্বজগৎ বিষ্ণুময়।" তারপর বল্লেন, "শান্তি হোক, শান্তি হোক, চির শান্তি হোক।" তিনি একদিন গীতা পড়লেন, ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে এবং গেরস্থদের দিকে পেছন ফিরে। বলেছিলেন, "নারদীয় ভক্তিই কলিযুগের ধর্ম।" এ মত শ্রীশ্রীঠাকুরেরও সম্মত। ২১।৭।৫২

॥ সত্যময়ী জীবন্ত-ভাষা ॥

স্বামিজী একজনকে লিখেছিলেন, পুঁথি-পত্র বাজে জঞ্জাল লিখে কী হবে ? লোকের অন্তর স্পর্শ করতে হলে জ্যান্ত লোকের মুখ থেকে যে জ্যান্ত ভাষা বেরোয়, সেইটাই হচ্ছে প্রধান উপায় ; সেই ভাষার ভেতর দিয়ে, সেই ব্যক্তির ভেতর দিয়ে যে ভাবের বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলছে, তা অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যায়। সত্যকে জীবনে প্রয়োগ করতেকরতে ভেতরে এক প্রচণ্ড শক্তি জন্মায়, তা সে যে বিষয়ই নিয়ে থাক, তার ভেতর যে সত্য, সেটা একটা অপ্রতিহত রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে থাকে। আসল কথা হচ্ছে, সত্যময় জীবন—এ এমন একটী ক্ষয়করী পদার্থ যে এর সামনে যদি গ্রানাইটের একটা পাহাড়ও দাঁড়িয়ে এর গতিরোধ করে, সত্য-জীবন তাকে ধীরে-ধীরে জীর্ণ কোরে তার ভেতর দিয়ে তার প্রশস্ত রাজপথ তৈরী কোরে নেবে। পরোপকারের উপদেশ দেওয়া, উপায় নির্দেশ করা, আর পরোপকার হাতেনাতে করা আকাশ পাতাল তফাৎ। ২২।৭।৫২

॥ "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" ॥

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"—স্বামিজী লিখছেন, সত্যের জয় চিরকালই হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণের যেন ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তা হলে আর সব ঠিক চলবে। আমরা বেঁচে থাকতে এর কোন ফল দেখে যেতে না পারি; কিন্তু আমরা বেঁচে আছি, এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নেই, সেইরূপ নিঃসন্দেহে শীঘ্র বা বিলম্বে এর ফল ফলবেই ফলবে। ভারতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন—তার জাতীয় ধমনীর ভেতর নব-বিদ্যুদগ্নি সঞ্চার। এরূপ কাজ চিরকালই ধীরেধীরে হয়ে এসেছে, চিরকালই ধীরে হবে; এখন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কোরে শুধু কাজ কোরেই খুশি থাক; সর্বোপরি পবিত্র ও দৃঢ় চিত্ত হও এবং মনে প্রাণে অকপট থাক—তোমাদের ভাবের ঘরে যেন এতটুকুও চুরি না থাকে, তা হলেই দেখবে আর সব ঠিক্ঠাক্ হয়ে যাবে। যদি তোমরা শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ লক্ষ্য কোরে থাক, সেটী দেখবে এই লক্ষণটী—তারা একেবারে সম্পূর্ণ অকপট। কি জান? শতশত জীবনের কত কঠোর চেষ্টার ফলে একটা চরিত্র গঠিত হয়। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির একটা কথা পর্যন্ত নষ্ট হয় না, হয়ত তা শতশত যুগ ধরে কোন আবর্জনাস্তূপের অন্ধকারে চাপা পড়ে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকতে পারে, কিন্তু আজ হোক বা কাল হোক, তা ভেড়ে ফুঁড়ে বেরুবেই। জেন বৎস! সত্য অবিনশ্বর, ধর্ম অবিনশ্বর, পবিত্রতা অবিনশ্বর। ২৩।৭।৫২

॥ মহাত্মা ॥

স্বামিজী লিখছেন, আমি গরীব, গরীবদের আমি বড় ভালবাসি। ভারতের চিরপতিত নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদে বল দিকি? তাদের উদ্ধারের উপায় কখন চিন্তা কোরেছ কি? এমন কে আছে হৃদয়বান যে দ্বারেদ্বারে ঘুরে তাদের ঘরে আলো নিয়ে যাবে? এদের তোমাদের ঈশ্বর, দেবতা, ইষ্ট করতে পার? তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তা না হলে সে তো দুরাত্মা। হয়ত আমরা কাজে কিছু না কোরে উঠতে পারি, হয়ত আমাদের অজ্ঞাতভাবেই এ রঙ্গমঞ্চ হতে বিদায় নিতে হবে, হয়ত আমরা কোন সহানুভূতির মুখ দেখব না বা কেউ এক ফোঁটা

চোখের জলও আমাদের জন্য ফেলবে না, কিন্তু জেন বন্ধু! আমাদের একটা শুভ চিন্তাও নষ্ট হবে না—এর ফল আজ, না হয় কাল ফলবেই ফলবে। ভারতের কোটীকোটী দরিদ্র, দীন, দুঃখী অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে। তাদের পয়সা ও পরিশ্রমে যারা সভ্য, কিন্তু তাদের প্রতি যারা উদাস, তাদের আমি দেশ-দ্রোহী মনে করি। যতদিন ভারতের একটী লোকও ক্ষুধার্ত, প্রবঞ্চিত, পশুর-তুল্য থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের হাড়মাশ পিশে নিজেদের বিলাস উপার্জন করে, তাদের আমি বলি—হতভাগা! ২৪।৭।৫২

॥ একজন সিদ্ধ ॥

একবার ঠাকুর একজন সিদ্ধের বর্ণনা করলেন—একজন বেদান্তী সাধু একদিন দক্ষিণেশ্বরে এলো। ভারি মজার লোক, মেঘ দেখলে সে নৃত্য করত, ভাবে বিভোর হয়ে বলত—'এ ক্যা মায়া'! 'এ ক্যা ম্যায়া'! ধ্যানের সময় তার কাছে গেলে বড় রাগ করত। একদিন ঠাকুর তার কাছে গেলেও সে অসন্তুষ্ট হয়। দিনরাত কেবল বিচার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। হাতে একটা ত্রিফলা কাচ নিয়ে ঘুরত, মধ্যে মধ্যে তার ভেতর দিয়ে জগৎটা দেখে হাসত, বলত, 'জগৎ এই-সন্ হি হ্যায়' অর্থাৎ কাচের অর্থাৎ উপাধি বা দেশকালনিমিত্তের ভেতর দিয়ে দেখলে বিচিত্র রঙ দেখা যায়; নইলে রঙ অর্থাৎ নামরূপ নেই। সেইরূপ মায়ার ভেতর দিয়ে এই জগৎ, মায়া বাদ দিলে ব্রহ্ম যেমন তেমনিই আছেন। সে তিন দিনের বেশী এক জায়গায় থাকত না, একটা জিনিষ বেশী তাকিয়ে দেখত না, পাছে ঐ বিষয়ে সংস্কার জন্মে যায়, অর্থাৎ সেটাকে সত্য বলে দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে যায়। স্নান করবার সময় মুক্তাকাশে পাখী দেখে বিচার করত—ব্রহ্মাকাশে চিত্ত এমনি স্বচ্ছন্দে বিহার করে। ব্যাকরণের ভেতর দিয়ে, শব্দের ভেতর দিয়ে অর্থের অভিব্যক্তির বিচার করত। একদিন গঙ্গার ধারে বাঁশী শুনতে পেলে, বল্লে—সমাধিবানের এতে সমাধি এসে উপস্থিত হয়। ২৫।৭।৫২

॥ আত্ম-সমর্পণ ॥

একদিন ঠাকুর ভক্তদের বলছেন, 'তাঁকে আর কে জানতে পারে বল? আমি বাপু জানবার চেষ্টাও করি না। আমি এই মাত্র জানি, তিনি আমার

মা। এখন তাঁর যা খুসী হয় করুন। যদি কিছু জানার দরকার হয় তা তিনি ইচ্ছে করলেই জানিয়ে দিতে পারেন, আর যদি তিনি দরকার না মনে করেন, তো ও সব আমার জানার দরকারই বা কি? আমি অনেক সময় মনে করি আমি যেন একটা বিড়ালের ছাঁ, আর মা আমার বিড়ালী। ছাঁ কেবল 'মিউ' 'মিউ' কোরে মাকেই ডাকতে জানে, তার সম্বন্ধে যা কিছু জানাজানি তা তার মা-ই ভাল বোঝে। তার মা তাকে কখন রান্নাঘরের উনোনের ছাই গাদায়, আবার কখনও বা বাড়ীর কর্তার বিছানায় রাখে। তাতে তার কি এসে গেলো, সে শুধু তার মাকেই জানে। সে তার মায়ের ঐশ্বর্যও জানে না, আর জানতে চায়ও না। সে জানে কেবল তার মা আছে, তার আবার ভয় কী? দেখ বড়-লোকের বাড়ীর ঝিএর ছেলেটাও জানে তার মা আছে, বাবুদের ছেলেদেরও কেয়ার করে না, যদি ঝগড়া হয়, বলে, "মাকে বলে দেব।" আমার ঠিক ঐ ভাব। ২৬।৭।৫২

॥ ধ্রুবাস্মৃতি ॥

স্বামিজী একজনকে লিখছেন যে আমরা আমাদের সমুদয় শক্তি একদিকে প্রয়োগ কোরে একটা বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি; আর এই ব্যাপারেরই যে অপর একটা দিক আছে, সেটা নেতি-ভাবাত্মক হলেও ওটারই মত কঠিন—সেটীর দিকে আমরা খুব কম মনোযোগই দিয়ে থাকি—সেটী হচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে কোন বিষয় থেকে অনাসক্ত হবার, তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার শক্তি। এই আসক্তি ও অনাসক্তি—উভয় শক্তিই যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন মানুষ মহৎ ও সুখী হতে পারে।

সুখী হওয়া মানে এইটে বোঝা যে, আমি নির্মল জ্ঞানরূপ স্বচ্ছ আকাশ, ঝড়-বৃষ্টি বিদ্যুৎ কুয়াসা মেঘ এলোগেলো তাতে আকাশের কি? তুমি যে স্বচ্ছ নীলাকাশ এটী যেন ভুলো না। তোমাকে তোমার ঐ নির্মল-শাশ্বত-চিরন্তন-প্রকৃতিটী জানতে হবে এবং তাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে, তখন ঠিক্ ঠিক্ সত্যাসক্তি ও সংসারানাসক্তির মাধুর্য উপলব্ধি হবে। জীবনের এই যে কুহেলিকা! মেঘ! সুখ-দুঃখের বৃথা স্বপ্ন! এগুলি আবার কেন? হে স্বাপ্ন-পুরুষ! আজ তোমার কাছে বিদায় চাই। ২৭।৭।৫২

॥ বৃদ্ধির প্রাগ্‌ভাব ॥

জীবনের দুঃখাশান্তি হচ্ছে বৃদ্ধির প্রাগ্‌ভাব বা পচন ভাব। বৃত্ত পথের শেষ, যেখান থেকে আরম্ভ সেখানেই। সব জিনিষকেই ঘুরে আসতে হবে তার মূলে। সব জিনিষকেই বাড়তে হলে তার পচন ভাবটা স্বীকার করতেই হবে। পচা সার তলায় না থাকলে কোন্ তরু কবে পুষ্পবতী হয়েছে? জীবনটা চলেছে অসংখ্য ধাক্কার ভেতর দিয়ে, তার মধ্যে একএকটা ধাক্কা একেবারে জীবনকে বানচাল কোরে দেয়। কিন্তু যোগেযাত্রে সেটা সামলাতে পারলেই একটা না একটা খেয়াঘাটে লাগেই। এইরূপ একটা মহাকালের ধাক্কায় দেখা যায় স্বামিজীকে নিয়ে এলো শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে, এইরূপ আর একটা ধাক্কা তাঁকে ভাসিয়ে নিলো চিকাগোয়। কত সুখ-দুঃখ, ঝড়-জল, ত্যাগ-ভোগের মধ্য দিয়ে জীব চলেছে, ধীরেধীরে ঐ অদৃশ্য মহাকালশক্তির ধাক্কা গুলো প্রশমিত হয়ে আসে, আর আসে তখন জীবনে শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ; স্তুতি ও নিন্দা, জয় ও পরাজয় জীবনে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তখন সুদূর শান্তি-সমুদ্রের শীতল হাওয়া গায়ে দেয় অমৃত-স্পর্শ। হে কাণ্ডারী! আর কতদিনে শেষ হবে 'তোমার তরণী বাওয়া'! ২৮।৭।৫২

॥ অকর্ম—প্রেম ॥

"শয্যায় পড়িয়া আছে পীড়িতা রাব্বিয়া
সন্তদ্বয় দেখা দিল পার্শ্বেতে তাহার
পবিত্র মালেক আর বিজ্ঞানী হাসান
মোসলেম জগতে দুই চিহ্নিত পুরুষ।
হাসান কহেন, 'প্রার্থনা যাহার যত বিশুদ্ধ হইবে
তারা, ঈশ্বর-শাসন তত সহে নীরবেতে'।"

"মালেক কিন্তু আরও গভীরতা হতে
কহিলেন নিজ অভিজ্ঞান—
'প্রভুর বিচার যারা প্রীতি ভরে নেয়
তাঁর দেওয়া শাস্তি তারা আনন্দেতে বয়'॥"

রাব্বেয়া দেখিল সেথা, স্বার্থেচ্ছা ঘুরে দুই উপদেশ মাঝে—
উত্তরিলা হেসে, 'হে কৃপানিদানময় !
যে দেখেছে একবার প্রিয়তম মুখ,
প্রার্থনায় যবে মগ্ন রয়,
দুঃখ কথা মনে তার হয় কি উদয়' ?"
—[পারসীক সুফী কাব্যোদ্যান হতে অনূদিত]॥ ২৯।৭।৫২

॥ প্রেমাদ্বৈত ॥

পরম প্রেমাস্পদ আত্মাকে আমরা দুভাগে বিভক্ত কোরে উপাসনা করি—প্রেমিক ও প্রিয়তম। কিন্তু প্রেম ওদুটো বিভাগই ভুলিয়ে দিয়ে একমাত্র আনন্দ-সত্তারূপে বর্তমান থাকে। স্বামিজী বলছেন, "ঐক্যই প্রেমের শ্রেষ্ঠাভিব্যক্তি।"

"একটা সময় ছিল যখন আমি ছিলাম প্রণয়িনী
সে ছিল মোর অতি প্রিয়তম !
তবুও বাড়িল প্রেম অতি ধীরে ধীরে।
শেষে দেখি—
তাহাতে হারায়ে গেছে 'আমি' ও 'সে' !
আজ ক্ষীণ-স্মৃতি, মাঝেমাঝে
উঠে ভাসি চিত্ত হৃদে মোর—
কালেতে ছিল দুটী কোন—'আমি' ও 'সে'
প্রেম তার মাঝে আসি করিয়াছে উভে একরূপ !"
—[পারসীক সুফী কাব্যোদ্যান হতে অনূদিত]॥ ৩০।৭।৫২

॥ আদর্শ গুরু ॥

যথার্থ গুরু যিনি, তিনি জ্ঞান ও পবিত্রতার আধার। আর শিষ্য তাঁর আধ্যাত্মিক মণিরত্নের উত্তরাধিকারী। ব্রহ্ম সরোবর হতে তিনি নির্গত হন সুখ-প্রণালী রূপে, যার ভেতর দিয়ে সচ্চিদানন্দ আমাদের হৃদয়-পাত্র পূর্ণ

করেন। তাঁকে ব্রহ্মস্বরূপ জানা চাই ; নইলে একটা মানুষকে অন্ধভাবে ভালবাসলে নিজের ভেতর দুর্বলতা অথবা মূর্তিপূজার মত জড়োপাসনা এসে উপস্থিত হবে। শাস্ত্র বলছেন, নাম ও নামীকে, মূর্তি ও মূর্ত-সত্যকে এক বলে উপাসনা করতে হয়। যখন গুরুর ভেতর দিয়ে আধ্যাত্মিক আলোক দেখতে পাওয়া যায়, তখন সেই অন্ধকার-বিনাশী জ্ঞানজ্যোতিঃতে জীব বহু দূরের রাস্তা দেখতে পায়, যদিও তখন সংসারারণ্যের চারিপাশে ঘোর তমের আবরণ ছড়ান থাকে। গুরুতে প্রীতি অতি শীঘ্র আধ্যাত্মিকতার সুপুষ্টি বিধায়ক। কারণ তাঁর যোগিনী-শক্তি জীবব্রহ্মের সংযোগস্থাপিকা। গুরুর পূজা কর। জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণে পবিত্রতা ছিল শিশুর মত। কামকাঞ্চনের গনগনে আগুন কখন তাঁকে উত্তপ্ত করতে পারে নি। এই জগদ্গুরুরা জড়বিজ্ঞানের শিক্ষক নন, এঁদের কাছে আত্মবিজ্ঞান শিখতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণে পশুত্ব ও মানবত্ব নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁতে অবশেষ ছিল কেবল শাশ্বত ঈশ্বরত্ব, যা আমাদের ভেতর এখন ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। তাঁর অত্যদ্ভুত সর্বত্র ব্রহ্মদর্শি-চক্ষু কদাচ, কখন কোথায়ও পাপী বা নীচ দেখতে পেত না। ৩১।৭।৫২

॥ কর্তব্য ও অকর্ম ॥

"স্বর্গের একমাত্র কর্তব্য হার্প বাজিয়ে ঈশ্বরের স্তুতি গান করা, সেখানে কোন বৈবাহিক সংসর্গ নেই।"—খৃষ্টানরা বলে থাকেন। স্বামিজীর ইচ্ছা, সেটা এখানেই আরম্ভ কর না কেন? বন্ধু বান্ধবের শুকনো কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আর কি তৃপ্তি পাবে? বন্ধন ও কর্তব্যের স্বপ্ন এইবার শেষ কর। সব ব্রহ্মময়, চৈতন্যে আবার সুখদুঃখ কি ; অতএব পরোপকার ও কর্তব্যের ভ্রান্তি আর সৃষ্টি কোরো না। ঈশ্বর সর্বদর্শী। তাঁর চাইতে জগতের বড় অভি-ভাবক আর কে আছেন! তিনি কি অক্ষম, যার জন্য তোমার কর্তব্য ও উপকার তিনি ভিক্ষা করছেন! অহংটা একেবারে মুছে ফেল, ঘটনাস্রোত দেহটাকে যেমন দোলায় তেমনি দুলুক, খানিক পরে সে তার অকর্মভাব প্রাপ্ত হবে। সত্তা তো বর্তমানটা, অতীত ও ভবিষ্যতও বর্তমানের মধ্য দিয়ে অনুমান করতে হয়। আবার বর্তমান বলে একটা নিত্য কিছু নেই, সেটারও সত্তা একক্ষণ বা বড়জোর ত্রিক্ষণ স্বীকার করা চলে, তারপর তৎসদৃশ বা তৎবিসদৃশ রূপান্তর

ঘটছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন চিরকালই সব একভাবে আছে। এ স্বপ্ন ভাঙো, আর কত কাল ভ্যাড়া বনে থাকবে যে কর্তব্যের দড়ি যে দিকে টানবে সেই দিকে ছুটেছুটে বেড়াবে। এক-ক্ষণাবচ্ছিন্ন বর্তমানে যদি স্থির থাক, সেখান থেকে যদি আর না ভেসে যাও, তা হলে দেখবে সেই এক-ক্ষণাবচ্ছিন্ন বর্তমানই অনাদি-অনন্ত-রূপ গ্রহণ করেছে, এবং সেখান থেকে নেমে এলেই বুঝবে বহুক্ষণগুলি সেই অকথিত সত্তায় স্বপ্নের মত দেশকাল নিমিত্তাত্মক কল্পিত সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছে। ১।৮।৫২

॥ গুরু ॥

ব্রহ্মবাদের দিক থেকে স্বামিজী গুরু সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করলেন,—বুদ্ধ ও খৃষ্ট সচ্চিদানন্দ সাগরের দুটো প্রকাণ্ড ঢেউ। আমাদের ভাবনার সুবিধার জন্য তাঁদের গুরুকরণ। নইলে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাই, বুদ্ধ খৃষ্টতো সামান্য কথা, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ। কিন্তু সেটা আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ এখনও ধরতে পারিনি বলেই ঐ বিশাল আধ্যাত্মিক তরঙ্গগুলোকে আগে সাধনার লক্ষ্যবস্তু করতে হয়, যাদের মাধ্যমে আমরা অধিবিদ্যার পাঠ সুরু করতে পারি।

এই সকল মহদাত্মা গুরুদের প্রথম লক্ষণ তাঁরা কেবল মুক্তির কথাই বলেন, অবান্তর কথায় সময় কাটান না। তাঁদের সাবধান বাণী হচ্ছে—"আম খেতে এসেছ পাতা গুণে কী হবে?" দ্বিতীয় লক্ষণ, আমাদের বিবেকের নিকট তাঁদের চরিত্র আদর্শ, অর্থাৎ আকামহত, জ্ঞানী ও কৃপালু। তৃতীয় লক্ষণ, তাঁদের ধনের, নামের ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা নেই, তাঁদের যেটুকু কর্মের অবশেষ থাকে, তা মাত্র প্রেম-পূর্ণ-সেবা। ২।৮।৫২

॥ শিষ্য ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ আহ্বান করেছিলেন সকলকেই সত্য। কিন্তু শিষ্য নির্বাচনে তিনি ছিলেন অতি কঠোর। কারণ তারাই তো হবে ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত, জ্ঞানী সাধকদের চলার পথ, যাকে আশ্রয় কোরে তাদের এই মরু, কান্তার, দুর্গম, গিরি অতিক্রম কোরে "মধু ও দুগ্ধের দেশকে" প্রাপ্ত হতে হবে। কাজে

কাজেই খুব শক্ত ভিতের রাস্তা না হলে চলবে কেন? তিনি বলতেন, "মা-ই এদের এখানে এনেছেন, নইলে তারা আসবে কেন?" কিন্তু এই মা ও তাঁর আত্মা কি তাঁর কাছে কোন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছিল? বলে ফেল্লেন শেষের দিনে, "মার ও আমার ইচ্ছায় আর কোন ভেদ দেখতে পাচ্ছি না।"

যেই কেউ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াত, অমনি ঐ বিশুদ্ধা, অন্তর্নিহিতা মাতৃ জ্যোতির নির্ঝরিণী 'সার্চলাইটে'র মত তার ওপর পড়ে তার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের কোথায় কি আছে সব তন্নতন্ন কোরে জেনে নিত। অশুচি স্পর্শে তিনি "আঁক" কোরে চিৎকার কোরে উঠতেন। অশুচি-স্পর্শের খাবার পর্যন্ত ছুঁতে পারতেন না। শ্বাস প্রশ্বাস, দেহের গঠন ও ওজন, ধ্যানের প্রণালী, অঙ্গ-ভঙ্গী, সব তিনি লক্ষ্য কোরে তার ভেতরের সংস্কারগুলো সব ধরে ফেলতেন। ৩।৮।৫২

॥ চিত্তবিকাশের ঐতিহাসিক ॥

বুদ্ধিও একটা শৃঙ্খলের মধ্যে। রচনা-কৌশলবাদ বলে, রচনার পূর্বে একটা জ্ঞান থাকা চাই। কিন্তু বুদ্ধি যদি রচনার কারণ হয়, সেটী অপরের কার্য হতে বাধ্য; যেমন মাটি ঘটের কারণ, কিন্তু সে পরমাণুর কার্য—এই শৃঙ্খলের মধ্যে পড়ে গেল। এই শৃঙ্খলই হোল মায়া। শ্রীভগবান আমাদের রচনা করেছেন, ভগবানও আবার আমাদের বুদ্ধির অনুপাতি রচনা—এইটী মায়ার খেলা। এই বৃত্তের মধ্যে থেকে, এই বৃত্ত ভাঙবার যো নেই; মন দেহ সৃষ্টি করছে, না দেহ মন সৃষ্টি করছে?—ডিম থেকে ছানা, না ছানা থেকে ডিম? সমস্ত জগৎ বিশ্লেষণ কর একেবারে ভিন্ন উপাদান খুঁজে পাবে না, আবার এক উপাদানও খুঁজে পাবে না। কিন্তু বিশুদ্ধ এক জ্ঞান-সত্তার ওপরে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক অচঞ্চল জ্ঞানের দুটো উপাধি, এই উপাধি দুটো ফেলে দিলেই যা থাকে তাই। তাকে তুমি—সত্য, স্বাধীনতা, অমরত্ব, আনন্দ যা হয় কিছু বল। এই মায়িক ব্যক্তিত্ব রাখার জন্য এত প্রযত্ন, এত লড়াই। এই অহমিকার নাশই হলো ধর্ম, কারণ তা শান্তি এনে দেয়। অজ্ঞাতসারে অহমিকার নাশের জন্যই নীতি, সদাচার, ধর্ম, উপাখ্যান সব সৃষ্টি হয়েছে। মায়া যাবতীয় ঘটনার চরম কারণ, বুদ্ধি এইটে বোঝাবার জন্য জাবর কাটে। বুদ্ধি সৃষ্টি-চেতনা-বিকাশের ঐতিহাসিক মাত্র, দ্রষ্টা বা প্রভু নয়। ৪।৮।৫২

।। ধ্যান-পদ্ধতি ।।

স্বামিজী প্রবর্তকদের ধ্যানের পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন—সোজা হয়ে বোস। তারপর পূর্ব পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণে এই পবিত্র চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করতে থাক—'সকলের মঙ্গল হোক', 'সকলে সুখে থাকুক', 'সকলে শান্তিতে থাকুক'। যত আন্তরিকতার সহিত এইরূপ চিন্তা-স্রোত তোমার ভেতর থেকে বেরুতে থাকবে, তত দেখবে, তুমি নিজেকে স্বাস্থ্যবান, শক্তিবান এবং উদ্বেগহীন মনে করবে। এই ভাবে কিছুদিন পরে বুঝতে পারবে, নিজেকে স্বাস্থ্যবান করতে গেলে অপরের সুস্বাস্থ্য চিন্তা করা উচিত ; নিজে সুখী হতে গেলে, আগে অপরকে সুখী করবার চেষ্টা করতে হয়। তারপর নিজ ইষ্টের কাছে প্রার্থনা করতে হয়—টাকা স্বাস্থ্য অথবা স্বর্গ নয়—প্রার্থনা করতে হয়, সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ। এ ছাড়া আর যা কিছু প্রার্থনা সবই বিনশ্বর এবং দেহকেন্দ্রিক। তারপর নিজের দেহকে বজ্রবৎ দৃঢ় এবং পর্বতের ন্যায় সহিষ্ণু ও স্বাস্থ্যবান চিন্তা করতে হয়, কারণ এই যন্ত্র বিগ্‌ড়লে ধ্যান ধারণা কিছুই হয় না। দুর্বল কখন সত্য লাভ বা আচরণ করতে পারে না। ৫।৮।৫২

।। ধর্মের ভিত্তি ।।

প্রত্যক্ষই ধর্মানুভূতির ভিত্তি। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য"—বেদ বলছেন। অনন্তকাল ধরে তর্ক কর ; কিছুই সিদ্ধান্ত হবে না, কেবল অনুমিতির পর অনুমিতি উঠবে। জোর করে বলতে পারবে না, 'ঈশ্বর আছেন', 'ঈশ্বর দর্শন করা যায়,' 'আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি'। যাদের লোকে নাস্তিক বলে, একদিক থেকে তারা নাস্তিক নয়। তারা বলে, 'আলোয় দেখে পা ফেলব, এতে হোঁচট খেতে হবে না',। তবে যারা নিজেদের অনুকূল ঘটনা না ঘটলেই বলে, 'ঈশ্বর নেই', তারা ভাবপ্রবণ অদূরদর্শী। নিজ চোখে সমুদ্র দেখা, আর ছবিতে সমুদ্র দেখা অনেক তফাৎ। জ্ঞানটা হবে আমার, অপরের জ্ঞান দিয়ে কি করে নিজেকে তৃপ্ত করি। শিক্ষাগুরু তোমাদের মনের খোরাক জোগাতে পারেন, কিন্তু খাওয়া ও হজম করা তোমার কাজ। যুক্তি কখনই ভগবান দেখাতে পারবে না, তবে একটা আনুমানিক তৃপ্তি দিতে পারে। চৈতন্যস্বরূপ

ভগবানকে টেবিলে রেখে কোন কালেই পরীক্ষা করা যাবে না, তাঁকে বোধে বোধ করতে হয়। ৬।৮।৫২

॥ আত্মা ও কাল ॥

এমন সময় ছিল কি—যখন আত্মা ছিল না, কিন্তু কাল ছিল? জ্ঞানস্বরূপ আত্মা না থাকলেও কি কাল স্বাধীন ভাবে থাকতে পারে? আত্মার জ্ঞান-প্রক্ষেপ যখন চিত্তে পড়ে বৈচিত্র্য লাভ করে, তখনই তাকে কালীক চিন্তা বলে। যদি আত্মা না থাকে, তা হলে চিত্তের বৃত্তিও থাকবে না, চিত্তবৃত্তি না থাকলে কালও নেই। তা হলে কি করে বলা চলে, আত্মা কালেতে আছে! পরন্তু আন্তর বিশ্লেষণে বেশ বোঝা যায়, শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা থেকেই পূর্বাপর সম্বন্ধের দ্বারা উপাধিত কোরে কালের প্রক্ষেপ হয়। জন্ম মৃত্যু কালীক ব্যাপার, সেই কাল চৈতন্য-সাপেক্ষ; কালরূপ উপাধির বৈচিত্র্যের সহিত যেন আত্মার বৈচিত্র্যাধ্যাস উপস্থিত হচ্ছে। ওগুলি অবস্থা মাত্র, স্বরূপতঃ আত্মা যেমন তেমনিই থাকেন। সূর্যের আলোক কাচে প্রতিফলিত হয়ে বিচিত্রতা লাভ করে, তাতে সূর্যের কী? প্রতিফলিত আলোক কাচের রঙে রোঙে উঠছে বটে, কিন্তু স্বরূপতঃ সে ঠিক যা তাই। কাচ সরালেই তার স্বরূপ লাভ হবে। ৭।৮।৫২

॥ 'এথিক্স্' ॥

স্বামিজী বলছেন, 'মনকে জড় ভাবাপন্ন করা মানে তাকে নীচেয় টানতে টানতে, একেবারে যান্ত্রিক স্তরে নিয়ে আসা, যাকে আমরা পশু-মানব বলি। যখন এই জড়ভোগের বাসনাগুলো ইন্দ্রিয়ে অধিরূঢ় হয়, তখন তাকে ঐ সকল বন্ধন হতে মুক্ত করবার চেষ্টা গুলোই ধর্মের প্রথম জাগরণ। ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়-বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া এবং আত্মাকে স্বাধীন রাখা। এরই নাম নিবৃত্তিমার্গ, ইংরেজীতে একেই 'এথিক্স্' বা নীতি শাস্ত্র বলে। নীতিশাস্ত্র মানে আত্মার এই অধঃপাতকে নিবারণ করবার পদ্ধতি। এ পদ্ধতি দুভাগে বিভক্ত বিধি ও নিষেধ—'এই করো' বা 'এ কোরো না'। 'কোরে না' মানে প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্তিতে আশ্রয়; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব ত্যাগ করা। 'করো'

মানে নিবৃত্তির, স্বাধীনতার পথ ধর। অধঃপাতে যাবার রাস্তা ত্যাগ কোরে সুপথ ধর। যতক্ষণ না মানুষ স্বাধীনতা বা নিবৃত্তি সুখের আস্বাদ না পায় ততক্ষণ 'এথিক্‌সে'র কোন মূল্য নেই। তবে কালে বাসনার মেঘ কেটে নিবৃত্তির সূর্য উদয় হবেই। ৮।৮।৫২

।। প্রচার ।।

প্রভুর কথামৃত আলোচনা হচ্ছে—বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মশাই! প্রচার করেন না কেন?' ঠাকুর বল্লেন, 'প্রচার! মানুষের বৃথা-গর্বই মানুষকে প্রচারে প্রণোদিত করে। মানুষ কীটাণুকীট, সে আবার কি প্রচার করবেক হে! প্রচার করেন স্বয়ং ভগবান, যিনি চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করেছেন, জগৎকে আলোকিত করছেন। বাবু, প্রচার কি একটা যা তা ব্যাপার নাকি? তুমি কী প্রচার করবে? যদি না স্বয়ং ভগবান তোমার মধ্যে প্রকাশ না হন এবং প্রচারের আদেশ দেন? অবশ্য তুমি যদি প্রচার কর তো তোমাকে আর কে বাধা দেবে বল? কিন্তু তুমি তো আদেশ পাওনি, গলা ভেঙে ফেল্লে আর কি হবে? কিছুদিন তোমার কথা লোকে শুনতে পারে বটে, কিন্তু তারপর সব ভুলে যাবে। ঠিক যেমন রূপ-রসের আস্বাদ আসছে যাচ্ছে—'লোকটা বলে বেশ', কিন্তু যাই তুমি-থামলে, আর সব ঠাণ্ডা। যতক্ষণ উনুনে দুধ বসান থাকে, ততক্ষণ দুধ টগ্‌বগ্‌ করে, যেই নামালে, আর অমনি সব চুপ। সাধনার দ্বারা শক্তি বাড়াও তবে তো লোকে শুনবে। 'আপনি শুতে পায় না, আবার শঙ্করাকে ডাকে।' ৯।৮।৫২

।। পরজন্ম ।।

আলোচনা চলছে—ঠাকুর বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁগা! তুমি পর জন্মটন্ম মান? তুমি তো শুনেছি অনেক বইটই লিখেছ।' বঙ্কিম বল্লেন, 'সে আবার কি!' ঠাকুর বল্লেন, 'জান না, জ্ঞান হলে আর কোন লোক-প্রাপ্তি হয় না, কারণ আত্মা সর্বব্যাপী তাঁর আবার লোক-প্রাপ্তি কি? কিন্তু জেন বাবু! যতদিন না জ্ঞান হবে ততদিন কর্মের অনুপাতী এই সূক্ষ্ম-শরীরটার

নানা-গতি প্রাপ্তি হবে এবং অজ্ঞানে সেইটাকেই আত্মার গতি বলে ভ্রম হবে—এ থেকে পালাবার পথ নেই। অজ্ঞানীর জন্মান্তর স্বীকার করতে হবেই। জ্ঞান লাভ অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ হলেই তবে এর হাত থেকে রেহাই, আর পৃথিবীতে আসতে হবে না। সিদ্ধ ধান আর গজায় না—জ্ঞানাগ্নি-সিদ্ধ-লোক আর জন্মায় না। সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে সে আর কোন পালা নিতে পারে না, কারণ তার কাম-কাঞ্চনে আসক্তি না থাকায় সাংসারিক জীবন আর সে কী কোরে যাপন করবে? আমি কেশবকেও বলেছিলাম, 'পাকা হাঁড়ি ভাঙলে কুমোর সে গুলো ফেলে দেয়; কিন্তু যতক্ষণ গড়নের মাটি কাঁচা থাকবে ততক্ষণ কুমোর তাকে চাকে বসাবেই বসাবে। ফিরে ফিরে এ সংসারে আসতেই হবে।' ১০।৮।৫২

॥ জীবনের কর্তব্য ॥

সেই আলোচনাই চলছে—ঠাকুর বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য কি, একবার বল দিকি বাবু?' বঙ্কিম বল্লেন, 'আহার, নিদ্রা, মৈথুন — এই সব আর কি।' ঠাকুর বল্লেন, 'তুমি তো হে, বড় বেল্লিক দেখছি! তুমি দিন রাত যা খাও, মুলোর মত তোমার মুখ দিয়ে তারই ঢেকুর উঠছে। দিনরাত সংসার নিয়ে থাকলে মানুষ ঐ রকম হিসেবী, শঠ হয়। ঈশ্বরের চিন্তা করতেকরতে মানুষের মনের গাদ কেটে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে আসে। সে কখন ওরূপ কথা বলতে পারে কি? ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে কেবল পণ্ডিতাই কি হবে? বিবেক-বৈরাগ্য কোথায়? চিল-শকুন ত অনেক উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তাদের নজর থাকে কোথায় কোন ভাগাড়ে পচা মড়া পড়ে। কাম, কাঞ্চন, সম্মান ছাড়া যারা আর কিছু বোঝে না, যাদের ভুলেও ঈশ্বর চিন্তা নেই, তাদের কি তুমি পণ্ডিত বল? আবার লোকে বলে, 'ভগবান, ভগবান কোরে এদের মাথা খারাপ হয়ে গেল'। কাক ভাবে, আমি খুব ধূর্ত, কিন্তু কেবল ময়লা আবর্জনা উটকেউটকে বেড়ায়। রাজহাঁস জলে দুধে মিশিয়ে দিলে দুধটুকু বেছে পান করে। দু একটা ছেলে পুলে হয়ে গেলে তখন দুজনে ভাইবোনের মত থাকতে হয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেই তিনি শোনেন, ভেতর ঠিক কোরে দেন। ১১।৮।৫২

॥ "টাকা মাটি, মাটি টাকা" ॥

ঠাকুর বঙ্কিমকে বল্লেন, 'আমি দেখি টাকা মাটি, মাটি টাকা'। বঙ্কিম বল্লেন, 'টাকা দরকার বই কি, নইলে পরের উপকার করা যাবে কি কোরে? নিজের ভরণ-পোষণের জন্যও তো টাকা পয়সা দরকার।' ঠাকুর বল্লেন, 'ঈশ্বরই দয়া করতে পারেন, জীব আবার কি দয়া করবে? সে তো সর্ববিষয়ে পরাধীন। জীব যদি নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারত, তা হলে আর কেউ মরত না, জ্ঞান বাবু, ঈশ্বরই জীবকে লালন পালন করেন। সন্ন্যাসীর কাছে কামিনী-কাঞ্চন থাকবে না, যখন গুড় খাবে না, তখন গুড় হাতে কোরে বেড়াবার কি দরকার? গৃহস্থের টাকা কড়ি দরকার পরিবার পালনের জন্য। ভক্ত গৃহস্থ অনাসক্ত ভাবে গৃহ-ধর্ম পালন কোরে যাবে—লাভ লোকসান সুখদুঃখ সব ভগবানের হাতে ভার দেয়—দিনরাত যাতে ভক্তি হয় তার জন্য প্রার্থনা তারা করে। গৃহস্থ যদি দান করে, তাতে তার নিজের উপকার, পরের আর কতটুকু হয়? সে মানুষের মধ্য দিয়ে ভগবানেরই সেবা করে, শুধু মানুষ কেন, সর্বজীবের মধ্য দিয়ে সে ঈশ্বরেরই সেবা করে। নাম যশঃ স্বর্গ প্রতিদান যারা চায় না, তাদের কর্মই নিঃস্বার্থ কর্ম—কর্মযোগ। কিন্তু কলিযুগে এ বড় কঠিন। গৃহস্থের পক্ষে কলিযুগে নারদীয় ভক্তি।' ১২।৮।৫২

॥ "এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান" ॥

ঠাকুর বঙ্কিমকে বল্লেন, 'এমন মানুষ জন্ম লাভ করেছ, এখন জো সো কোরে ঈশ্বর দর্শন কোরে নাও।' বঙ্কিম বল্লেন, 'আগে জগতের একটু জ্ঞান হোলে তবে তো ঈশ্বরের জ্ঞান হবে, সেই জন্য একটু আধটু লেখা পড়ার দরকার।' ঠাকুর বল্লেন, 'তোমাদের কোলকাতার লোকদের ঐ এক কথা, "বই পড়া"! হ্যাঁগা, মানুষে বই করেছে, না বইতে মানুষ করেছে? ঈশ্বর আগে না সৃষ্টি আগে? ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা, তাঁকে জানলেইতো সৃষ্টিরহস্য সব জানা যাবে। বাবুর সঙ্গে দেখা কোরে আম খাও, গাছপালা গুণে আর কি হবে বল?' বঙ্কিম বল্লেন, 'আম পাড়া-যাবে কি কোরে?' ঠাকুর বল্লেন, 'তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেই তিনি লোক জোগাড় কোরে দেবেন।' বঙ্কিম বল্লেন, 'ও'।

বুঝেছি, আপনি গুরুর কথা বলছেন; তিনি তো ভাল আমগুলি নিজে খেয়ে খারাপগুলো লোকদের দেন।' ঠাকুর বল্লেন, 'তা কেন হবে গো! যার পেটে যা সয়, তিনি তাকে তাই দেন, গুরু যে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ। তিনি বাপ-মার মত ছেলের হজম শক্তি জানেন। গুরুবাক্যে সরল বিশ্বাসীর কাছে ঈশ্বর খুব নিকটে, কিন্তু হিসেবী শঠের কাছে তিনি অনেক দূর।' ১৩।৮।৫২

।। সাত্ত্বিক-কর্ম ।।

ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়ী গেছেন। তাঁকে দেখে বল্লেন, 'যাক্, আজ বড় সৌভাগ্য! সাগরে এসে পড়া গেল।' বিদ্যাসাগর হেসে বল্লেন, 'তা হলে মশাই কিছু নোনা জল নিয়ে যান।' ঠাকুর বল্লেন, 'আরে তা কেন? তুমি লবণ-সাগর হতে যাবে কেন? তুমি ক্ষীর-সাগর, বিদ্যা-সাগর!' পণ্ডিত চুপ করলেন। ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'কর্মের আকর রজোগুণ, কিন্তু দয়া সত্ত্বগুণ থেকে ওঠে। সত্ত্বপ্রধান রজঃতে দোষ হয় না। শুকাদি ঈশ্বর-কোটিরাও জীব শিক্ষার জন্য দয়া আশ্রয় করে ছিলেন। তুমিও দয়া আশ্রয় কোরে অন্ন ও বিদ্যা দান করছ—এ ভাল। সব কর্মে যদি নামযশঃ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তা হলে তা ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। তা ছাড়া তুমি "সিদ্ধ" হয়েছ! বিদ্যাসাগর মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কেমন মশাই?' ঠাকুর বল্লেন, 'যেমন আলু পটল সিদ্ধ হলে কেমন নরম হয় দেখনি, নইলে এত দয়া? শুকনো পণ্ডিত দড়কচা-মারা ফল, সিদ্ধ করলে আরও শক্ত হয়। যে ঠিকঠিক পণ্ডিত, তার ভেতর দয়া, ভক্তি, ত্যাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ ফুটে উঠবেই। পণ্ডিত অথচ বিষয়মুখী, যেমন শকুন আকাশে ওড়ে, কিন্তু দৃষ্টি ভাগাড়ে।' ১৪।৮।৫২

।। ঈশ্বর-তত্ত্ব ।।

ঈশ্বর মন বুদ্ধির পারে, পাপপুণ্য সুখদুঃখের পারে—ও সব অজ্ঞানী জীবের। বিদ্যাসাগর একবার বলেছিলেন, 'ঈশ্বর কেউ জানতে পারে না; তবে আমরা এমন জীবন দেখাতে পারি যে আমাদের দেখে সকলেই সকলের

উপকার করতে পারে।' কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন বল্লেন, 'ব্রহ্মবস্তু বিদ্যা অবিদ্যার পারে, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে, দ্বৈত জগৎ-মায়ার পারে। দ্বন্দ্ব ছাড়া এ মায়িক দ্বৈত জগৎ থাকতে পারে না। এখানে যেমন জীবে জ্ঞান ভক্তি দেখা যায়, আবার কামিনী কাঞ্চনও দেখা যায়—ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ—একটা থাকলেই আর একটা থাকবে। ঈশ্বর সকল দ্বন্দ্বের পার—ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায়, এ সব অজ্ঞানী জীবের—এতে সুনির্মল ব্রহ্মবস্তুতে কিছু এসে যায় না। আলোয় ভাগবত পাঠ এবং জাল করা দুইই চলে, তাতে আলোর কি? সূর্য সাধু অসাধু সকলকে কিরণ দেন, তাতে সূর্যের কি এলো গেল? ঈশ্বর মন-বুদ্ধি, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, ধর্মাধর্মের পারে। তিনি সত্য জ্ঞানানন্দ—নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। ১৫।৮।৫২

॥ "অবাঙ্মনসোগোচরম্" ॥

ঈশ্বরচন্দ্র হয়ত মনে করছেন, 'মায়া যখন ঈশ্বর-শক্তি, তখন মায়িক যা কিছু সদসৎ, সব তো ঈশ্বরের!' তাই ঠাকুর তখনই বলছেন, 'ওগো! সাপের মুখে বিষ থাকে তাতে সাপের কিছু হয় কি? তাতে অপরের বিষ লাগতে পারে। অজ্ঞানী জীবেরই পাপ পুণ্য, কিন্তু যেই সে নিজের স্বরূপ বুঝতে পারে, তখনই ঘুম ভাঙলে স্বপ্নের মত সব ভালমন্দ উবে যায়। আত্মতত্ত্ব বোধে বোধ হয়, বেদ, পুরাণ, ষড়দর্শনে মাত্র তার আভাস্ পাওয়া যায়। সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ মানুষ মুখে সব বস্তু সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলেছে, কিন্তু ব্রহ্মবস্তু কখনও উচ্ছিষ্ট হন নি বা হবেন না, কারণ তাঁকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না; একটুও না, তবে বোধে বোধ হয়, মানুষ বলতে পারে না।' ঈশ্বরচন্দ্র বল্লেন, 'আজ মশাই, একটা নতুন কথা শুনলুম।' ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'এক জনের দুটী ছেলে ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে গিয়েছিল। বাপ বড়কে জিগেস করলেন, "কি বুঝলে বল দেখি?" সে বেদ থেকে নানান্ রকম শ্লোক আওড়াতে লাগলো। তারপর বাপ ছোট ছেলেকে জিগেস করলেন, "আচ্ছা বাপু, তুমি কি বুঝেছ বল দেখি!" সে কোন উত্তর দিলে না, মুখ হেঁট কোরে চুপ কোরে বসে রইল। বাপ তখন বুঝলেন, এ-ই বুঝেছে। পিঁপড়ের এক

দানা চিনিতে পেট ভরে যায়, আর একদানা মুখে কোরে বলে, কাল এসে চিনির পাহাড়টা তুলে নিয়ে যাব। ১৬।৮।৫২

॥ শাস্ত্রজ্ঞান ॥

ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বল্লেন, 'শুকাদি ঋষিরা বড়জোর একটা ডেও পিঁপড়ে। একজন সমুদ্দুর দেখে এলো, লোকেরা জিগেস করলে, "কেমন দেখলে হে?" সে চোখ দুটো খুব বড় বড় কোরে, খুব প্রশস্ত হাঁ কোরে বল্লে, "আরে সে আর কি বলব! বিরাট! বিরাট! বিরাট! ঢেউ তো নয় যেন এক একটা বড় বড় পর্বত! কি গম্ভীর গর্জন! যতদূর তাকাও তার আর শেষ নেই।"—ঐ পর্যন্ত, ওর বেশী আর বলবার জো নেই। শাস্ত্রজ্ঞান ঐ রকম ভয়, বিস্ময় ও আনন্দ মেশান দু এক কণা বর্ণনা। শুকাদি ঋষি কূলে দাঁড়িয়ে ঐ সচ্চিদানন্দ সমুদ্র দর্শন করেছেন, তখনও ডুবতে পারেন নি। ঐ দূর থেকে দর্শনেই বুদ্ধি জড়ীভূত হয়ে থেমে যায়, সাধক নির্বাক ও অবাক হয়ে যায়, নিজেকে ব্রহ্ম থেকে আলাদা করতে পারে না, নুনের পুতুলের সাগর মাপতে গেলে যা হয়। তবে শঙ্করাদি সেখান থেকে বিদ্যার-আমি নিয়ে লোকশিক্ষার জন্য উঠে এসেছিলেন। ১৭।৮।৫২

॥ জ্ঞানীর লক্ষণ ॥

বিদ্যাসাগরের বাড়ী একজন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'জ্ঞানী সমাধি থেকে নেমে এসে কিছু বলতে পারে?' ঠাকুর বল্লেন, 'সাধন অবস্থায় লোকে অনেক কথাই বলে, কিন্তু বস্তু লাভ হলে একেবারে নির্বাক। তবে লোক-শিক্ষার জন্য ঈশ্বর যাকে দিয়ে বলান সে কিছু কিছু বলতে পারে। যেমন—

(১) 'মাখন গলাবার সময় যতক্ষণ জল থাকে ততক্ষণ কল্‌কল্ করে, জল মরে গেলে চুপ! কিন্তু আবার কাঁচা লুচি ছাড়, চড়বড় কোরে উঠবে।'—এক সাধনে সিদ্ধ হয়ে আর এক নতুন সাধনের প্রারম্ভে যেমন।

(২) 'মৌমাছি যতক্ষণ ফুলে না বসে ততক্ষণ গুণগুণ করে। যখন ফুলে বোসে মধুপান করে, তখন একেবারে চুপ! তবে মাঝেমাঝে আনন্দে উন্মত্ত

হয়ে গুণগুণ কোরে ওঠে।' তেমনি সিদ্ধেরা সমাধি থেকে নেমে এসে, হরিগুণ গানে দিন কাটান, "কী আনন্দ! কী আনন্দ!"

(৩) 'খালি কলসী জলে ডুবুলে ভক্‌ভক্ করে, কিন্তু জল ভর্তি হলে চুপ। কিন্তু তা থেকে অন্য খালি পাত্রে জল ঢালতে গেলে আবার ভক্‌ভক্ শব্দ হবে।' যেমন পূর্ণজ্ঞানী অজ্ঞানীকে জ্ঞান দেবার সময় উপদেশ করেন। ১৮।৮।৫২

॥ শক্তির তারতম্য ॥

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশাই! ঈশ্বর কি লোককে শক্তি কম বেশী দিয়েছেন?' ঠাকুর বল্লেন, 'তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু প্রকাশের তারতম্য আছে। এই দেখনা, তোমাকে লোকে দেখতে আসে, তা কি তোমার দুটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখতে? শুধু পণ্ডিতাই লোকে মানে না, শোনে না। একজন সাধু তার একখানি বই আমাকে দেখালে, তার গোড়া থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত লেখা, কেবল, 'ওঁ রাম! ওঁ রাম!' গীতার তাৎপর্য—শব্দটা উল্‌টে পড়লে যা হয়, 'ত্যাগী', 'ত্যাগী'; অর্থাৎ হে জীব! সব ত্যাগ কোরে কেবল ঈশ্বর লাভ করবার চেষ্টা কর। চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে দেখেছিলেন, একজন গীতা পড়ছে, আর একজন তার পাশে বোসে কাঁদছে। তিনি জিগেস করলেন, 'তুমি বাপু! এ সব কিছু বুঝতে পারছ?' 'না প্রভু! কিছুই না।' 'তবে কাঁদছ কেন?' 'আমি দেখছি অর্জুনের রথে ভগবান বসে উপদেশ করছেন। অর্জুনের কি সৌভাগ্য! এই দেখছি, আর কাঁদছি। আহা! প্রভুর কি অপূর্ব শোভা! অর্জুনের কি সৌভাগ্য!' ১৯।৮।৫২

॥ কৃষ্ণমূর্তি ॥

ঠাকুর বঙ্কিমের নাম শুনে জিগেস করলেন, 'তুমি "বঙ্কিম" (বাঁকা) কেন হলে?' বঙ্কিম বল্লেন, 'সাহেবের জুতো খেয়ে খেয়ে।' ঠাকুর বললেন, 'আরে সে কথা নয়, কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গরূপ কেন?—শ্রীরাধার প্রেমে। জান তাঁর কৃষ্ণরূপ কেন? অতি দূরে থেকে দেখ বলে, যেমন আকাশ; কিন্তু কাছে গেলে কোন রঙ নেই। কৃষ্ণ এত শিশু কেন? ঐ দূরে বলে, যেমন সূর্য। কাছে গেলে

সূর্য বিরাট। সেইরূপ ভগবানের স্বরূপ জানলে, তখন তিনি আর ছোটও নন, বড়ও নন, সাদাও নন, কালও নন। এ সব যখন আমরা মায়ার ভেতর দিয়ে দেখি, তখন ভগবান হয়ে পড়েন দূরে। কিন্তু মন যখন নির্বিকল্প হয়, তখন দেখা যায় দ্রষ্টাও নেই, দৃশ্যও নেই। যতক্ষণ 'আমি', ও 'তুমি' ততক্ষণ জগৎ অর্থাৎ ব্রহ্মে নামরূপ স্বীকার করতে হয়। দৃশ্য ও অদৃশ্য যা কিছু সৃষ্টি সব ঈশ্বর লীলা। যতক্ষণ আমিত্বের বোধ থাকবে, ততক্ষণ জীব, জগৎ, ঈশ্বর, ঈশ্বরের নানা রূপ ও খেলা মানতে হবেই।' ২০।৮।৫২

॥ যুগল মূর্তি ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্কিমকে আবার বল্লেন, 'কৃষ্ণ হলেন পুরুষ আর শ্রীমতী প্রকৃতি। প্রকৃতি মানে মূল কারণ। যুগল মূর্তি আলাদা নয়, তাঁরা কেউ কাকেও ছেড়ে থাকেন না, যেমন আগুন ও তার দাহিকা শক্তি। কৃষ্ণের দৃষ্টি রাধাতে নিবদ্ধ, রাধার দৃষ্টি কৃষ্ণে। রাধা বিদ্যুৎ বরণী, কৃষ্ণের পীত বসন। কৃষ্ণ মেঘ বরণ, রাধার নীল শাটী, নাকে নীল নাকছাবি; আবার কৃষ্ণের নাকে নোলোক পীতপুষ্প-রাগমণির। রাধাকৃষ্ণ দুজনেরই পায় নূপুর—পুরুষ-প্রকৃতির সমন্বয় দেখান হয়েছে—অর্থাৎ এই পুরুষ-প্রকৃতিতে সৃষ্টি অঙ্গাঙ্গিভাবে রয়েছে।' বৈষ্ণব শাস্ত্রে আরও বলেছে, 'শ্রীমতী রাধারাণী হলেন প্রাণ, শ্রীকৃষ্ণ হলেন চৈতন্য।' কৃষ্ণ বাঁশীর ছিদ্রে অঙ্গুলিক্ষেপ কোরে সৃষ্টির ছন্দ খুলে দেন, শ্রীমতী রাধা দেন তাতে ফুঁ অর্থাৎ তাঁর শ্বাসে জগৎ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু জগৎ কিরূপ চলবে না চলবে তা ঐ কৃষ্ণের বংশীরূপ সপ্তলোক ছিদ্রে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলিক্ষেপের উপরই নির্ভর করে। ২১।৮।৫২

॥ ধর্মের পরীক্ষা ও স্বাধীনতা ॥

'ব্যক্তি বিশেষকে ছেড়ে দাও', স্বামিজী লিখছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণরূপ ভাবাদর্শ প্রচার কর, সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর জাতির যাবতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শ রক্ষা পাবে, যদি তার মধ্যে খাঁটী কিছু থাকে। কোন লোকের বিরুদ্ধে, কোন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে, জাতিভেদের সপক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের কিছু

বলবার নেই ; আমরা গায়ে পড়ে কারুর অধিকারে হস্তক্ষেপ করি না। আমরা কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যানুভূতি, হৃদয়বত্তা, জ্ঞান, উদারতা ও পবিত্রতার কষ্টি-পাথরে সব কিছু যাচাই কোরে নিজেরা গ্রহণ করি।

'আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দরকার। মানুষ যে একটা যন্ত্র নয়, এইটাই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম সমন্বয়ের সার কথা। গতানুগতিক কার্যধারা যা একজনের উপযোগী, অপরের তা নাও হতে পারে। যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা যে ধর্ম-সম্প্রদায়ে ঢুকেছে, সেটা অতি শীঘ্রই প্রাণহীন একটা কসরতে পরিণত হয়েছে।' ২২।৮।৫২

॥ ধর্ম, আদর্শ ও প্রচার ॥

স্বামিজীর পত্রাবলী পড়া হচ্ছে—'ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলকে সেই অবস্থা পেতে সাহায্য করা'—স্বামিজী লিখছেন, এই সহায়তা করাই ধর্ম, আর সব অধর্ম ; এই সেবাই কর্ম, আর সব বিকর্ম। অপর কর্মে কেবল শক্তিক্ষয় ; চিত্তশুদ্ধি-রূপ কর্মফল একমাত্র সেবার দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা ভোগ সম্ভব, আত্মার শুদ্ধতা অসম্ভব।

'শ্রীরামকৃষ্ণ কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করতে আসেন নি, তিনি সেই সনাতন তত্ত্বই প্রকাশ করতে এসেছিলেন। তিনি সমগ্র অতীত আধ্যাত্মিক চিন্তার সাকার বিগ্রহ। শাস্ত্রের তাৎপর্য, প্রণালী ও উদ্দেশ্য কেবল তাঁর জীবনের ভেতর দিয়েই বোঝা যায়।

'আমি লোকের কাছ থেকে যে রুটীর টুকরো পেয়েছি তার পরিবর্তে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ জীবাদর্শকে দান করেছি। লোক-শিক্ষকের কাপড় পরে, কোন কাজ না কোরে কেবল লোক ঠকিয়ে যদি খেতুম, তা হলে আজ আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।' ২৩।৮।৫২

॥ ইষ্টনিষ্ঠা ॥

পড়া চলছে—"আপনাতে আপনি থেক মন, যেয় নাক কারুর ঘরে।
যা চাবি তাই খুঁজে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরমধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে।
ও মন কত মণি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥"

—শ্রীরামপ্রসাদ গান গেয়েছেন। এখন স্বামিজী সিদ্ধান্ত করছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণের জুড়ি আর খুঁজে পেতে হবে না। সে অপূর্ব সিদ্ধি, অহৈতুকী দয়া, প্রগাঢ় সহানুভূতি—হীন, দুর্বল ও বদ্ধ জীবের জন্য, এ জগতে এ সবের আর তুলনা নেই। হয় তিনি অবতার—যা তিনি মাঝে মাঝে নিজেই স্বীকার করতেন, আর না হয় বেদান্ত দর্শনে যাকে নিত্য-সিদ্ধ মহাপুরুষ "লোকহিতায় মুক্তোঽপি" শরীর গ্রহণকারী বলা হয়েছে, "নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ"; এবং তাঁর উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা"।'

স্বামিজী লিখছেন যে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কখন তাঁর প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নি। তিনি তাঁর লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করেছেন। এত ভালবাসা তিনি তাঁর বাপ মার কাছ থেকেও পান নি। বলছেন, 'এ কবিত্ব নয়, অতিরঞ্জিত নয়—এ কঠোর সত্য, তাঁর শিষ্য মাত্রেই জানে। বিপদে রক্ষা কর বলে সারা হয়েছি, কেউ উত্তর দেয় নি, তিনি নিজের অন্তর্যামিত্ব-গুণে আমার সকল বেদনা অপসারিত করেছেন।' ২৪।৮।৫২

॥ অভয় ॥

পড়া চলছে— "ভোগে রোগ ভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরয়া ভয়ম্।
শাস্ত্রেবাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্বংবস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃনাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥"
—বৈরাগ্য শতক।

ভোগে রোগ ভয়, কুলে চ্যুতিভয়, টাকা থাকলে রাজার ভয়, মানে দীনতার ভয়, বলে শত্রু ভয়, রূপে জরার ভয়। শাস্ত্রে বিপরীত পক্ষের ভয়, গুণ থাকলেই

খলের নিন্দাভয়, দেহ থাকলে যমের ভয়, এ জগতে সবই ভয়ান্বিত, কেবল মানুষকে বৈরাগ্যই অভয় দান করতে পারে।

ভাগবত বলছেন, "আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যই পরম সুখ।" কেউ যেন তোমার শত্রু বা মিত্র না থাকে—একলা বাস কর—ভগবানের নাম প্রচার কর, হিংসা কোরো না, কারও উদ্বেগের কারণ হয়ো না। দৃশ্য জাল একেএকে চলে যাবে, তুমি সাক্ষিরূপে অবস্থান কর। ২৫।৮।৫২

॥ ভালবাসার পাত্র ॥

মানুষ তখনই প্রাণভরে ভালবাসতে পারে, যখন সে বুঝতে পারে যে তার ভালবাসার পাত্র এক টুকরো মাটি নয়—স্বয়ং সচ্চিদানন্দ। স্ত্রী তার স্বামীকে আরও ভালবাসবে যখন সে বুঝবে তার স্বামী সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ। স্বামী তার স্ত্রীকে আরও ভালবাসবে যখন সে বুঝবে তার স্ত্রী সচ্চিদানন্দ-ময়ীরই প্রকাশ। মা ছেলেকে আরও ভালবাসবে যখন সে বুঝবে তার ছেলের মধ্যে সাক্ষাৎ গোপালই খেলা করছেন। শত্রু! সেও তো আমার প্রিয়তম আত্মাই। মহাপুরুষ! পরম প্রিয়তম শ্রীভগবানেরই তো একটা বিশিষ্ট রূপ। মহাপাপী? হে সচ্চিদানন্দ জ্যোতির্ময় বিশুদ্ধ-সত্ত্ব প্রিয় মহান্ আত্মন্! একি তোমার অদ্ভুত আবরণ! কেন নিজেকে আমাদের নিকট গোপন করছ?—এমনি মনের মানুষ যাঁরা তাঁরাই তো তাঁদের প্রেমময় স্বভাবের দ্বারা জগৎটাকে আত্মসাৎ কোরে ফেলেন। তাঁদের কাছ থেকে পালাবার জো নেই, নানান্ বিদ্রোহের পর ধীরে ধীরে সে শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতেই হবে—"একি যে-সে সাপে ধরেছে"—স্বার্থরূপ বিষ তাঁতে নিঃশেষিত হয়ে গেছে, আছে সেখানে দাঁড়িয়ে সত্য, জ্ঞান, আনন্দ। ২৬।৮।৫২

॥ সবিকল্প ও নির্বিকল্প ॥

প্রহ্লাদ যখন নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলে যেতেন, তখন জগৎ বা তার কারণ কিছুই অনুভূত হোত না—এক অনন্ত বোধ-সমুদ্রে 'মস্ত' হয়ে থাকতেন। সেখানে নাম বা রূপ নেই। কিন্তু যেই মনে পড়ত তিনি প্রহ্লাদ, তখনই

তাঁর সামনে তাঁর ব্যক্তিগত জগৎ প্রতিভাত হোত। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখতে পেতেন শ্রীভগবান অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-মহোদধি।

গোপীদেরও তাই, যখন তারা কৃষ্ণ-ধ্যানে নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলত, তখন তাদের মনে হোত তারাই কৃষ্ণ। কিন্তু যখনই তারা তাঁকে উপাস্যরূপে চিন্তা করত, তখনই তারা দেখতে পেত, সামনে কমলানন, হাস্য-যুক্ত, পীতবসন, গলায় মালা, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ।

আবার নিজেদের ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও গোপীদের সর্বত্র কৃষ্ণানুভূতি হোত। তারা সর্পের মুখ চুম্বন করত, মৃত্যুকে সাদরে অভিনন্দন করত—সবই যে তিনি। প্রেমের অতি উৎকর্ষে ভক্ত আত্মহারা হয়ে ভালমন্দ সুখদুঃখ আর বুঝতে পারে না। ২৭।৮।৫২

॥ ধর্মকায় ॥

অবতংশকসূত্র পড়া হলো—জ্ঞানই বুদ্ধের ধর্মকায়। জ্ঞানীর কাছে বিশ্ব—তথাগতের বাণী। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, সমুদ্র, নক্ষত্র, পুষ্প, পাহাড় সবই সেই নিত্যানন্দের বিশিষ্টাভিব্যক্তি। কিন্তু অজ্ঞানে জগতের যা কিছু সবই জড়। যেখানেই সত্ত্বগুণ তমের দ্বারা আবরিত, সেখানেই দুর্গন্ধ, পূতীময়, বিশ্রী। জ্ঞানীর চক্ষু ও কবির চক্ষু একই। ঐ চক্ষে জগৎ না দেখলে জগৎ জড়, নিরর্থক অন্ধশক্তির সংঘর্ষ মাত্র—সচ্চিদানন্দ জড়ে পর্যবসিত হলো—বুদ্ধহীন জগৎ নিষ্ঠুর কাম ও ক্ষুধার দ্বৈরথ্য মাত্র।

ধর্মকায় কী?—পথিপার্শ্বে প্রত্যেক ফুলটী যে ফোটে, বৃদ্ধি পায়, আবার শুকিয়ে যায়, এ সেই এক অপরিবর্তনীয় সত্য বিধানে। উর্ধ্বে যে প্রত্যেক তারাটী ঝিক্‌মিক্ করে, আলো দেয়, কক্ষচ্যুত হয়, বিলয় পায়—সেই এক অকথনীয় সত্য বিধানে। এই নির্বাণের ও সৃষ্টির সাধনা বিধানই শ্রীবুদ্ধের ধর্মকায়। এই ধর্মকায়ের এক একটী বিশিষ্ট অভিব্যক্তিই এক একটী বুদ্ধকায়। ২৮।৮।৫২

।। সবই ঈশ্বরেচ্ছা ।।

কথামৃত বলছেন, প্রতিষ্ঠান থাকা না থাকা ঈশ্বরেচ্ছা। প্রতাপ বল্লেন, 'কেশবের নামটা যাতে বজায় থাকে সেইটাই এখন আমার প্রধান কর্তব্য।' ঠাকুর বল্লেন, দেখ, তুমি ওকথা আজ বলছ বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে আর বলবে না। একটা গল্প বলি শোন, একটা লোক একটা পাহাড়ে একখানা ঘর তুলেছিল। একদিন ঝড় উঠলো। সে বায়ু দেবতাকে প্রার্থনা করলে, 'এ তোমার পুত্র হনুমানের ঘর, ভেঙো না।' কিন্তু ঝড় কিছুতেই আর থামে না; তখন সে বললে, 'হে বায়ু! এ লক্ষণের ঘর ভেঙো না বাবা।' কিন্তু তবুও ঝড় বাগ মানলে না; তখন বললে, 'দোহাই বাপ! এ স্বয়ং রামের ঘর।' কিন্তু ঘর মড় মড় কোরে উঠলো। তখন রেগে বলে উঠলো, 'চুলোয় যাক এ শালার ঘর', বলে পালিয়ে নিশ্চিন্তি। তুমি কেশবের নাম কী-ই বা আর রক্ষা করবে? যাঁর ইচ্ছেয় কেশব বড় হয়েছিল, তাঁর ইচ্ছাতেই এখন যা হয় একটা কিছু হবে, তুমি আর কি করবে বল? তোমার উচিত এখন তাঁর প্রেম সমুদ্রে ডুবে যাওয়া—

"ডুব ডুব রূপসাগরে ডুবল আমার মন
তলাতল খুঁজলে পাতাল পাবিরে প্রেম রত্নধন।" ২৯।৮।৫২

।। সচ্চিদানন্দ সাগর—অমৃত সাগর ।।

প্রভু একদিন নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখ্ ভগবান হলেন আনন্দ সমুদ্র, তুই কি তাতে ডুবতে চাস? আচ্ছা, ধর্ এক সরা রস রয়েছে, আর তুই যেন একটা মাছি, এখন বল্ তুই কেমন কোরে রস খাবি!' নরেন বল্লেন, 'কেন, আমি ধারে বসে মুখ বাড়িয়ে খাব।' প্রভু জিগেস করলেন, 'ধারে বসবি কেন রে?' নরেন বল্লেন, 'নইলে রসে ডুবে মরি আর কি?' প্রভু হেসে বল্লেন, 'দূর বোকা, সচ্চিদানন্দ সাগরে আবার মৃত্যু ভয় কি? সে যে অমৃত সাগর রে! এখানে ডুবলে মানুষ মরবে কেন? এখানে ডুবলে মানুষ অমর হয়। জ্ঞান সাগরে ডুবলে কি কেউ অজ্ঞান হয়? ভগবদানন্দে বিহ্বল হয়ে চুপ হয়ে যায়।'

প্রভু ভক্তদের বলছেন, 'লোকে আমিটা রাখবার জন্যই কেবল ব্যস্ত। আমিটা অজ্ঞান থেকে ওঠে, আর জ্ঞানী বলে—তুঁহু, তুঁহু। সকলেই বলে রাণী রাসমণি কালীমন্দির করেছে, কেউ বলে না যে এ সব ঈশ্বরের কার্য। তারা বলে অমুকঅমুক লোকে ব্রাহ্মসমাজ গড়েছে, কেউ একবার বলে না যে ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে।' ৩০।৮।৫২

॥ জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী ॥

ঠাকুর একদিন পণ্ডিত শশধরকে বললেন, 'জ্ঞানীর চিহ্ন কি জান?—জ্ঞানী হলো শান্ত আবার নিরহংকার। তোমার বাপু দুই-ই আছে। জ্ঞানীর আর এক লক্ষণ সাধুর কাছে নিরীহ, কিন্তু কাজের সময় একেবারে সিংহের মত। কিন্তু আবার স্ত্রীর কাছে খুব রসিক।' শুনে সকলে হাসতে লাগলো। ঠাকুর আবার বলতে লাগলেন, 'কিন্তু বিজ্ঞানীর লক্ষণ একটু অন্য রকম। যেমন শ্রীচৈতন্য। তাঁদের ব্যবহার দেখবে কখন বালকবৎ, কখন উন্মাদবৎ, কখন জড়বৎ, আবার কখনও বা পিশাচবৎ। যখন তাঁরা বালক ভাবে থাকেন, তখন একেবারে শিশুর মত সরল, আবদেরে; কিন্তু তিনিই যখন আবার উপদেশ করেন, তখন একেবারে শক্তিমান যুবকের মত। শশধর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরূপ ভক্তি হলে ঈশ্বর লাভ হয়?' ঠাকুর বল্লেন, 'শোন, ভক্তি তিন রকমের—(১) সাত্বিক-ভক্তির বাহ্য প্রকাশ নেই, (২) রাজসিক-ভক্তিতে বাহ্যাড়ম্বর খুব; আর (৩) তামসিক-ভক্তি ডাকাতে ভক্তি—"যদি দুর্গা দুর্গা বলে মরি. আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শংকরি!" "আয় মা সাধন সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।"—বীরদর্পযুক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের গান শুনে পণ্ডিত কাঁদতে লাগলেন। ৩১।৮।৫২

॥ অহেতুকী ভক্তি ॥

একদিন বলরাম মন্দিরে রথটানার পর শ্রীশ্রীঠাকুর শশধরকে বল্লেন, 'জান, একে বলে ভজনানন্দ। ভগবানের উপাসনা কোরে ভক্তেরা কিরূপ আনন্দ পায় দেখলে তো? সংসারীরা কেবল বিষয়ানন্দ বোঝে—কাম আর

কাঞ্চন। ভগবানে ভজন পূজন করতে করতে তাঁর কৃপা হয়, তার পর তাঁর দর্শনানন্দ—এই দর্শনানন্দই ব্রহ্মানন্দ।' শশধর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরূপ তাঁর প্রতি টান হলে এরূপ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করা যায়?' ঠাকুর বল্লেন, জীব যখন তাঁর বিরহে ছট্‌ফট্‌ করে। দেখ, একবার এক গুরু তাঁর শিষ্যকে জলে চুবিয়ে ধরলেন, খানিক পরে টেনে তুলে বল্লেন, 'কেমন লাগছিল?' শিষ্য বললে, 'প্রাণ যায় আর কি!' গুরু বল্লেন 'ভগবানের জন্য এইরূপ আকুলি বিকুলি হলে তাঁকে পাওয়া যায়।' শশধর তাড়াতাড়ি বল্লেন, 'হাঁ হাঁ, এইবার বুঝেছি মশাই।' ঠাকুর বল্লেন, 'এ সংসারে ভক্তি হলো সার।' নারদ শ্রীরামচন্দ্রকে বল্লেন, 'হে প্রভু! তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে।' রামচন্দ্র বল্লেন, 'নারদ! তুমি আরও কিছু বর নাও।' নারদ বল্লেন 'প্রভু! আর কিছু চাই না আমি, আমার কেবল এই একমাত্র প্রার্থনা, তোমার পাদপদ্মে যেন আমার অবিচলা শুদ্ধা ভক্তি থাকে।' ১।৯।৫২

।। সাধু ও গৃহস্থের জ্ঞান ।।

ঠাকুর শশধরকে বলছেন, 'গেরস্থর জ্ঞান ও সর্বত্যাগীর জ্ঞানে অনেক তফাৎ হে, অনেক তফাৎ। গৃহীর জ্ঞান যেন প্রদীপের মিটমিটে আলো, বড় জোর নিজের ঘরটুক আলোকিত করে; তাতে কেবল নিজের শরীর পরিবারবর্গ মাত্র দেখা যায়। কিন্তু সর্বত্যাগীর জ্ঞান সূর্যের মত, তাতে ঘর-বার দুইই দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যের দু রকম জ্ঞান—এক জ্ঞানসূর্য ধক্ ধক্ করছে। তখন তিনি পরমাত্মার সহিত এক। আর এক জ্ঞান চাঁদের মত মধুর, তখন তিনি ভক্তিকে আশ্রয় কোরে শরীর ধারণ কোরে আছেন। শ্রীচৈতন্যে ব্রহ্মজ্ঞান এবং পরাভক্তি দুইই ছিল।

'দুটো পথ—নেতিমার্গ জ্ঞানের, এবং ইতিমার্গ ভক্তির। জ্ঞান প্রচার বড় শক্ত। "সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরুশিষ্যে দেখা নাই।" সেইজন্য জনক শুকদেবের কাছ থেকে আগে গুরুদক্ষিণা চাইলেন। ব্রহ্মজ্ঞানে গুরুশিষ্যের ভেদ বোঝা যায় না। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। কলিতে নারদীয় ভক্তিই গৃহস্থের পক্ষে ভাল।' ২।৯।৫২

।। জ্ঞানীর সংসার ।।

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন কেশবকে বল্লেন, 'বাপু, সংসারের রোগ সারবে কি কোরে বল, যদি না নির্জন বাস করে? একে বেঘোর জ্বর, তাতে সেই ঘরেই আবার তেঁতুলের আচার, জলের জালা—এখন আরোগ্য লাভ কি কোরে আশা করা যায়!' (শুনে সকলে হাসতে লাগলেন)। 'দেখ একবার মজা, তেঁতুলের নাম করতে করতেই জিবে জল, তা হলে সত্যিকার তেঁতুল কাছে থাকলে একবার কি হয় ভেবে দেখ। কাম কাঞ্চন আর কি? বিকারী রোগীর কাছে যেমন তেঁতুল আর জলের জালা। এ ভোগের আর শেষ আছে কি? যতই ভোগ করবে ততই আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যাবে। আর ঐ সব রইল রুগীর ঘরে—এখন রোগের উপশম আশা করতে পার? যেখানে এসব নেই রোগীকে এমনি একটা ঘরে নিয়ে যেতে হয়, তবে তো রোগ সারবে! তবে রোগ থেকে সেরে উঠে আর ঐরূপ ঘরে গেলে কোন দোষ হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন করলে, তাঁর কৃপা হলে, আর কামকাঞ্চন মনে ওঠে না। তখন ওসব নিয়ে থাকলেও দোষ হয় না—যেমন ছিল জনক রাজা। অশোদ্‌-গাছের চারায় বেড়া দিতে হয়, কিন্তু বড় হলে তাতে হাতীও বেঁধে রাখা চলে। মাখন তোলা হলে তখন তা জলে ভাসে।' ৩।৯।৫২

।। মা কালীর খেলা ।।

কেশব একদিন হেসে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা কালী কত রকমে খেলা করেন, একবার বলুন না মশাই।' ঠাকুর বল্লেন, 'মা নানান্ রকমে খেলা করেন, তাঁর খেলা অনন্ত ও বিচিত্র—তার কি কেউ পার পেয়েছে? কখন মা মহাকালী, কখন নিত্যকালী, কখন শ্মশানকালী, কখন রক্ষাকালী, কখন শ্যামাকালী। মহাকালী নিত্যকালীর কথা বেদে, তন্ত্রে আছে—যখন সৃষ্টি ছিল না, চন্দ্রসূর্য ছিল না, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ছিল না, যখন অন্ধকারে অন্ধকার ঢাকা ছিল, তখন মা অরূপ মহাকালী—মহাশক্তি অব্যয়-ব্রহ্ম মহাকালের সহিত এক হয়ে ছিলেন। শ্যামাকালীর শান্ত ভাব, হিন্দু গৃহস্থরা পূজো করে, তিনি বরাভয় দান করেন। আর দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হলে লোকে রক্ষাকালীর পূজো করে—তিনি রক্ষা

করেন। আর শ্মশানকালী সংহার করেন, শ্মশানে মশানে ফেরেন, চারিপাশে শব, শিবা, ডাকিনী, যোগীনী, তাঁর ওষ্ঠে রক্তধারা, গলায় নৃমুণ্ডমালা, নরহস্ত কোটীবেড়া। ধ্বংস কোরে আবার পরবর্তী সৃষ্টির বীজ বপন করেন। গিন্নীর মত ন্যাতা-কাতার হাঁড়িতে সৃষ্টির বীজ তুলে রাখেন।' ৪।৯।৫২

।। অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় ।।

স্বামিজী বলছেন, 'বেদান্তের মধ্যে সর্ব-সম্প্রদায় রয়েছে। আদর্শ সম্বন্ধে বেদান্তীদের অদ্ভুত ধারণা। ধরুন তাদের যদি একটী ছেলে থাকে, তাহলে তাকে সে কথন গোড়া থেকে কোন বিশিষ্ট ইষ্ট সম্বন্ধীয় সাধন পদ্ধতি শেখাবে না; কেবল আসন প্রাণায়াম, উপবাস ও মনঃসংযোগ সম্বন্ধীয় ধর্ম্মোপদেশ কিছু কিছু শেখাবে এবং তাকে মাত্র একটী সর্বজনীন ঋক্ (প্রার্থনা) জপের দ্বারা আয়ত্ত করাবে—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গদেবস্য ধীমহি ধিয়োযনঃ প্রচোদয়াৎ"—অর্থাৎ ভূঃলোক, ভুবংলোক এবং স্বলোকের প্রসবিতৃ ওঁকার দেবের বরণীয় জ্যোতিঃ আমরা ধ্যান করি, তিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রকৃষ্ট পথে চালিত করুন।—ব্যস্ এই পর্যন্ত। তারপর একটু বড় হলে সে নানান্ ধর্ম-সভায় বক্তৃতাদি শুনুক এবং ধর্ম, ঈশ্বর, নীতি, পরলোক এবং আত্মা-সম্বন্ধীয় ধারণা গঠন করুক। সে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সাধু-সন্তোদের উপদেশ এবং দার্শনিক মতবাদাদি এবং বিভিন্ন ধর্মের মোল্লা, পাদরী, ভিক্ষুদেরও উপদেশ শুনতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারপর সে গুরু ও ইষ্ট বেছে নেবে। এতে হয়ত একজন শাক্ত হতে পারে, তার স্ত্রী বৈষ্ণব, ছেলে সুফী এবং মেয়ে হয়ত যীশুর ভাবে ভাবুক হতে পারে, কিন্তু তারা পরস্পরের জন্য বেশ সুখী, কারণ তারা সকলেই একেশ্বরেরই বিভিন্ন ভাবে উপাসনা কোরে থাকে।' ৫।৯।৫২

।। বেদ ও যুক্তি ।।

বেদ অভ্রান্ত, বেদ কথনও ন্যায় বিরোধী হয় না। যেগুলো অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলে বোধ হয়, সেগুলো প্রক্ষিপ্ত কল্পনা বুঝতে হবে। অতীন্দ্রিয়

জ্ঞান যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরাই বৈদিক ঋষি, তা তাঁরা যে দেশে, কালে বা জাতিতে জন্মান না কেন। যা সত্য তা কখন প্রত্যক্ষ বা যুক্তি বিরোধী হয় না। সর্ব ধর্মশাস্ত্রে এবং ধার্মিকদের মধ্যে, কিছুকিছু এই অনাদিনিধন বৈদিক-ধর্ম নিহিত আছে। বেদই একমাত্র শাস্ত্র যা বলছে যে বেদ পড়ে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান অনুভূতি সাপেক্ষ, পরোক্ষ জ্ঞান নয়—এখানে 'পুত্র' 'পিতার' সহিত এক হয়ে অনুভূত হয়। এর মাঝখানে কখন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বা চিত্তাদির ব্যবধান থাকে না। জ্ঞাতাকে আবার কে জানবে? জ্ঞাতাকেই আমরা বুদ্ধির কল্যাণগুণরূপ উপাধি দিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত ঈশ্বর রচনা করি। সর্বোৎকৃষ্ট ভাবাদর্শ সর্বোৎকৃষ্ট মনুষ্যসৃষ্ট। যেখানে সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণতা, সেখানে উপাস্য-উপাসক এক হয়ে যায়। ৬।৯।৫২

॥ সংসারীর কর্তব্য ॥

একদিন প্রভু মাষ্টারকে বলছেন, 'প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু না কিছু ঋণ থাকে, তা শোধ করতে হয়—দেব ঋণ, ঋষি ঋণ, মাতৃ ঋণ, পিতৃ ঋণ, স্ত্রীর ঋণ। বাপ-মার ঋণ শোধ না করে কোন ধর্ম-কর্মই হয় না। স্ত্রীর কাছেও ঋণ থাকে। এই যে হরীশ তার স্ত্রী ত্যাগ কোরে এখানে থাকে, সে যদি তার ব্যবস্থা না করতো তো বলতাম, ধিক্। জ্ঞানলাভ হলে নিজের স্ত্রীকেও সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দময়ী বলে বোধ হয়। চণ্ডীতে আছে, "স্ত্রীয়াঃ সকলাঃ সমস্তাঃ জগৎসু", "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।" দেখ আমি বৃন্দে ঝিকে পর্যন্ত বকতে পারি না। রামপ্রসন্ন হঠ-যোগীদের আফিং আর দুধ যোগায়, কিন্তু তার মার খাবার জোগাড় নেই। অবশ্য মানুষ যখন ভগবানের জন্য পাগল হয়ে ওঠে, তখন কেই বা কার বাপ, আর কেই বা কার মা। তখন একেবারে জগৎ ভুল, দেহের জ্ঞান থাকে না। শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, জল বলে জ্ঞান নেই—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, দেহের সব ভুল হয়ে গেছে। ৭।৯।৫২

।। ভক্তি ও বিধি নিষেধ ।।

একদিন প্রভু ভবনাথকে বলছেন, 'দেখ বাপু! পাপ পুণ্য বিচার আর আমি এখন করতে পারি না। প্রথম ধর্মের উন্মেষে ওসব বিচার দরকার, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় যখন শুদ্ধাভক্তি বা প্রেম আসে তখন আর ওসব মনে থাকে না। তখন পুঁথি-পাতা, বিধি-নিষেধ সব পড়ে থাকে। অনুশোচনা, প্রায়শ্চিত্ত, এসব কোথায় পড়ে থাকে তার ঠিক নেই। সাধকের তখন কবে কে পাপপুণ্য করেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আর সময় থাকে না, এখন কী কোরে তোমায় পাই বল?' ধানের সময় মাঠের আল ধরে ধরে যেতে হয়, কত ঘুরতে ফিরতে হয়, কিন্তু যখন ধান কাটা হয়ে যায়, তখন যে দিক দিয়ে হয়, সিধে চল। ওবড়া খাবড়া থাকে পায় জুতো পর, আর কোনও ভয় নেই। সিধে ঈশ্বরের দিকে চল। বিবেক, বৈরাগ্য এবং বিশ্বাস থাকলে আর ভয় কিসের? গ্রীষ্মকালে নদী দিয়ে কত এঁকে বেঁকে যেতে হয়। কিন্তু যখন বর্ষাকালে বন্যে আসে, তখন একেবারে পাল টাঙিয়ে সিধে চল।' ৮।৯।৫২

।। অচিন্ত্য-শক্তি ।।

ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রকে বল্লেন, 'ঈশ্বরের মায়া কে বুঝবে বল। সমস্ত অসম্ভবই তাঁতে সম্ভব। তাঁর অনির্বাচ্যা প্রকৃতির সংজ্ঞা কেউ দিতে পারলে না। তাঁর যোগ শক্তির কাছে অসম্ভব কিছু নেই। এক জায়গায় দুজন সাধু বাস করতো। সেখান দিয়ে একদিন নারদ যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন জ্ঞানী, তিনি বুঝতে পারলেন, ইঁনি নারদ। তিনি তখন বিনতি পূর্বক নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু! আপনি তো সদ্য বৈকুণ্ঠ থেকে আসছেন, তিনি এখন সেখানে কি করছেন?' নারদ বল্লেন, 'দেখলুম বসে বসে উট হাতী ছুঁচের ছ্যাঁদা দিয়ে এ ধার ও ধার করছেন।' শুনে সাধুটী বললেন, 'এ আর তাঁর পক্ষে আশ্চর্য কি? তিনি সব করতে পারেন।' আর একজন সাধু ছিল, সে শুনে বল্লে, 'বলেন কি মশাই! ছুঁচের ছ্যাঁদা দিয়ে উট হাতী গলানো, একি কখন হতে পারে? আপনি কোন কালেও বৈকুণ্ঠে যান নি।' ৯।৯।৫২

।। সাধনা ও প্রচার ।।

"ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে"—ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলছেন, 'তবে গভীর সমুদ্রে কামক্রোধাদি ছ' রকমের হাঙোর কুমীর আছে ; কিন্তু বিবেক হলদি গায় মাখা থাকলে তারা আর কাছে আসে না। শুধু বক্তৃতা আর পাণ্ডিত্যে কি হবে? বিবেক-বৈরাগ্য চাই। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই বস্তু, তাই তাতে অনুরাগ, আর জগৎ অবস্তু, অনিত্য তাই তাতে বীতরাগ। একবার পোদো বলে একটা লোক হঠাৎ একটা ভাঙা পোড়ো মন্দিরে শাঁখ বাজাতে আরম্ভ করলে। লোকজন ছুটে গেল, ভাবলে বুঝি মন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়েছে ; গিয়ে দেখে কিছু না, সব ফক্কা, কেউ বিরক্ত হোয়ে, কেউ হাসতে হাসতে ফিরে গেল।—একটা ভাঙা মন্দির আর তাতে এগারটা চামচিকের (ইন্দ্রিয়ের) বাসা। পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা না কোরে কেবল শাঁখ বাজাতে অর্থাৎ প্রচার করতে গেলে ঐ পোদোর মত হবে, "মন্দিরে তোর নাইকো মাধব, পোদো শাঁক ফুকে তুই করলি গোল"—এতে লোকে আরও ধর্মে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। ১০।৯।৫২

।। উদারতা ও স্বাধীনতা ।।

স্বামিজী বলছেন, 'সাধারণের মঙ্গলের জন্য আইন. এবং সমাজ—না কোন ব্যক্তি বা বিশিষ্ট দলের সুবিধার জন্য আইন ও সমাজ? দেখা যায় কোন কোন ব্যক্তি বা দল তাঁদের কূটবুদ্ধি, অর্থাদি সহায়ে সমস্ত সাধারণকে নিজেদের তাঁবেদার রূপে রাখতে চান ; তারা যেন তাঁদের যন্ত্রস্বরূপ, তাঁদেরই সুবিধা ও ইচ্ছামত তারা ব্যবহৃত হবে। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা মাত্র সেইটুকু বরাদ্দ করেন, যেটুকু বলবানদের প্রয়োজন। কিন্তু স্বাধীনতা মানে কারও বুদ্ধির ও ঐশ্বর্যের যথেচ্ছাচার নয়, যার দ্বারা অপরে উৎপীড়িত হোক বা তাদের জীবন একটা যন্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠুক। স্বাধীনতা মানে নিজের বুদ্ধি ও ঐশ্বর্যের সম্যক্ ব্যবহার, যাতে কারও অনিষ্ট না হয়, সকলেই স্ব স্ব জীবনে মঙ্গলের সুযোগ পায়। স্বাধীন ব্যক্তির কর্মের দ্বারা দুর্বল, পীড়িত উজ্জীবিত

হয়ে ওঠে এবং সে জীবনে অধিকতর উন্নত হয়ে ওঠে। নিজেকে উন্নত করবার একমাত্র উপায়, অপরকে উন্নত করবার চেষ্টা ও আন্তরিকতার সহিত ধ্যান।' ১১।৯।৫২

।। স্বাধীনতা ।।

স্বাধীনতা নিজে অর্জন করতে হয়, অর্থাৎ নিজে স্বাধীনতার উপযুক্ত হতে হয়। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্"—নিজের বুদ্ধির দ্বারা নিজ আত্মাকে উদ্ধার করবে। অপরে কি কোরে আমার ভাগ্যবিধাতা হবে!—যদি আমার ভেতরের আত্মশক্তি আমি নিজে জাগ্রত না করি? নিজের আত্মশক্তি বিকাশের চেষ্টা না কোরে কারও অধিনায়কত্ব স্বীকার করা মানে তার বা তাদের দাসত্ব স্বীকার করা। মুক্তির জন্য সংগ্রামই জীবনের একমাত্র ব্রত হওয়া দরকার। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হওয়াই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কাম্য। যে আবার এ বিষয়ে অপরকে সাহায্য করে, সে তার জীবনে অপূর্ব বলাধান অনুভব করে। সাহায্য করা মানে 'লিডারি' করা নয়। স্বাধীনতার অন্তরায় যা, তা বে-আইন, তা যত শীঘ্র পার ধ্বংস কর। যে সঙ্ঘ, সমাজ স্বাধীনতার পরিপন্থী, তা নির্মমভাবে ত্যাগ করতে হয়। ১২।৯।৫২

।। "উন্মাদবৎ" ।।

একদিন ঠাকুর বল্লেন, 'পরমহংসেরা কখন কখন উন্মাদের মত ব্যবহার করেন। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই, এক ব্রহ্মজ্ঞানী পরমহংস—পাগলের মত, এখানে এলো, তার এক হাতে কঞ্চি, আর এক হাতে একটা আমের চারা, পায়ে ছেঁড়া জুতো। কোন বিচার আচার নেই। গঙ্গায় স্নান কোরে কোন পূজো পাঠ করলে না। কাপড়ের খুঁটে খাবার বাঁধা ছিল খেল। কালীমন্দিরে ঢুকে স্তব পাঠ করলে, মন্দির যেন কাঁপতে লাগলো। হলধারী মন্দিরে ছিল। অতিথিশালায় তাকে খেতে দিলে না। সে গিয়ে কুকুরদের সঙ্গে এঁঠো খেতে লাগলো। মাঝে মাঝে কুকুরদের ঠেলে দেয়, তা তারা কিছু বলেও না। হলধারী তার পেছুনে

পেছুনে গিয়ে জিগেস করলে, "তুমি কি পূর্ণ জ্ঞানী?" সে বল্লে, "চুপ সত্যই আমি পূর্ণ জ্ঞানী।" আমি হৃদের গলা জড়িয়ে ধরে বললুম, "মা! আমাকেও কি ঐ অবস্থায় যেতে হবে?" হলধারী তার সঙ্গে অনেকদূর গেল। ফটক পার হবার সময় সে বল্লে, "তোকে আর কি বলব, যখন খানার জল আর গঙ্গাজল এক বলে বোধ হবে, তখন জানবি জ্ঞান হয়েছে"।' ১৩।৯।৫২

॥ প্রিয় শিষ্য ॥

কাশীপুর বাগানে একদিন স্বামিজী শবের ন্যায় শীতল হয়ে গেলেন। ঠাকুরকে খবর দেওয়া হলো। তিনি মৃদু হেসে বল্লেন, 'বেশ তো।' নরেন যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁর কাছে এলেন, ঠাকুর বল্লেন, 'যা জানতে চেয়েছিলে তা জানাতো হলো, এখন ও ঘরে তালা চাবি দেওয়া রইল, কাজ শেষ হলেই চাবি খুলে দেওয়া হবে।' নরেন বল্লেন, 'আমি পরম সুখে ঐ অবস্থায় থাকতে চাই।' ঠাকুর বল্লেন, 'ছি, ছি! এ তুই কেমন কোরে চাইলি? আমি ভেবেছিলাম তুই একটা বিরাট আধার, সেখানে কত জীব আশ্রয় নেবে; আর তা না, তুই নিজের ব্যক্তিগত আনন্দ চাস্! আচ্ছা, মার কৃপায় ঐ সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন তোর এমন স্বাভাবিক ভাবে উপস্থিত হবে যে তুই সাধারণ চলাফেরার মধ্যেও ঐ এককেই প্রত্যক্ষ করতে পারবি। তোকে লোক-কল্যাণের জন্য অনেক মহৎ কাজ কোরতে হবে, তোকে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক জোয়ার আনতে হবে। তোর কর্মে দীন দুঃখীরা তোকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে।' ১৪।৯।৫২

॥ "ব্রাহ্মীস্থিতি" ॥

স্বামিজী লিখছেন, 'আমরা প্রায়ই দেখি অতি ভাল লোকও নানাবিধ দৈব-দুর্বিপাকে পড়ে কষ্ট পায়। অনেক সময় এ সব দুর্ঘটনার সমাধান আমরা কিছুই করতে পারি না। কিন্তু জীবনের আর একটা অভিজ্ঞতা বলে যে এই জগতের অন্তস্-স্থানটা ভালই, এর ওপরভাগেই কেবল ঘাত প্রতি-ঘাতের তরঙ্গ-বিক্ষোভ; ভিত্তিটা কিন্তু এর প্রতিষ্ঠিত এক অনন্ত প্রেম ও মঙ্গলের ওপর। যতদিন পর্যন্ত আমরা ধ্যান সাগরে ডুব দিয়ে এই শান্তির ভূমিটা

না ছুঁতে পারি, ততদিন পর্যন্ত এই সংসার্ সমুদ্রের তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে নাকানি চুবানি খেতেই হবে। কিন্তু একবার সেই মৌন ভূমির দৃঢ় প্রস্তরে আমরা স্থির হতে পারলে এই ওপরকার হাহাকার আমাদের আর বিচলিত করতে পারবে না। আমি বিশ্বাস করি যে, সব ভাল মানুষেরাই এই দৃঢ় ভিত্তির গৃহ আশ্রয় কোরেছেন, যা অনন্ত-কোটী বর্ষ ধরে অচল শান্তিতে বর্তমান।' এইটাই গীতার "ব্রাহ্মীস্থিতি"। ১৫।৯।৫২

॥ সেবা ॥

কে কারে বাসিত ভাল! নিঃশ্বাসের কিবা প্রয়োজন ছিল!
যদি হে না প্রেমানন্দ! প্রেমপারাবার!
তব সুখ-স্পর্শ কভু না পাইত জীব
প্রতি প্রাণস্পন্দ মাঝে তার।—বেদ, তৈত্তিরীয় শাখা॥

ভাগ্যবান্ কেউকেউ বুঝতে পারে, সেবার জন্য আমাদের জন্ম। আমরা যে সেবা না কোরে পারি না, কারণ আমার প্রেমাস্পদ আত্মা সকলের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে মিলবার জন্য আকর্ষণ করছেন; আমার সেবা নেবার জন্য তিনি যে পাগল হয়ে দীন, দুঃখী, পীড়িত হয়ে আমার কাছে পুনঃপুনঃ ঘুরেফিরে আসছেন। বলেন, 'আমার সেবা কর, আমি যে তোমার পুত্র!' 'আমার সেবা কর, আমি যে তোমার বন্ধু!' 'আমার সেবা কর, আমি যে তোমার প্রভু!' শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এলেন কেন? জীবকে এই স্বাভাবিক ধর্ম, যা চিরন্তন, শেখাবার জন্য—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" ১৬।৯।৫২

॥ মূর্ত ভগবান ॥

"অন্তরে বাহিরে যেই হরি বর্তমান
সর্বহস্তে কর্ম যাঁর সর্বপদে গতি
তোমাদের সর্বদেহে যিনি বর্তমান—
তাঁহারই অর্চনা কর, অন্যমূর্তি ভেঙে ফেল আজি।"—শ্রীবিবেকানন্দ

[লেখকের, স্বামী বিবেকানন্দের "The Living God" নামক কবিতার অনুবাদ হইতে।] ১৭।৯।৫২

॥ শয়তান ও অন্তর্-খৃষ্ট ॥

প্রভু একদিন গিরীশকে বল্লেন, 'দেখ একদিন পাপপুরুষকে দেখলুম, আমাকে প্রলুব্ধ করতে এসেছে। আমি প্রার্থনা করতেই দেখি ভুবনমোহিনী মা! বল্লাম, "মা একে বধ কর"।' এই পাপপুরুষ আর কিছু নয়, জীবের ফলোন্মুখ অসৎ সংস্কারের দিক। ভগবান যীশু একেই শয়তান বলতেন। আর জীবের বিবেক বা শুদ্ধ-মনই হলো অন্তর্-গুরু, খৃষ্টানরা একে বলে "Inner Christ"। প্রভু বলেন, 'কত অলৌকিক দর্শন করেছি, সে সব বলতে মানা। একদিন পঞ্চবটীতে ধ্যান করছি, দেখি একজন দীর্ঘ-গুম্ফ জ্যোতির্ময় মুসলমান। হাতে সান্‌কিতে ভাত। কতকগুলো মুসলমানকে খেতে দিলেন, আমাকেও কিছু দিলেন। এ সময় মা দেখালেন—সব একাকার, দুই বলে কিছু নেই। সেই সচ্চিদানন্দই এই সব হয়ে আছেন—জীব জগৎ সব তিনি। আবার অন্নও তিনি। এই দেখ! বলতে বলতে আমার মন ডুবে যাচ্ছে—এখনও তোমাদের দেখছি—যেন চিরকাল বসে আছ—কোথা থেকে আসছ বা কে—কিছুই মনে পড়ছে না।—একটু জল খাব।' এ সময় এক একটা নাম-রূপ, দেশ কালের সম্বন্ধহীন হয়ে ভাসে। যতক্ষণ 'সিনেমা' চলতে থাকে, ততক্ষণ ঘটনার সম্বন্ধ-জ্ঞান ও অর্থ থাকে। হঠাৎ চলন্তিকা নিশ্চল হলে যেন ছবিগুলো চিরকালই এক রূপেই অবস্থান করছে বলে বোধ হয় এবং মনে হয় যেন তারা সম্বন্ধ ও অর্থহীন। তারপর ফিল্‌ম সরে গেলে শুধু থাকে এক আলো। ১৮।৯।৫২

॥ অনাদি প্রশ্ন ॥

"ভাবও ছিল না যেথা অভাবও নয়
বাতাস ছিল না যেথা, তাহারেও অতিক্রমি আকাশও নয়
সর্বাবরণ কিবা-ছিল তথা? আশ্রয়ই বা কি?
গম্ভীর জলধি জল মাঝে, ভাসমান ছিল কি এ, সংসৃতির বীজ?
তখনও ত মৃত্যু নাহি ছিল, অমরত্ব কোথা রবে তথা?
দিবা ও রাত্রির তথা নাহি ছিল চক্রক-নর্তন।

ছিল শুধু সেই এক স্বয়ম্ভুর মৌন-প্রশ্বসন।
আর কিছু নাহি ছিল সেথা, কিছু নাহি, অতিক্রমি তাহা।
প্রথমেতে অন্ধকারে লুক্কায়িত ছিল অন্ধকার
অগাধ জলধিপ্রায় ভ্রান্তিময় দৃশ্য সুদুষ্পার!
সেই 'এক' শূন্যপ্রায় অসৃষ্টিতে ঘেরা
বর্ধমান হন ধীরে স্বগুণ প্রভায়।"

—(নাসদীয় সূক্তানুবাদ, ঋ. বে. ১০।১২৯) ॥ ১৯।৯।৫২

॥ "ঈশানুসরণে" ॥

বিশ্বাস ও নির্ভরতার অফুরন্ত উৎস, স্বামিজী বলছেন, "ঈশানুসরণে" বইখানি। সব মহাপুরুষেরাই একই ভাবে চিন্তা করেন। "ঈশানুসরণে" বইখানিতে গীতার (দাস্য) ভক্তিযোগের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন, "সর্বধর্ম ত্যাগ কোরে আমার শরণ নাও।"—এ বইখানিরও তাৎপর্য তাই! অধীনতা, ব্যাকুলতা—দাস্যভক্তির চরম অভিব্যক্তি এই বইখানির প্রতি ছত্রে চিহ্নিত; পাঠের সঙ্গেসঙ্গে পাঠকের চিত্তে জ্বলন্ত ।বৈরাগ্য, অদ্ভুত আত্মসমর্পণ, গভীর অধীনতা জেগে উঠবে। আমাদের দেশের গোঁড়ারা, বইখানি খৃষ্টানের লেখা বলে অবজ্ঞা করতে পারেন, কিন্তু ঋষি জৈমিনী বলেন, "আপ্ত-পুরুষ আর্য বা অনার্য সকল সমাজেই আবির্ভূত হতে পারেন।" জ্যোতির্বিদ গ্রীকাচার্যদের যখন যবনাচার্য বলে স্বীকার করা হয়েছে, তখন এঁদের মত লোককে আচার্য বলে স্বীকার করা হিন্দু সমাজে হবে না কেন? ২০।৯।৫২

॥ "এশিয়ার আলো" ॥

'রাজকুমার শাক্যসিংহের কথা জানতে গেলে,' স্বামিজী বলছেন, 'আর্নল্ডের "এসিয়ার আলো" বইখানি পড়া দরকার। শ্রীবুদ্ধের উপদেশের সার কথা অহংকারের নাশ (নৈরাত্মবাদ) অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মার বা বুদ্ধির অনিত্যতা। আমাদের জীবনে দুঃখ কেন? কারণ আমরা স্বার্থপর। আমরা

সব সময়ই কেবল নিজেদের সুবিধে খুঁজছি—সেইজন্য এত দুঃখ। এ থেকে বেরুবার উপায় কি?—এই অহংকারের বলিদান। বাস্তবিক এই সাংবৃতিক (Conventional) আত্মার কোন নিত্য সত্তা নেই, বাহ্য জগৎ সম্বন্ধেও তাই। এই জীবন-মৃত্যুর চক্রক-প্রবাহের পশ্চাতে কোন শাশ্বত আত্মা নেই। একটা চিন্তার প্রবাহ চলেছে, একটা চিন্তা আর একটার পেছুনে পেছুনে চলেছে। তারাও আবার উৎপত্তি-মাত্র নাশ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অলাতচক্রের মত একটা নিত্য-আত্মা এবং তাতে বাহ্যজগতের ভ্রান্তি হচ্ছে—এই চিন্তা-প্রবাহের কোন চিন্তক নেই—সঙ্গেসঙ্গে দেহও বদলাচ্ছে, মনও বদলাচ্ছে। কাজেকাজেই নিত্য আত্মা একটা ভ্রান্তি। ঐ মিথ্যা আত্মার পুষ্টির জন্যই যত স্বার্থপরতা। এটা বুঝতে পারলেই নির্ভয় এবং আনন্দ।' ২১।৯।৫২

॥ ভক্তির ক্রম ॥

পানিহাটীতে ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীকে বল্লেন, 'দেখ, ভক্তি থাকলে তবে ভাব হয়, তার পর মহাভাব; এই মহাভাবেরই উৎকর্ষ পরাপ্রেম, তারপর ঈশ্বরে স্থিতি। এ গৌরাঙ্গের হয়েছিল, তাঁর মহাভাব পরাপ্রেমের অভিজ্ঞান ছিল। যখন এই পরাপ্রেমে ভক্ত মগ্ন হয়, তখন জগৎ ভুল হয়ে যায়, এত প্রিয় যে দেহ, তাও ভুল হয়ে যায়। যমুনা ভেবে গৌরাঙ্গ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।' এই পরাপ্রেমকে শাস্ত্রে মহাভাবের একটী বিশিষ্ট উৎকর্ষ, দিব্যোন্মাদ বলে। আর নইলে রাগাত্মিকা ভক্তির প্রথম প্রকাশ রতি, তারপর প্রেম, তার পর স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব। মহাভাব দুভাগে বিভক্ত—রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ় আবার দুভাগে বিভক্ত—মোদন ও মোহন। মোহন আবার দুভাবে উৎকর্ষ লাভ করে—উদ্ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প। কথামৃতের 'প্রেম' পদের লক্ষিত বস্তু ঠাকুরের উদ্ঘূর্ণা বা দিব্যোন্মাদ-মহাভাব। তারপর ঈশ্বর-স্থিতি বা চিত্রজল্প-মহাভাব। সাধারণ ভক্তের মহাভাব বা পরাপ্রেম হয় না, বড়জোর ভাব পর্যন্ত। ২২।৯।৫২

॥ পুঁথি ঃ ঃ গোঁসাই ॥

নবদ্বীপ গোস্বামীর ছেলে বেদ পড়ছে শুনে ঠাকুর বল্লেন, 'তোমাদের বাপু, বেশী পড়াশুনো ভাল নয়, বরং উল্টোৎপত্তি হয়, ভক্তির হানি হয়। শাস্ত্রের সার জেনে নিলেই তো হলো, তার আবার অত পুঁথি-পাতার দরকার কি? সার কথাটা জেনে নিলে, ব্যস্, সাধন সাগরে ডুবে যাও। মা আমায় বেদের সার বুঝিয়ে দিয়েছেন, "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা।" গীতার সার, পদটা উল্টুলে যা থাকে,—"ত্যাগী, ত্যাগী"; অর্থাৎ হে জীব! সব ত্যাগ কোরে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও।' নবদ্বীপ বল্লেন, 'আমরা মনটাকে ত্যাগ করতে পারি না কেন?' ঠাকুর হেসে বল্লেন, 'তোমরা হোলে গোঁসাই, মন্দিরে তোমাদের ঠাকুর সেবা রয়েছে, তোমরা নইলে সেবা চলবে কেমন কোরে? তোমাদের মনে মনে ত্যাগ হলেই হলো। তোমাদের ভগবান সংসারে রেখেছেন লোক-শিক্ষার জন্য, তোমরা চেষ্টা কোরলেও সংসার ত্যাগ কোরতে পারবে না গো! তোমাদের এমন স্বভাব দিয়েছেন ভগবান, যে তোমরা সাংসারিক কর্তব্য না কোরে পারবে না। অর্জুন বল্লেন, "যুদ্ধ করব না।" শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন, "সখা! তোমার প্রকৃতি তোমাকে করাবে"।' শেষকালে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে ফের নেমে বল্লেন, 'তোমাদের যোগ-ভোগ দুই।' ২৩৷৯৷৫২

॥ হৃদয় ও মস্তিষ্ক ॥

আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুই-ই দরকার। হৃদয় জিনিষটা খুব বড়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জীবনের যাবতীয় আধ্যাত্মিক প্রেরণা এই হৃদয়ের মধ্য দিয়েই অধিকাংশের স্ফুরণ হয়। স্বামিজী বলেছিলেন, 'আমাকে যদি কেউ হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বেছে নিতে বলে, তা হলে আমি হৃদয়টাই বেছে নেব। কেবল বুদ্ধিমান হওয়ার চাইতে আমি কেবল হৃদয়বান হওয়া ভাল মনে করি।' জীবন, প্রগতি প্রভৃতি সবই সম্ভব—যার হৃদয় আছে, কিন্তু কেবল মস্তিষ্ক—শেষে শুকিয়ে যায়। কিন্তু কেবল হৃদয়-সহায় যারা তাদের পথে অনেক গুপ্ত বাধা-বিপত্তি এসে পড়ে, যার জন্য তাকে প্রগতি পথে অনেক সময় হোঁচট খেতে হয় বা গর্তে পড়তে হয়। স্বামিজী চান, হৃদয় ও মস্তিষ্কের

সামঞ্জস্য। এর মানে এ নয় যে, হৃদয় মস্তিষ্কের জন্য তার প্রেমকে ত্যাগ করবে, অথবা মস্তিষ্ক হৃদয়ের জন্য তার সত্যকে ত্যাগ করবে। পরন্তু অনন্ত হৃদয়ের সহিত সমান্তরাল ভাবে অনন্তবুদ্ধি। ২৪।৯।৫২

॥ বিধান ও মুক্তি ॥

যেখানেই বিধান, সেখানেই বন্ধন, বিধানের বাইরে মুক্তি। মনের ও দেহের যথেচ্ছাচারিতার সংযম বা হাতকড়া হলো বিধান, কিন্তু আত্মার স্বস্বরূপে অবস্থানের বাধা হলো বিধান। দেশকাল নিমিত্তাতীত আত্মার স্বভাবই হলো স্বাধীনতা, যা দেশকালের অধীন তাই পরাধীনতা, বিধানের ক্ষেত্র। জড়ের অবগুণ্ঠনের ভেতর দিয়ে আত্মার স্বাধীন-স্বরূপ মাঝেমাঝে কিছুকিছু উপলব্ধ হয়, যাকে আমরা দেশের স্বাধীনতা, সমাজের স্বাধীনতা, পরিবারিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলি। কিন্তু যথার্থ স্বাধীনতা একটা প্রেরণা বা জ্ঞান এবং সেটা পাবার আশা আমাদের আছে। নইলে মানুষ বাঁচতে পারে না। কয়েদী বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আশায় বেঁচে থাকে, রোগী যন্ত্রণার মধ্যে স্বাস্থ্যের আশায় বেঁচে থাকে। শিশু তার অপারগতার মধ্যে যৌবনের সামর্থ্যের আশায় বেঁচে থাকে। অপমানিত প্রতিশোধের সুযোগের জন্য বেঁচে থাকে। ব্যর্থতা ভবিষ্যৎ দৈবসিদ্ধির আশায় বেঁচে থাকে। ইহকাল পরকালের মুক্তির জন্য বেঁচে থাকে। ২৫।৯।৫২

॥ রাধা তত্ত্ব ॥

একদিন ঠাকুর নরেন ও তার বন্ধুকে বল্লেন, 'রাধা হলেন ত্রিমূর্তি—(১) কামরাধা—চন্দ্রাবলি (সম্ভোগাত্মিকা, মদীয়তাময়ী, তুমি আমার, হরি-মোহিনী, জগন্মোহিনী); (২) প্রেমরাধা—(বিরহাত্মিকা, সেবাত্মিকা, তদীয়তাময়ী, আমি তোমার, মহাভাব-স্বরূপা, বিশুদ্ধ-সত্তা, বিচ্ছেদেই মহাভাবের প্রকাশ পায়); তারপর (৩) নিত্যরাধা—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপা, কৃষ্ণাত্মিকা, ত্রিগুণাত্মিকা, যোগমায়া। পেঁয়াজ ছাড়ালে প্রথম লাল রঙের খোসা, তারপর গোলাপী রঙের, তারপর সাদা শাঁস, আর কোন খোসা নেই—প্রেমরাধা। (নিত্য-

রাধাকে আশ্রয় কোরেই সৃষ্টি স্থিতি লয়; কামরাধায় ইচ্ছা প্রধান, সত্ত্বপ্রধান রজঃ এবং প্রেমরাধা বিশুদ্ধসত্তা)।' উপায় ঐ একই—"নেতি নেতি"। রাধাকৃষ্ণের দুটো দিক—পারমার্থিক এবং সাংবৃতিক, যেমন সূর্য আর তার কিরণ। সূর্য যেন পরমার্থ, অব্যয়, আর সূর্যকিরণ সংবৃত, অপেক্ষিত শক্তি-ভাব। 'পাকা ভক্তেরা ব্রহ্ম ও শক্তিকে এক বলেই জানেন, শাঁসই খোসারূপে থাকে; তাঁরা কখন নিত্য সম্ভোগ করেন, কখন লীলা। দুই বা বহু নেই, সব একেরই খেলা। ঈশ্বরে সবই সম্ভব—তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, তিনি ব্যষ্টি, তিনি সমষ্টি, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। তাঁর মহিমার কেউ 'ইতি' করতে পারে না। চিল যত উঁচুতেই উঠুক আকাশের ছাত পাবে না। ব্রহ্ম অবর্ণনীয়, দেখলেও বলা চলে না। ঘী কেমন? না, যেমন ঘী!' ২৬।৯।৫২

॥ স্বামিজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

স্বামিজী একদিন তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যশিষ্যাদের বললেন, 'আমি মা কালীর ভাব একেবারেই পছন্দ করতুম না। ছ বছর ধরে আমাকে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে, যেন আমাকে ঐ আদর্শ গ্রহণ না করতে হয়। কিন্তু অবশেষে ঐ আদর্শ স্বীকার ও গ্রহণ করতে হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে তাঁর পাদপদ্মে নিবেদন করলেন, এখন আমি বিশ্বাস করি যে তিনি আমাকে সর্বতোভাবে পরিচালনা করেন এবং তিনি আমাকে দিয়ে যা খুসী তাই করাতে পারেন। কিন্তু আমি অনেক লড়াই করেছি। আমি ঐ পল্লীগ্রামের সরল ব্রাহ্মণটীকে বড় ভালবেসে ফেলেছিলাম; ঐ ভালবাসাই আমাকে তাঁর কাছে ধরে রেখেছিল। আমি তাঁর পবিত্রতা দেখে অবাক হয়ে যেতুম, তার ওপর আবার অগাধ ভালবাসা। তাঁর মহত্ত্বের সুপ্রভাত তখনও আমার ওপর হয় নি। তারপর যখন আমি ধরা দিলুম, তখন সেই মহত্ত্ব আমার কাছে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ কোরতে লাগলো। প্রথম আমি তাঁকে শিশুর মত খেয়ালী ভেবেছিলুম—কেবল সব অলৌকিক দর্শনই দেখেন। আমি এ সব পছন্দ করতুম না, কিন্তু পরে আমাকে সব স্বীকার করতে হলো। আমার পরাজয় সে এক রহস্য-ব্যাপার। ব্রাহ্মণ সুযোগ পেয়ে আমাকে তাঁর কৃতদাস করে ফেল্লেন। তারপর ঐ পরমহংস আমাকে মা কালীর পাদপদ্মে উৎসর্গ

করলেন। ছ মাসের বেশী আর তাঁর স্বাস্থ্য ও ঔজ্জ্বল্য রইল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণই মা কালীর অবতার বলে পূজিত হবেন।' ২৭।৯।৫২

॥ সাত্ত্বিক ও রাজসিক জাতীয় চরিত্র ॥

আর একদিন স্বামিজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যশিষ্যাদের বল্লেন, 'প্রাচ্য চায় অধীনতা, প্রতীচ্য চায় সংগ্রাম। সেইজন্য আমাদের জীবনে ভোগ করবার সময় থাকে, কিন্তু তোমরা মোটেই বিশ্রামের সময় পাও না। তোমাদের সব সময় চেষ্টা—তোমাদের অবস্থা আরও কি কোরে ভাল করা যায়, কিন্তু কাজ একটুও শেষ না হোতেই মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়ায়, তোমাদের তাকে অনুসরণ করতে হয়। পাশ্চাত্য আদর্শ সর্বদাই প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু প্রাচ্য আদর্শ সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সহ্য। পরিপূর্ণ জীবন হবে এই দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান। কিন্তু ওটা ব্যাপক কোন কালে হবে না, এ মাত্র দু একজনে দেখা যায়। হিন্দু মতে মানবের সকল আশাই পূরণ কথন হবে না—জীবনে কেবল বাধার পাথর গোপনে সাজান। ইউরোপীয়রা বলে, "বাধা সরিয়ে রাস্তা কোরে নিতে হবে। নূতন নূতন সুযোগ ও আদর্শ সৃষ্টি করতে হবে।" কিন্তু শেষে দেখা যায় আমরা পেয়েছি কেবল একটা খারাপের জায়গায় আর একটা আর এক রকমের খারাপ, একটা কাঠিন্যের জায়গায় আর একটা কাঠিন্য।' ২৮।৯।৫২

॥ প্রতীক—সূর্য ও পদ্ম ॥

স্বামিজী বলছেন, 'প্রভাত-সূর্য কত গৌরবে উঠছে; আলোক, প্রাণ এবং আনন্দ দিলো জগৎকে, দুহাতে বিলালো সারা দিন ধরে; ক্রমে সেও অন্ধকারে বিলীন হলো। কিন্তু আবার ভোরে দেখা দিলো একই গৌরবে ও সৌন্দর্যে।

'আবার দেখ পদ্ম—নীল, সিন্ধু এবং তাইগ্রীসের শৈত্যে যাদের জন্ম—যেখানে হলো সভ্যতার জন্ম স্থান। সূর্য-কিরণ-স্পর্শে তারা অপূর্ব মহিমায় ফুটে

ওঠে, আবার সন্ধ্যাগমে সংকুচিত হয়। ওদের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা আসে, বিকশিত হয়, আবার অন্তর্হিত হয়; কিন্তু আবার তাদের সমাধির ভিতর থেকে নব কলেবরে আবির্ভূত হয়।

'সেইজন্য এই সূর্য ও পদ্ম যাবতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে। এ সব প্রতীকের প্রয়োজন কি? কারণ সূক্ষ্ম চিন্তা, তা যাই হোক, তাকে প্রকাশ করতে গেলে তাকে দৃশ্য, ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় এমন কোন একটা স্থূল পোষাকে প্রকাশ করতে হবেই। কথাটা হচ্ছে, কোন কিছু চলে যাওয়া মানে নষ্ট হওয়া নয়, তাতে সুপ্ত হওয়া এবং ভেতরে ভেতরে কাজ হয়ে তার পুনরায় বহিঃ প্রকাশ ঘটা, যাকে কেন্দ্র কোরে আবার নূতন জীবনযাত্রার আবির্ভাব।'—এই তত্ত্বেরই প্রতীক হলো সূর্য ও পদ্ম। ২৯।৯।৫২

॥ ঈশ্বরের রাজ্য, তবে এত দুঃখ কেন? ॥

মণি মল্লিকের নাতনী-জামাই একখানা বই থেকে, (বোধ হয় হিগেল্ দর্শন সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ), শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনালেন যে ভগবানকে ঠিকঠিক জ্ঞানী বা সর্বজ্ঞ বলা চলে না, তা না হলে তাঁর সৃষ্টিতে এত দুঃখ-কষ্ট কেন? মানুষ মরে কত কষ্ট পেয়ে, কেন? একেবারে মেরে ফেল্লেই তো হয়? লেখক যদি স্রষ্টা হতেন, তা হলে তিনি আরও ভাল সৃষ্টি করতে পারতেন। শুনে ঠাকুর মাষ্টার মশাইকে বল্লেন, 'দেখ বাপু, ভগবানের কার্য কি অল্পবুদ্ধি মানুষ সব বুঝতে পারে? আমিও কখন ভগবানকে ভাল, আবার কখন মন্দ মনে করি। তিনি তাঁর মায়া দিয়ে আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়ে রেখেছেন। কখন তিনি আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেন, আবার কখন ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। এই যেন অজ্ঞান নেই, আবার পরক্ষণেই সব ছেয়ে ফেলে। পানাপুকুরে একটা ঢিল ফেল, পানা সরে যাবে, খানিকক্ষণ জল দেখা যাবে, তারপর পানাগুলো নাচতে নাচতে এসে ফের জল ঢেকে ফেলবে। যতক্ষণ দেহে আত্মবুদ্ধি, ততক্ষণ সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ব্যাধি-শোক, ভাল-মন্দ আছে। দেহাত্মবুদ্ধি গেলে নব-জন্ম লাভ হয়; আত্মজ্ঞানে বোঝা যায়, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সব স্বপ্নবৎ।' ৩০।৯।৫২

॥ পুঁথির কাজ ॥

স্বামিজী বলেন, 'বই ঈশ্বরের কথা বরাবর বলতে পারে না, তবে ব্রহ্মজ্ঞানের যে বাধাস্বরূপ অজ্ঞান সেটাকে নাশ করতে পারে। পুস্তকের কাজ ব্যতীরেক-মুখী (negative)। পুঁথি অর্থাৎ শ্রবণ ও মননের সঙ্গেসঙ্গে মুক্তির দ্বারে আঘাত করা, এ এক শ্রীশঙ্করেরই কৃতিত্ব। কিন্তু এ চুল-চেরা সূক্ষ্মবুদ্ধি পাওয়া বড় কঠিন। সেই জন্য মানুষকে প্রথম একটু স্থূল তত্ত্ব নিয়ে আরম্ভ করতে হয় এবং ক্রমে তাকে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর স্তরে নিয়ে যেতে হয়। প্রত্যেক ধর্মের এই হলো ধারা। এই জন্য তারা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। বিচিত্র-বুদ্ধি মানবের তাই কোন-না-কোন একটা ধর্ম বেশ জীবনে খাপ খায়; এই জন্যই ধর্মগুলো টিকে আছে। আবার দেখা যায় যে অজ্ঞান আমরা বই পড়ে নাশ করবার চেষ্টা করছি, সেই অজ্ঞানই শাস্ত্রে মাঝেমাঝে ছড়ান। গ্রন্থের উদ্দেশ্য—হৃদয়গ্রন্থি নাশ করা, চিত্তের অন্ধকার কোণগুলিতে আলোকপাত করা। সত্যই অসত্যকে জয় করতে পারে। আত্মা চিরকালই স্বাধীন, স্বাধীনতা কেউ সৃষ্টি করতে পারে না; যতক্ষণ একখানা পুস্তকের ওপর দল বাঁধাবাঁধি, ততক্ষণ সেখানে ঈশ্বর নেই।' ১।১০।৫২

॥ নিবেদন ও নির্লিপ্ত ॥

স্বামিজী একদিন "সহস্র-দ্বীপোদ্যানে" শিষ্যশিষ্যাদের বললেন, 'যা কিছু করবে সব ভগবানকে নিবেদন করবে। এমন কিছু কোরো না, যা তাঁকে নিবেদন করা চলে না। পৃথিবীতে বাস করবে, কিন্তু তার হয়ে যেও না। পদ্ম-ফুলের মূল পাঁকে থাকে বটে, কিন্তু সে নিজে জলের ওপর ভেসে থাকে, কেমন পবিত্র নির্মল। যে যাই করুক বলুক, তোমাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসা যেন উৎপীড়িতদের নিকট পৌঁছয়। অন্ধ রূপ দেখে না, তা হলে দেখ তোমাদের ভেতর দোষ না থাকলে, তোমরা অপরের দোষ দেখবে কি কোরে? আমরা যা বাইরে দেখি সেটা আমাদের ভেতরের সঙ্গে মিলিয়ে তবে কথা বলি। আমরা নিজেরা পবিত্র হলে, অপবিত্রতা আমাদের চোখে পড়বে না। তারা অপবিত্র থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে নয়। সকল স্ত্রী, পুরুষ, শিশুতে ঈশ্বরকে দর্শন

কর। তোমার অন্তরের পবিত্র জ্যোতিতে সব দর্শন কর। সংসার সাধ কোরে নিজে চেও না, তুমি যা চাও তা সবই তাঁর কাছেই পেতে পার। তাই বলি, কেবল তাঁকেই খোঁজ। সংসারে যত ক্ষমতা পাবে, জেন তত বন্ধন, তত ভয়ও সঙ্গেসঙ্গে আছে। স্রষ্টার জ্ঞানোপার্জন কর, সৃষ্টির নয়।' ২।১০।৫২

।। প্রাচ্যের নারী ।।

স্বামিজী একবার হিন্দু স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করেন। 'স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যবহারই একটা সভ্যতার মান-যন্ত্র। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রী-পুরুষের আইন-কানুনে ভেদ ছিল না। উভয়ের প্রতি ব্যবহারে সম্পূর্ণ সমতা অবলম্বন করা হোত। হিন্দুদের মধ্যে নিয়ম,—কেউ পুরোহিত হতে পারবে না, যদি না বিবাহিত হয়। গৃহস্থের ধর্ম-কর্ম একক হয় না, সস্ত্রীক করতে হবে। ধারণাটা হচ্ছে—একক জীবন মানবের অৰ্দ্ধেক, সম্পূর্ণ নয়। ভারতের আদর্শ নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন, বিশেষতঃ সামাজিক ঘরোয়া ব্যাপারে তারা অনেক সময় পুরুষকে আমলই দেয় না; টাকা রোজগার পুরুষ করতে পারে, বাইরে কাজে লাগান না লাগান তার ইচ্ছা, কিন্তু যেই টাকা-পয়সা ঘরের সিন্ধুকে ঢুকলো, তখন আর তার ওপর পুরুষের অধিকার নেই, তখন স্ত্রী যা ভাল বুঝবে তাই স্বীকার করতে হবে। অবশ্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত অর্থাদির কথা হচ্ছে না। সমস্ত পরিবার স্ত্রীর সতীত্বকে কেন্দ্র কোরে গড়ে ওঠে; এই সতীধর্মের অত্যধিক ভাব-প্রবণতা "সতীদাহে" পরিণত হয়েছিল। বিধবা-বিবাহ আইন করা হলো, কিন্তু সেটা ঘৃণ্য ব্যাপারে দাঁড়ালো, সাধারণে চললো না। হিন্দু নারীর এই অত্যদ্ভুত চরিত্রের সহিত যদি তাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা যায়, তা হলে এক আদর্শ নারী-সমাজ সৃষ্টি হবে।

'আমাদের আর একটা অভিজ্ঞান—হিন্দু মায়ের স্নেহ যেন মেয়ের প্রতি ছেলের চেয়ে একমাত্রা বেশী। কিন্তু তাঁরা ছেলেদের নিজস্ব সম্পত্তি মনে করেন; মেয়েদের কিন্তু অতটা মনে করতে পারেন না, কারণ তারা কিছুদিন পরে স্বামীর ঘরে চলে যাবে। সতী-স্ত্রীর স্বামীর প্রতি দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্ভ্রমের সহিত একটু ভয়ও মিশ্রিত আছে। কিন্তু পুত্রেরা যেন তাঁর ক্রীতদাস, যতদিন না তাঁরা একেবারে অসমর্থ হয়ে পড়েন; কিন্তু ছেলেকে অপর কেউ

শাসন করবে, এ ব্যাপারটা তাঁরা একেবারেই সহ্য করতে রাজি নন। তাদের সম্বন্ধে ভাল মন্দ যা কিছু তা তাঁদের কাছে নিবেদন করতে হবে এবং তাঁরা নিজেরাই তার বিচার করবেন। অবশ্য যেখানে স্নেহ একেবারে অন্ধ, সেখানে এর ফল বিষময় হয়ে ওঠে। এগুলো দোষ কি গুণ, তা আমরা জানি না, কিন্তু ভালভাল পরিবারে এ সব লক্ষণ অত্যন্ত পরিস্ফুট।' ৩।১০।৫২

॥ পূজো ॥

ভক্তিশাস্ত্র মতে পূজো পাঁচ ভাগে বিভক্ত :—

১) অভিগমন = দেবতার স্থান মার্জন, উপলেপন ও নির্মাল্য দূরীকরণ।

২) উপাদান = গন্ধপুষ্পাদি চয়ন।

৩) যোগ = আপনার সহিত স্বীয় অভীষ্টদেবের অভেদ ভাবনা।

৪) স্বাধ্যায় = মন্ত্রার্থসন্ধানপূর্বক জপ, সূক্ত স্তোত্রাদি পাঠ, হরিনাম সংকীর্তন এবং ঈশ্বর নিরূপক বেদান্তাদি তত্ত্বশাস্ত্রের অভ্যাস।

৫) ইজ্যা = যথার্থরূপে স্বীয় ইষ্টদেবতার আপ্তবৎ সেবা।

এর দ্বারা সার্ষ্টি, সামীপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য ও সারূপ্য মুক্তি লাভ হতে পারে।—(পদ্ম পুরাণে পাতালখণ্ড চতুর্থ অধ্যায়)॥ ৪।১০।৫২

॥ সংসার ত্যাগ ॥

'আমি সব চাইতে ভালবাসতুম আমার মাকে', স্বামিজী একবার লিখছেন, 'কিন্তু তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী প্রচারের জন্য আমি সংসার ত্যাগ করেছি। কারণ ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভেতর দিয়ে ছাড়া তাঁর 'মিশন্' কখন পৃথিবীর সূর্যালোক দেখতে পেত না। জড়বাদ এবং বিলাসের বন্যার সামনে প্রথম কারা বুক দিয়ে দাঁড়িয়েছে—এই গোটাকতক আত্মত্যাগী যুবক ছাড়া! এতে ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্‌লার যে কী উপকার হয়েছে তা আর বলবার নয়। এই তো মাত্র আরম্ভ। শ্রীশ্রীপ্রভুর আশীর্বাদে তারা জগতে এমন সব কাজ করবে, যার জন্য বহু যুগ ধরে গরীব দুঃখী যারা, তারা তাঁদের আশীর্বাদ করবে। একদিকে ভবিষ্যৎ ভারতের সোনার স্বপন,—কোটী

কোটী লোকের অতলে নিমজ্জন হতে উদ্ধার, আর, আর এক দিকে আমার আত্মীয়-স্বজন প্রিয় জনের মহাকষ্ট—আমি পূর্বেরটাই বেছে নিয়েছি; শ্রীভগবান অপর পক্ষের এবং সকলের মঙ্গল করুন, পরিসমাপ্তি তাঁরই হাতে। যতক্ষণ আমার আন্তরিকতা আছে, ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে আছেন, ততক্ষণ আমাকে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও নেই।' ৫।১০।৫২

।। ধ্যেয় ।।

দেখ দিব্যদৃষ্টিতে—ধ্যানপূতঃ আনন্দ-কল্পনায়—এক নিরীহ আনন্দময় পুরুষ; একখানি ছোট খাটে দক্ষিণেশ্বরের এক কোণের ঘরে বসে আছেন; মন দিয়ে স্মিত-মুখে শিষ্যদের অন্তরের কথা শুনছেন; কখনও বা ছোটো-খাটো দুঃখ-দুশ্চিন্তার পারিবারিক বিষয়েও অংশ গ্রহণ করছেন, কখন ভেঙে-পড়া যোগেনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কখনও বা দুর্দান্ত নরেনের রাশ টেনে রাখছেন, কখন বা নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'তুই ভূত হতে চাস, না ভগবান হতে চাস?' কখন বা এই তেজী অশ্বশাবকদের দৌড় করিয়ে তাদের গতির মাত্রা পরীক্ষা করছেন, কখন বা ভীষণ যুক্তি-তর্কের ঝড়ের মধ্যে কারও নিকট নিজের সবল-হস্ত প্রসারণ কোরে সাহায্য করছেন, কখনও বা মন্তব্যের দ্বারা তাদের চিন্তার ঝঞ্ঝা নিস্তব্ধ কোরে আনছেন।—হে চিত্তবৃত্তি-নিরোধি মনস্তাত্ত্বিক! তোমাতে সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হই!—(রোমাঁরোলাঁর ভাষা চিত্রাবলম্বনে)। ৬।১০।৫২

।। চেতনার স্তর ।।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলছেন, 'জান, চেতনার নানা রকম স্তর আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। মহাকারণে গিয়ে সব চুপ, সেখানে আর বলাবলি নেই। কিন্তু ঈশ্বরকোটিরা মহাকারণ প্রাপ্ত হয়েও আবার নীচের স্তরে নামতে পারেন। অবতার এবং ঈশ্বরকল্পেরাই ঈশ্বরকোটি। তাঁরা সর্বোচ্চশিখরে যেমন উঠতে পারেন, আবার নেমে আসতেও জানেন। তাঁরা সিঁড়ি বেয়ে ছাতে ওঠেন, আবার সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় নেমে

আসেন; একে শাস্ত্রে বলে অনুলোম-বিলোম গতি। যেমন রাজার সাত-তলার প্রাসাদ। অপরিচিতেরা বড় জোর নীচের তলায় যেতে পায়, কিন্তু রাজকুমারেরা জানে এ বাড়ী তাদের, তারা সব তলায়, সব ঘরে ঘুরে বেড়ায়। এক রকমের হাউই আছে, তারা প্রথম এক রকম তারা কাটে, তারপর মনে হয় বুঝি নিভে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অন্য রকমের তারা কাটতে আরম্ভ করলে, আবার আর এক রকম, আর এক রকম। আবার আর এক রকমের হাউই খানিক উঠে একবার তারা কেটে ধুপ কোরে পড়ে গেল। এই শেষেরগুলো হলো জীব, অনেক চেষ্টার পর একটু ওপর স্তরে উঠতে পারে। কিন্তু তাদের ফিরে এসে কিছু আর বলবার সামর্থ থাকে না। তারা সমাধি থেকে নেমে আর আসতে পারে না।' ৭।১০।৫২

॥ নিত্যসিদ্ধ—"হোমাপাখী" ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার বিজয়কৃষ্ণকে বলছেন, 'দেখ, আর এক রকমের ভক্ত আছে, যাদের বলে নিত্য-সিদ্ধ। জন্ম থেকেই তারা ঈশ্বর চায়, সংসারের কোন ভোগ তারা নেয় না। শাস্ত্রে (যোগবাশিষ্ঠে) হোমাপাখীর কথা আছে, তারা খুব সুদূর আকাশে বাস করে, আবার সেখানেই ডিম পাড়ে। ডিমটা অনেকদিন ধরেই পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে ডিম ফুটে ছানা বেরয়। ছানাও আবার বাড়তে থাকে। দেখতে দেখতে ছানার চোখ ফোটে। ক্রমে যখন পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়, তখন তার সংসারের জ্ঞান হয়। বুঝতে পারে পৃথিবীতে পড়লেই মৃত্যু। তখন একটা চিৎকার দিয়ে আকাশে তার মায়ের দিকে ছুটে চলে। ছানাটা সংসার দেখেই ভয় পায়, তখুনি মায়ের দিকে চোঁচাঁ দৌড়। মা থাকে তার সুদূর আকাশে, ছানাটা সোজা সেই দিকেই দৌড়য়, অন্য দিকে একবার ফিরেও তাকায় না। এরাই অবতারের পার্ষদ্ হয়ে জন্মায়—তাদের এই শেষ জন্ম। জনকের যোগ ভোগ দুই-ই ছিল—তাই তিনি রাজর্ষি। নারদ দেবর্ষি, মাঝে মাঝে তার রজোগুণও দেখা যায়, আর শুকদেব শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্রহ্মর্ষি।' ৮।১০।৫২

॥ সন্ন্যাসের শেষ ॥

একজন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'সন্ন্যাসীদের মধ্যে যারা বেদান্তের আদর্শ নিয়েছে, তাদের সকলেরই কি নির্বাণ হবে?' মা বল্লেন 'কেন হবে না বাবা! ধীরে ধীরে তারা সর্বাসক্তি ত্যাগ কোরে ভগবানে ডুবে যাবে। বাসনা থেকে এই দেহ। বাসনার লেশ না থাকলে এ দেহ থাকে না। বাসনার শেষ হলে সব শেষ হলো। ছেলেরা এখানে আসে খায়দায়, তাতে আমি আসক্ত হব কেন? একদিন হাজরা ঠাকুরকে বল্লে, "তুমি কেবল নরেন, রাখাল, বাবুরাম কর কেন? তারা নিজেরা বেশ খাচ্ছে-দাচ্ছে, বেড়াচ্ছে বেশ আছে। তোমার উচিত ভগবানে মননিবেশ করা, ওদের প্রতি তুমি অত আসক্ত হবে কেন?" শুনে বল্লেন,—"তবে এই দ্যাখ্!"—একেবারে সমাধিস্থ! চুল দাড়ি সব কদম ফুলের মত সোজা হয়ে উঠলো!—সমস্ত শরীর কাষ্ঠবৎ নিশ্চল! ঠাকুর কিরূপ লোক ছিলেন একবার দেখ! তখন রামলাল ডেকেডেকে বলতে লাগলো, "ও খুড়ো! তুমি নেমে এস, নেমে এস।" তারপর অনেক কষ্টে মন নীচেয় নামলো। লোকে কি বোঝে যে লোকের প্রতি দয়া কোরে তিনি মনটা নীচেয় নামিয়ে রাখতেন?' ৯।১০।৫২

॥ খাদ্যাখাদ্য ॥

ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণকে বলছেন, 'আমার খাবার জন্য, একজন এক বোতল মদ এনেছিল। আমি দেখেই বেহুঁশ, তার খাব কি? চরণামৃত দেখলে আমার পাঁচ বোতল মদের নেশা হয়। মহাকারণ! আনন্দরূপামৃতম্! এরূপ অবস্থা হলে খাদ্যাখাদ্য বিচার না কোরে চলে না।' নরেন্দ্রনাথ বল্লেন, 'খাদ্যাখাদ্যের আবার বিচার কি? যা জোটে তাই মানুষ খাবে।' ঠাকুর বল্লেন, 'তুই যা বলছিস্ একটা অবস্থায় ঠিক্—জ্ঞানীর অবস্থা—তাদের কোন দোষ হয় না। গীতায় আছে জ্ঞানী আহার করে না, সব তাঁতে সমর্পণ করে। কিন্তু ভক্তের বেলায় ওসব কথা খাটে না। আমার এখন এমন অবস্থা ব্রাহ্মণের রাঁধা অন্ন, ভগবানে নিবেদিত না হলে খেতে পারি না। এমন একটা অবস্থা গেছে, গঙ্গার ওপার থেকে ভেসে আসা মড়ার গন্ধ ভাল লাগত, কিন্তু এখন

যার তার ছোঁয়াও খেতে পারি না। আবার কখনকখন এধারওধারও হয়ে যায়। কেশবের বাড়ী একবার যাত্রা দেখতে গেলুম, একজন লুচি-তরকারি এনে দিলে, তা সে জাতে ধোপা কি নাপিত তা জানিনে।' ১০।১০।৫২

॥ অজ্ঞেয়বাদ ॥

স্বামিজীর একটা মস্ত অভিজ্ঞান—অজ্ঞেয়নীতিবাদী কেবল জড় জগৎই দেখে, তাই থেকে তার সব আইন রচনা। নাকটা কেটে সে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম শরীরের পরিচয় পেতে চায়। এক একটা নক্ষত্র গতির বেগে আকাশে ছাই হয়ে মিশিয়ে যাচ্ছে—এই পঞ্চেন্দ্রিয় জগৎটাই একটা জলাধারে এক বিন্দু জল। ঐ জলকণাটাকে সমুদ্রের মত দেখে অজ্ঞেয়বাদী ভয় পায়। সবটা দেখার কল্পনাও সে করতে পারে না। স্বচ্ছ নীলাকাশে এক টুকরো মেঘের মত, অপ্রতিহত-চৈতন্যাকাশে জগৎরূপ এক টুকরো বাধা, 'আতত' অব্যাহত দৃষ্টিকে বাধিত করে। শ্রীভগবানই এই জগতের পিতা-মাতা। তাঁরই সন্ধান করতে হবে। কুম্ভ অনিত্য, আমরা কুম্ভকারকেই চাই। অজ্ঞেয়বাদী জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বলছেন, "অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে?" কিন্তু জগতে তো চারিপাশে দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যাধি ছড়ান। ছেলেটা জন্ম গ্রহণ করে ঠোঁটে কান্না নিয়ে। হৃদয়ের বেদনা ওষ্ঠাধরের হাসি দিয়ে চাপা যায় না। ধর্ম পুঁথি-পাতার জিনিষ নয়, ভেতরের। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ধর্মের গর্ভগৃহ। ১১।১০।৫২

॥ ভক্তিতে সব কৃষ্ণময় ॥

শ্রীশ্রীপ্রভু একদিন বল্লেন, 'ভক্তদেরও কিন্তু বেদান্তের এক জ্ঞান হতে পারে। সে যদি চায় তো ভগবান তাকে দেখান যে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। ভক্ত জগৎকে স্বপ্ন বলে নেয় না; সে বলে ঈশ্বরই জীব, জগৎ হয়েছেন। মোমের বাগানে যা কিছু দেখবে সব মোম দিয়ে তৈরী—ফল, ফুল, পাতা, আতা, লতা। ঈশ্বরে ভক্তি পরিপক্ক হলে ভক্তের ঐরূপ দর্শন হয়। পিত্তি বেশী হলে লোকের ন্যাবা হয়, তখন সে সব হলদে দেখে।

নিরন্তর কৃষ্ণ চিন্তা কোরে কোরে রাধা সব কৃষ্ণময় দেখতে লাগলেন, শেষে এমন হলো যে নিজেকেই তাঁর কৃষ্ণ বলে বোধ হতে লাগলো। এক টুকরো সীসে পারার হ্রদে ফেলে দিলে, কিছু দিন বাদে সে নিজেই পারা হয়ে যায়। তেলাপোকা কাঁচপোকার চিন্তা করতেকরতে কাঁচপোকাই হয়ে যায়। তেলাপোকা কাঁচপোকার ভয়ে নড়তে পারে না, অসাড় হয়ে পড়ে থাকে, শেষে ঐ কুমরে-পোকার রঙ ধরে। তেমনি ঈশ্বর চিন্তা করতেকরতে ভক্তের অহংকার নষ্ট হয়, তখন সে বুঝতে পারে, ভগবানই জীব হয়ে রয়েছেন—তখনই মুক্তি হলো। যতক্ষণ অহং ততক্ষণ ঈশ্বরে একটা সম্বন্ধ নিয়ে থাকতে হয়। ১২।১০।৫২

।। জ্ঞানী ও ভক্তের রাস্তা ।।

প্রভু একদিন গিরীশ ঘোষকে বল্লেন, 'দেখ, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এ তিন অবস্থার পারে তুরীয়। এ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের পারে। ঐ তিন অবস্থায় যে চেতনা, তা বুদ্ধি-প্রতিবিম্ব, কেবল তুরীয়ভাবে বিশ্বের অনুভূতি হয়। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সব মিথ্যা। দেহ-সংসর্গ থাকলেই দ্বৈত-প্রপঞ্চ সত্য বলে বোধ হয়। এই সংসর্গ নাশেই জীব তার স্বরূপ বুঝতে পারে—"অহং ব্রহ্মাস্মি"।

'জ্ঞান ও ভক্তি দু দিক্ দিয়েই সেখানে যাওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরও কেউকেউ লোক-শিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকেন, যেমন অবতারেরা, ঈশ্বরকোটিরা। দেহভিমান যেতে চায় না, নির্বিকল্প সমাধি হলে তবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি যায়। অবতার ঐ নির্বিকল্প থেকে নেমে এসে "বিদ্যার আমি", "ভক্তির আমি" নিয়ে থাকেন। যেমন শঙ্করাচার্য "বিদ্যার আমি" নিয়ে ছিলেন। "ভক্তির আমি" নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাভাব আস্বাদ ও ভক্ত-সঙ্গ করতেন—তখন ঈশ্বরীয় কথা ভজনাদি হোত। ভক্তেরা অবস্থাত্রয় বা গুণত্রয় মায়া বলে উড়িয়ে দেয় না। তারা দেখে ঈশ্বরই জীব প্রভৃতি চব্বিশ তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। ঈশ্বর তাদের নিকট মূর্তিমান হয়ে দেখা দেন। তারা "বিদ্যার আমি" নিয়ে সৎসঙ্গ করে, তীর্থে যায়, আত্মানাত্মার বিচার করে, ভক্তি ও বৈরাগ্য আশ্রয় করে। তারা অহংকারকে বলে, "যদি না-ই যাবি, তবে থাক শালা দাস হয়ে"।' ১৩।১০।৫২

॥ ঈশ্বরেচ্ছা ও জীবেচ্ছা ঃ ঃ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ধর্ম ॥

ঈশ্বর দর্শনই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ঠাকুর দান করতে নিষেধ করেন নি, কিন্তু তিনি বলতেন, দানেতেই ধর্মের শেষ নয়। টাকা থাকলে লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা করবে বই কি! জ্ঞানীরা বলেন কি জান?—"আমরা কি কোরতে পারি? সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বরই পালনকর্তা, আমরা কিছু নয়।" যাঁরা মহদাত্মা, জীবের দুঃখ দেখে তাদের ঈশ্বরীয় পথ ধরতে বলেন। শংকরাচার্য্য লোকশিক্ষার জন্য "বিদ্যার আমি" রেখেছিলেন। খেতে-পরতে দেওয়ার চাইতে জ্ঞানভক্তি দান অনেক শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য চৈতন্যদেব ভক্তি বিতরণ করলেন, তা অতি নীচ, জাতিচ্যুত যারা, তাদেরও দিলেন। সুখ-দুঃখ দেহের অবশ্যম্ভাবী ধর্ম। তুমি আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও সাধ মিটিয়ে। জীবনে সব চাইতে প্রয়োজন জ্ঞান-ভক্তি। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। তিনিই সব করেন। যদি বল, "তবে মানুষ পাপ করে কেন?"—মানুষ নিজের অজ্ঞান-অহংকারে পাপ করে, সে যদি জানত, তিনিই সব করান, তা হলে সে কি পাপ করতে পারত? তিনিই 'পাপ' 'অসৎ' এ বোধ দিয়েছেন বলে মানুষ পাপ করতে পারে না, নইলে মানুষ যা তা করত।' ১৪।১০।৫২

॥ সৃষ্টি-রহস্য ॥

মাষ্টার একদিন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে তাঁর পূর্বজন্ম বা বংশানুক্রমিক সংক্রমণ সম্বন্ধে খুব বিশ্বাস নেই; এতে তাঁর ভক্তি বা সাধন ভজনে খুব ক্ষতি হবে কি! প্রভু উত্তর দিলেন, 'তবে এইটুকু বিশ্বাস রাখা দরকার যে জগতে যা কিছু ঘটছে, তা ঘটান ঈশ্বরের কাছে কিছু অসম্ভব নয়। জগতের সব কার্যের কারণ আমরা খুঁজে পাই না। কিন্তু ঈশ্বরে সব অসম্ভবও সম্ভব। আর এও কখন মনে কোরো না যে তুমি যা বুঝেছ সেইটুকুই সব সত্যি, আর অপরের যা কিছু বোঝা-বুঝি সেগুলো মিথ্যে। তাঁকে ধরে থাকলে তিনি আস্তে আস্তে সব বুঝিয়ে দেন। ভগবানের কার্যকলাপ মানুষ কতটুকুই বা আর বুঝতে পারে? ভগবানের সৃষ্টির অনন্ত দিক। আমি তাঁর কার্যকলাপ একটুও বোঝবার চেষ্টা করি না। আমি শুনেছি যে ভগবানের

সৃষ্টিতে সবই সম্ভব,—এ কথা আমি সব সময়ই মনে রাখি। সেই জন্য সৃষ্টি-রহস্য বোঝবার চেষ্টা না কোরে আমি তাঁর ধ্যান করি। হনুমান বলেছিল, "আমি তিথি নক্ষত্র জানি না, আমি জানি একমাত্র শ্রীরামের শ্রীপাদপদ্ম"।' ১৫।১০।৫২

॥ বহুতে এক ॥

স্বামিজী বলেন, এ কথা আমরা বলি না যে তোমার মত ভুল, পরন্তু আমরা তোমার মতের অভিনন্দন করছি। এর মানে এ নয় যে আমার মতটাকে ভুল বলতে হবে। আমারটাও আর একদিক থেকে কার্যকরী। এস আমরা স্ব-স্ব আদর্শ নিয়ে কাজ করি। আমরা এমন বৈজ্ঞানিকও দেখেছি, যাঁরা ধার্মিকও বটে; এ আমাদের একটা মস্ত আশা যে সমস্ত মনুষ্য-সমাজ এইরূপ ভাব-সমন্বয়ে কৃতকার্য হয়ে উঠবে। জল যখন আগুনে বসান হয়, তখন একটার পর একটা কোরে বুদ্‌বুদ্ ওঠে, তারপর এক সঙ্গে অনেকানেক উঠতে থাকে এবং সমস্ত জল এবং জলাধার আলোড়িত হতে থাকে। ঠিক মনুষ্য-সমাজও তেমনি। প্রত্যেক বুদ্‌বুদ্‌টা যেন এক একটা ব্যক্তি, আর অসংখ্য বুদ্‌বুদের যে চাঞ্চল্য তা যেন সমাজের প্রগতি-পথে সংঘর্ষ। ধীরে ধীরে এই সব সমাজ সংযুক্ত হচ্ছে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, কালে সব ভেদ বিসম্বাদ মিটে গিয়ে, যে ঐক্যের দিকে আমরা চলেছি, সেইটাই অভিব্যক্ত হবে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের কার্য-তৎপরতার কোন অসামঞ্জস্য থাকবে না। জগতে একত্বের মধ্যে বহুত্বের সামঞ্জস্য বিরাজ করবে। ঈর্ষার সহিত প্রেম, হিংসার সহিত সাহায্য—এ সব রাস্তার মাঝের কথা, শেষ নয়। ১৬।১০।৫২

॥ স্থূল-সূক্ষ্মশরীর ঃ ঃ আত্মচৈতন্য ॥

বাহ্যদেহে অনুভূতির মাত্র কয়েকটা যন্ত্রপাতি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সেটা মনঃ-বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ নয়। হিন্দুরা অন্তঃকরণকে সূক্ষ্মশরীর বলে এবং খৃষ্টান দার্শনিকেরা একে "স্পিরিচুয়াল্ বডি" বলে। সূক্ষ্মশরীর যতই সূক্ষ্ম হোক,

কিন্তু আত্মা নয়। বাহ্য দেহের হ্রাস-বৃদ্ধি আমরা রোজই দেখছি এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ওটাকে একেবারে নষ্ট হতেও দেখছি। কিন্তু সূক্ষ্মশরীরটা অতশীঘ্র নষ্ট হয় না, তবে এর দুর্বলতা ও সবলতা বেশ লক্ষ করা যায়। একটা বৃদ্ধের ও যুবকের মনের অবস্থা আলোচনা করলেই বেশ বোঝা যায়। স্থূল দেহেরও যেমন উন্নতি এবং অবনতি আছে, সূক্ষ্ম দেহেরও যখন ঐরূপ; তখন তাকে আর চৈতন্য-স্বরূপ বা শুদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা কি কোরে বলা চলে! চৈতন্যের তো আর দেহের মত উৎপত্তি, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু নেই? কিন্তু আত্মার সদা-নিত্যত্ব কি কোরে বোঝা যায়! কি কোরে বুঝবে মনেরও পেছনে একটা চিৎসত্তা আছে? কারণ স্বয়ংপ্রভ জ্ঞান যা বুদ্ধির প্রেরক, তা কখন কোন জড়, অন্ধ পদার্থের ধর্ম হতে পারে না। ১৭।১০।৫২

।। নরেন্দ্রের মা-কালীর কাছে প্রার্থনা ।।

নরেনের বড় দুঃখ কষ্টে দিন কাটছে; পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেরা প্রায় উপসী। নরেন্দ্রনাথ সবশেষে ভাবলেন, 'একবার শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরলে হয় না, তাঁর কথা তো ভগবান শোনেন। তিনি যদি একবার আমার এই দারিদ্র্য প্রতীকারের জন্য প্রার্থনা করেন তো সে প্রার্থনা মঞ্জুর হবেই।' কথাটা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রস্তাব করলেন। ঠাকুর যেন একটু চিন্তিত হয়ে বল্লেন, 'আমি বাপু! তাঁর কাছে এমন কথা বলতে পারবনি, তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে বল না কেন? তোমার এই দুঃখের হেতু, তুমি তাঁকে মান না।' নরেন্দ্র বল্লেন, 'আমি তো আপনার মার সঙ্গে পরিচিত নই, আপনিই আমার হয়ে তাঁকে বলুন।' ঠাকুর বল্লেন, 'আমি তো তোমাকে তাঁর সঙ্গে অনেক পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি তাঁকে কেবলই অস্বীকার কর, সেই জন্য আমি প্রার্থনা করলেও তিনি শুনতে চান না। আচ্ছা আজ মঙ্গলবার রাত্রে মন্দিরে গিয়ে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কোরে, তুই যে বর প্রার্থনা করবি, সেই বরই পাবি।' কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নিজের ঐহিক সুখ প্রার্থনা করতে পারলেন না, বল্লেন, 'মা! আমায় বিবেক-বৈরাগ্য দাও।' ১৮।১০।৫২

॥ নরেন্দ্রের মার কাছে প্রার্থনা ॥

ঠাকুর বল্লেন, 'আমার মা অদ্বিতীয়া-সম্বিৎ! ব্রহ্মের অনির্বাচ্যা-শক্তি! তাঁর ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়! তিনি অনন্ত-শক্তিময়ী!' নরেন্দ্রকে রাত নটার সময় মার মন্দিরে ঠাকুর প্রথমবার পাঠালেন। তিনি বলেন, 'তখন আমার সর্বশরীর এক অপূর্ব নেশায় ভরপুর হয়ে উঠ্‌লো, তখন আমার পা টলছে। আনন্দে বুকের ভেতর ধপাস্ ধপাস্ করছে, উঃ! মাকে সত্য দেখতে পাব! তাঁর কথা শুনতে পাব! মন্দিরে ঢুকে মার দিকে তাকাতেই দেখি প্রতিমা জীবন্ত! চেতন—যেন প্রেম ও সৌন্দর্য্যের চিরন্তন উৎস! প্রেম ভক্তিতে আমার সর্বশরীর আলোড়িত হয়ে উঠলো, আমি সাষ্টাঙ্গে তাঁর সামনে পড়ে গেলুম, বল্লুম, 'মা! আমায় বিবেক-বৈরাগ্য দাও, মা! আমাকে জ্ঞান-ভক্তির অধিকারী কর। মা! তুমি সর্বদা আমার নয়নেনয়নে থাক। দেখি হৃদয়ে এক চিরশান্তি! সংসার সব ভুল হয়ে গেছে, হৃদয় তখন একমাত্র মা-ই অধিকার কোরে বসে আছেন! ঠাকুরের কাছে ফিরে যেতেই বল্লেন, "কিরে, কিছু পেলি?" তখন আমার খেয়াল হলো, যে জন্যে যাওয়া সব ভুলে গেছি। জিগেস করলুম, 'মশায়! এখন উপায়!' বল্‌লেন 'যা, আবার যা, গিয়ে তোর অভাবের কথা জানা।' ১৯।১০।৫২

॥ নরেন্দ্রের মার কাছে প্রার্থনা ॥

নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার মার কাছে তাঁর অভাব প্রতিকারের প্রার্থনা জানাবার জন্য গেলেন। কিন্তু আবার সেই ভুল, চাইলেন ভাব-ভক্তি। ঠাকুরের কাছে ফিরে গিয়ে সব নিবেদন করলেন। ঠাকুর বল্‌লেন, 'এমন বোকা! এই গোটা কতক কথা একটু মন স্থির কোরে বলতে পারলি নে। যা আবার যা। শীগ্‌গির্ যা!' নরেন্দ্রনাথ তৃতীয়বার জগদম্বার কাছে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এবার এলো বিষম লজ্জা—'ছিঃ ছিঃ! এই সামান্য জিনিষের জন্য আমি মা জগদীশ্বরীর কাছে এসেছি! রাজরাজেশ্বরীর কাছে চাইছি কলাই-মসুর। ছিঃ ছিঃ! কি নির্বোধ আমি!' লজ্জায় সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম কোরে বল্‌লেন, 'মা! আমি জ্ঞান-ভক্তি ছাড়া, আর কিছুই তোমার কাছে চাই না।' বুঝলেন সব ঐ ব্রাহ্মণের খেলা। এসে বললেন, 'মশায়! বুঝেছি এ সব আপনার

চাতুরী, আপনি আমাকে সব ভুলিয়ে দিলেন। এখন আপনি নিজেই ঐ বর দান করুন।' বললেন, 'তা বাপু, আমার মুখ দিয়ে অমন কথা বেরুবেক নি।' অনেক ধরাধরির পর বল্লেন, 'আচ্ছা! তোদের বাড়ীর লোকদের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব হবে না।' ২০।১০।৫২

॥ তাঁকে গ্রহণ মানে ভারতের জয় ॥

একদিন ডেট্রয়েটে কয়েকজন শিষ্যকে বিবেকানন্দ বোঝাচ্ছিলেন—খৃষ্টান জগতে হিন্দুর আধ্যাত্মিক-আদর্শ বোঝান কী কষ্টকর ব্যাপার! তাঁর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট-শক্তি ভারতের আদর্শের প্রতি পাশ্চাত্যের সম্ভ্রম আনবার জন্য ব্যয়িত হয়েছে। এ সময় তাঁর শরীর ঠক্‌ঠক্ কোরে কাঁপছিল। বল্লেন, 'ভারত আমার কথা শুনতে বাধ্য; ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিশুদ্ধ আমি নাড়া দেব, তার প্রত্যেক ধমনীর মধ্য দিয়ে আমি একটা তীব্র বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরণ করব। কিছু কাল অপেক্ষা কোরে দেখ, ভারত কি ভাবে আমায় গ্রহণ করে। ভারত, আমার নিজের ভারতই কেবল জানে কি কোরে ঠিক্ ঠিক্ ভাবে আমার এই কার্যকলাপ বুঝতে হবে—যা আমি এত উদারতার সহিত স্বাধীনভাবে আমার জীবনের রক্তের সহিত মিশিয়ে বিতরণ করেছি—বেদান্তের সার তত্ত্ব! ভারত আমাকে গ্রহণ করবে তার জয় স্বরূপে।' এ কথার দ্বারা তিনি তাঁর নিজের যশঃ কীর্তন করেন নি, যশঃ কীর্তন করেছেন ভারতের বাণীর, যা ভবিষ্যৎ জগতের হবে বেদ। ২১।১০।৫২

॥ আদান-প্রদান ॥

স্বামী ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন। তাঁর দেশভক্তি ও ভারতের প্রাচীনদের প্রতি সম্ভ্রম সত্ত্বেও তিনি একটি বিষয় চিন্তা না কোরে থাকতে পারেন নি যে ভারতকে বিদেশীদের কাছে অনেক বিষয় শিখতে হবে। মনু বলছেন, "বিদ্যা দুষ্কুল হতেও গ্রহণ কোরবে।" কিন্তু কেবল ভারতকেই যে শিখতে হবে এমন সিদ্ধান্ত ভুল, ভারতকেও বিদেশীদের যথেষ্ট শেখাতে হবে। পৃথিবীকে ত্যাগ কোরে কেবল ভারত নিয়ে থাকা আর চলবে না। এই নিবু'দ্ধিতার

জন্য ভারতবর্ষকে হাজার-বছর দাসত্ব কোরে ঐ ভুলরূপ দেনাটী পরিশোধ করতে হচ্ছে। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অপর দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত কখনও তুলনা কোরে দেখা হয় নি, এই গলতিটীই হলো ভারতীয় মনের নিম্নগতির কারণ। ভারত-ভারতীকে চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে সকল দেশের, সকল সত্য, শক্তি, আবিষ্কার সঞ্চয় কোরে আনতে হবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে, বিস্তারই জীবন, সংকোচই মৃত্যু।' ২২।১০।৫২

।। বিবেকানন্দ-স্মৃতি ।।

আমেরিকার এক মহিলা কবি মিসেস্ ইল্লা হুইলার্ উইল্‌কক্স একটী পত্রে তাঁর স্মৃতি অংকিত করেছেন। একদিন তাঁরা শুনলেন, (১৮৮৫) বিবেকানন্দ নামে একজন হিন্দু, দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি ও আর একজন ভাবলেন, যাই দেখে আসি একবার কি ব্যাপার। যে দশ মিনিট সেখানে তাঁরা ছিলেন, তাঁদের মনে হতে লাগলো যেন তাঁরা সাধারণের ভূমি থেকে অনেক উর্ধ্বে নির্মল আকাশে-বাতাসে বিচরণ করছেন। কি অদ্ভুত! প্রাণ যেন চন্‌বন্ করছে। তাঁরা রুদ্ধশ্বাসে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রইলেন বক্তৃতার শেষ পর্যন্ত। যখন তাঁরা ফিরলেন, তখন বেশ অনুভব করতে লাগলেন যে সাংসারিক দুর্ঘটনার সহিত যুদ্ধ করবার উপযোগী কত নূতন সাহস, আশা, বল ও বিশ্বাস তাঁরা নিয়ে ফিরেছেন। তাঁদের অপর জন বলে উঠলেন, 'এতদিন যে ধর্মের অনুসন্ধান করছিলুম, যে দর্শন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা আমার মধ্যে অনভিব্যক্ত ছিল, আজ তার স্পর্শ পেলুম।' পরে কয়েক মাস ধরে এই অদ্ভুত মানস-কল্পতরু হতে কত সত্য, সেবা ও সামর্থ্যের রত্ন তাঁরা কুড়ুলেন। এই বৎসরের বিখ্যাত অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতা, তাঁদের মধ্যে অপর ভদ্রলোকটী হাসিমুখেই সহ্য করলেন এবং উইল্‌কক্সও তাঁর কর্তব্যে ও আমোদ প্রমোদে এক উচ্চ-ভূমির প্রেরণা এবং উদার আয়ত-দৃষ্টি সর্বদা অনুভব করতেন। ২৩।১০।৫২

।। বিবেকানন্দ-স্মৃতি ।।

শ্রীমতী ইল্লা হুইলার আরও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ভারতীয় দর্শনের মহত্ত্ব তাঁদের দেশেও হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তাঁদের সংকীর্ণ সম্প্রদায়কে ধর্মের

বিশাল জ্ঞানের দ্বারা সুপ্রশস্ত করে তুলতে হবে ; সঙ্গেসঙ্গে থাকবে আধুনিক প্রগতি-স্পৃহা, যাকে প্রযুক্ত করতে হবে পাশ্চাত্যের বাস্তব জীবনে, বেশ ধৈর্য এবং প্রেমের সহিত। বিবেকানন্দ প্রতীচ্যের সম্মুখে একটী বাণী বহন কোরে এনেছেন, তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমি তোমাদের কোন বিশিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য আসি নি। আমি এসেছি তোমাদের স্বস্ব ধর্মে রক্ষা করবার জন্য। আমি মেথডিষ্ট্‌কে আরও ভাল মেথডিষ্ট্‌ করতে চাই, প্রেস্‌বাইটেরিয়ান্‌কে আরও ভাল প্রেস্‌বাইটেরিয়ান্‌ করতে চাই, ইউনেটেরিয়ান্‌কে আরও ভাল ইউনেটেরিয়ান্‌ করতে চাই। আমি শেখাতে চাই তোমাদের কিরূপে সত্যে বাস করতে হয়, আত্মজ্যোতিঃ কিরূপে হৃদয়ে প্রজ্বালিত করতে হয়।' তাঁর বাণী একটা ব্যবসায়ীরও বলাধান করে, ঠুন্‌কো আমোদ প্রিয় মেয়েদেরও একটু স্থির হয়ে বসে চিন্তা করতে শিখিয়েছে, শিল্পীর হৃদয়ে একটা নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছে ; পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও একটা নূতন পবিত্র ধারণা তিনি সৃষ্টি করেছেন। ২৪।১০।৫২

॥ বংশানুক্রমিক সংক্রমণ ॥

স্বামিজীর মতে, মতবাদ দিয়ে কোন নীচ জাতিকে দাবিয়ে রাখবার অধিকার কারও নেই। একটী নিগ্রো বালক দেশ থেকে শত্রুভয়ে পালিয়ে এসে চিকাগোয় ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিলো। আফ্রিকার মধ্যস্থল নিবাসী এই বালক এত জ্ঞানের কথা কোন্‌ বংশসূত্র থেকে পেলো ? প্রত্যেক জীব তার অনন্ত জীবনের সংস্কার বশে চলেছে, বাপ মা পাড়াপর্শী তাতে কিছুকিছু সাহায্য করছে ; কিন্তু তার অন্তর নিহিত সংস্কার শক্তিই তার বিশিষ্ট কার্যকলাপরূপে স্ফুরিত হচ্ছে। শিক্ষাদ্বারা এই অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে ধীরেধীরে প্রকাশ করা যায়। বংশের ধারায় যদি ব্রাহ্মণের ছেলেরা জ্ঞানের প্রতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, তা হলে একটা প্যারিয়ার ছেলেকে আরও শিক্ষা দান দরকার, যার দ্বারা তার ভেতর আরও শুভসংস্কার জাগে। বেদান্ত বলছেন, সকল প্রাণের অভিব্যক্তির ভিত্তি অনন্ত সত্যজ্ঞানানন্দ। অতএব সকলেরই কর্তব্য এবং স্বত্ব (right) তার অন্তস্থ অনাদি, অখণ্ড, শুভ-সত্তাকে প্রকাশ করা। ২৫।১০।৫২

॥ দর্শন ও নীতির মুল ভিত্তি ॥

দর্শন ও নীতির মুল ভিত্তিটী আবিষ্কার করবার জন্য, স্বামিজী বলছেন, আজ পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাশীলেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। একজনের কার্যকলাপের অনুকরণ দ্বারা কোন নীতির প্রমাণ সিদ্ধ হয় না, তা তিনি যত বড় লোকই হোন। একজনের কতকগুলো অদ্ভুত দৈহিক ও মানসিক আচরণ দেখে মনুষ্য সমাজের চরিত্র-নীতির কোন আইন তৈরী হতে পারে না। দেখতে হবে তার পশ্চাতে কোন অনাদি সত্য আছে কি না। তুমি কামকাঞ্চন ত্যাগ করেছ, তাতে সমাজের কি এসে যায় ;—যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারছি, এই ত্যাগের ভেতর দিয়েই সেই চিরশান্তি মানব মনে আবির্ভূত হয়। এ সত্য তোমাতে আমাতে সকল আত্মাতে বর্তমান, অনাদিরূপে। অর্থাৎ আমাদের আত্মা এক বিশুদ্ধ-সত্য-জ্ঞানানন্দ,—কাম, কাঞ্চন, ভেদ, স্বার্থ, ঈর্ষা, হিংসা,—সেই সহজ-সত্যকে উপলব্ধি করবার অন্তরায়—চিরশান্তির পরিপন্থী। এই সত্যটী বুঝতে পারলে তখন নীতিগত চরিত্রগত কার্যকলাপের সিদ্ধান্ত হতে পারে, অর্থাৎ কোনটী ত্যজ্য আর কোনটী গ্রাহ্য বোঝা যায়। ২৬।১০।৫২

॥ মুক্তপুরুষ ও অবতার ॥

একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সাধারণ মুক্তাত্মা ও অবতারে ভেদ কোথায়? তিনি কথাটার বরাবর উত্তর না দিয়ে বলতে লাগলেন, 'মুক্তিই হচ্ছে শেষ কথা। আমার পরিব্রাজক সাধক-অবস্থায় কত নির্জন গুহায় ধ্যান কোরেকোরে কাটাতুম, অনেক সময় অনাহারে মরতে ইচ্ছা হোত, মুক্তি লাভ হলো না বলে। কিন্তু এখন আমার আর ও আকাঙ্ক্ষা নেই, যতক্ষণ জগতে বদ্ধাবস্থায় একজনও থাকবে।' ঠিক শ্রীবুদ্ধের বাণীও এইরূপ। কিন্তু এইটে সর্বদা মনে রাখতে হবে, এই দুই মহাপুরুষের এইরূপ সিদ্ধান্ত, তাঁদের মুক্তি যখন করামলকবৎ হয়ে গেছে। তারপর তাঁরা জীব দুঃখে কাতর হয়ে মুক্তিকে অগ্রাহ্য করেছেন। এইখানেই সাধারণ মুক্তজীব ও অবতারে ভেদ। অবতার বা ঈশ্বরকোটীরা মুক্তি পেয়েও তুলে রাখেন, জীবের অদৃষ্ট গ্রহণ কোরে তার ক্ষয় করেন তপস্যার দ্বারা, জীবকে মঙ্গলের পথ দেখান, শতশত অত্যাচারের

মধ্য দিয়ে। নির্বোধ সমাজ ও ব্যক্তিরা তাঁর শিবকরী দূরদৃষ্টি একটুও বুঝতে না পেরে তাঁকে নির্যাতিত করে। ২৭।১০।৫২

॥ রাধাকৃষ্ণ দর্শন ॥

প্রভুর শ্রীমতীর দর্শনের ইচ্ছা হলো ; শ্রীমতীর দর্শন ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সিদ্ধ হয় না। অমনি চিত্তধারার সকল তোড় ছুটল শ্রীরাধার পানে, আর কোন চিন্তা নেই, এক চিন্তা 'শ্রীরাধা'—'রাধা মোর মূলাধার'। দেখলেন, অখিল মাধুর্য ও সৌন্দর্যেশ্বরী শ্রীরাধা—কনকবরণী রাই। ঠাকুর তাঁর সঙ্গে আর নিজেকে পৃথক কোরে রাখতে পারলেন না—শ্রীমতী তাঁর অঙ্গে প্রবিষ্ট হলেন অমনি মনের গতিক পরিবর্তিত হলো—শ্রীমতীর বিশুদ্ধ মন ছুটলো কৃষ্ণমুখী হয়ে—শ্রীরামকৃষ্ণঅঙ্গে শ্রীমতীর মহাভাব প্রকটীত হলো। দেখে ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ অবাক! এ যে সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য!—জীবে একি সম্ভব! উনিশটী প্রধান ভাব, যার এক একটীর প্রকটে সাধকের এক একটী যুগ অতিবাহিত হয়—তাই সমভাবে এবং সম্পূর্ণতার সহিত তাঁতে প্রকাশ। সঙ্গেসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও শরীরে প্রবেশ এবং সব কৃষ্ণময় দর্শন। এ ভাবে প্রভু দু তিন মাস বেহুঁশ হয়ে রইলেন—কোথা দিয়ে দিন গেল রাত গেল ঠিক নেই! ২৮।১০।৫২

॥ দিব্য-ভাব ॥

নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন বাইস্, (রবিবার ২৮।৯।৮৪), ঠাকুরের সামনে বসে, হঠাৎ তাঁর বিশেষ নজর পড়লো নরেন্দ্রের ওপর। তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং সমাধিস্থ হলেন—এক পা নরেন্দ্রের উরুতে। গভীর সমাহিত অবস্থা, চক্ষু নিস্পন্দ, মনে বাহ্য-জগৎ আর ভাসছে না। ক্রমে চেতনার আপেক্ষিক জগতে নেমে এলেন—তখনও চোখেমুখে দিব্য-জ্যোতির ছটা ঝিক্‌মিক্ কোরে উঠছে—মহানন্দের মাদকতা তখনও সম্পূর্ণ শরীর ত্যাগ করে নি। তিনি নিজেই নিজেকে সম্বোধন কোরে বলছেন,—"হে সচ্চিদানন্দ! হে সচ্চিদানন্দ! হে সচ্চিদানন্দ! আজ তোমায় এই নামে ডাকবো কি? না, না, আজ যে মহাষ্টমী, আজ মায়ের দিন, মা যে প্রেমসুরা দিয়ে জীবকে মাতোয়ারা করেন।"

আবার নিজেকে সম্বোধন কোরে বলতে লাগলেন, "ও মা সচ্চিদানন্দময়ি! জগদানন্দকরি!—সা রে গা মা পা ধা নি। নি-তে সুর রাখা ঠিক নয়, কারণ ওখানে বেশী থাকতে পারা যায় না, আমি আর একটু নেমে থাকব। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ—বাস্ সব চুপ! আর কথা বলা চলে না।" ২৯।১০।৫২

।। ঈশ্বরকোটী ।।

মা বল্লেন, 'যোগেন যখন দেহ রাখছে, গিরীশ তাকে বল্লে, "দেখ্ যোগেন! নির্বাণ নিস্‌নি, ঠাকুরকে সর্বব্যাপিরূপে চিন্তা করিস নি, চন্দ্রসূর্য তাঁর চক্ষু এমনও ভাবিস নি। তিনি যেমন আমাদের সঙ্গে খেলা করতেন ঠিক্ তেমনি ভাবে ভাব্, (তা হলে স্বচ্ছন্দে যেতে পারবি)।" শিষ্য জিগেস করলে, "মা! অখণ্ডের ঘরে সিদ্ধেরা কেমন ভাবে থাকে?" মা বল্লেন, 'দেখেছি যেন দারু মূর্তি—নিস্পন্দ! রামেশ্বরে দেখেছিলুম পাথরের গায় আঁকা মূর্তি সব নিষ্পলক! ঠাকুরের যখন দরকার হয় সেখান থেকে তাদের নামিয়ে নিয়ে আসেন। নরেনকে ঈশ্বরকোটীর সপ্তর্ষিমণ্ডল হতে নামিয়ে নিয়ে এলেন—ঠাকুর যা বলেন বেদ বলে জানবে।' শিষ্য জিগেস করলে, 'মা! আমরাও কি ঐরূপ চিত্রার্পিত পুঁতুল হয়ে থাকব?' মা হেসে বল্লেন, 'তা কেন; তাঁর দু রকম ভক্ত আছে, একদল পৃথিবীতে এসে তাঁর সেবা করে, আর একদল যুগ যুগ ধরে ব্রহ্ম-ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে; আবার তিনি যখন জীব কল্যাণের জন্য ডাকেন, তারা তাঁর আহ্বানে নেমে আসে। তবে এরা সহজে নামতে চায় না।' ৩০।১০।৫২

।। মায়ার খেলা ।।

এক শিষ্যকে মা বল্লেন, "বিভিন্ন আধ্যাত্মিক-চেতনার ভূমি আছে। কিন্তু সব জায়গা থেকেই ফিরতে হয় বাবা! যতদিন না নির্বাণ হয়।" শিষ্য জিজ্ঞাসা করলে, "ঈশ্বরকোটিরা নির্বিকল্প লাভ করেও ফেরেন কি কোরে?" মা বল্লেন, "যারা নির্বাণ লাভ করেছে, তারা তো ঈশ্বরই হয়ে গেছে। তখন কি তাদের

আর আলাদা সত্তা থাকে বাবা! তখন সেই ঈশ্বরের অনির্বচনীয়া শক্তি অবলম্বনে তারা পূর্ব শুদ্ধ-চিত্তকে সংকল্পের দ্বারা জাগিয়ে তোলে, এবং তাই আশ্রয় কোরে, কৃপায় জীবাদৃষ্ট স্বীকার কোরে, তপস্যার দ্বারা জীবের মুক্তি সাধন করেন।" শিষ্য তখন জিজ্ঞাসা করলে, "মা! যে জল-বিন্দুরূপ মন ব্রহ্ম-সমুদ্রে মিশে গেছে, সে আবার পূর্বরূপে ভেসে ওঠে কি কোরে?" মা বল্লেন, "রাজহংস দুধে জলে মিশে গেলেও, জলকে দুধ থেকে পৃথক কোরে তুলতে পারে।" শিষ্য বল্লে, "তা হলে বলবো দুধ জল থেকে সূক্ষ্মরূপে পৃথক ভাবেই ছিল।" মা বল্লেন, "দূর বোকা, সে রকম নয়। ভানুমতীর খেলায় বলে, 'এই দেখ হাতী' আর শূন্যে অমনি হাতী ফুটে উঠলো। আবার বলে, 'ভানুমতীর খেলা উড়ে যা হাতী, উড়ে যা হাতী'—আর হাতী নেই—শূন্যে মিলিয়ে গেল।—এমনি মায়ার সংকল্পের খেলা জানবে।" (লেখকের ডায়রী হতে)। ৩১।১০।৫২

।। চিত্তশুদ্ধির উপায় ।।

রামানুজ বাক্যকারকে উল্লেখ কোরে ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বলছেন, ধ্রুবাস্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিচলিত প্রত্যৈকতানতাবৃত্তি বা ধ্যানের উপায়—

(১) বিবেক—জাতি, নিমিত্ত ও আশ্রয়দোষ আহারে বর্জন।

(২) বিমোক—কাম্য সর্ববিষয়ে অনাসক্তি।

(৩) অভ্যাস—শুভ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিত্তের নিয়োগ।

(৪) ক্রিয়া—দেব, ঋষি, নৃ, পিতৃ, ভূতযজ্ঞ সম্পাদন।

(৫) কল্যাণগুণ—সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা অর্থাৎ সফল চিন্তা।

(৬) অনবসাদ—দুঃখ স্মরণবশতঃ দৈন্য ও দৌর্বল্যজন্য অপ্রসন্নতা বা অবসাদ, তার অভাব।

(৭) অনুদ্ধর্ষ—অবসাদের বিপরীত অতিসন্তোষ, তার সংযম, অনুদ্ধর্ষ।

—শ্রীরামানুজাচার্য। ১।১১।৫২

॥ চলমান-ধর্ম-মহাসভা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের ছোট ঘরখানি ছিল বিশ্বের ধর্ম-বিদ্যালয়। ধর্মবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার ছিল পঞ্চবটি ও বেলতলা। সেখান হতেই শিক্ষিত হয়ে বিবেকানন্দ প্রচার করলেন ভারতের মহান্ সত্য চিকাগোর বাহ্য ধর্মসভায়। কী অপূর্ব্ব পবিত্র প্রবাহ তাঁর মুখনিঃসৃত হোত—বৌদ্ধ, জৈন, রামানন্দ, চৈতন্য, দয়ানন্দ, তুলসীদাস, নিশ্চলদাস, তুকারামাদি মহারাষ্ট্রের সিদ্ধেরা, দক্ষিণের আলোয়ার এবং নায়ানাররা তাঁর ভাষা-সীবনীতে কী অপূর্ব রূপ পেত! পরমহংস পরিব্রাজক শংকর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ থেকে ভাঙ্গি ম্যাথরের গুরু লালবেগ, মুচি চামারের গুরু রুহিদাস পর্যন্ত তাঁর মহাকাব্যের এক একটী অপূর্ব চরিত্র। সে ভারতীয় মহাকাব্যে সতী, সীতা, শকুন্তলা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তার চিরন্তনী মূর্তি আছে, পদ্মিনী বেহুলা থেকে আরম্ভ কোরে চাঁদ সুলতানা, ঝান্সীর রাণী, অহল্যা বাই পর্যন্ত কত দেবী প্রতিমাই না তাতে পূজিত। আর তাতে কত গান—গুরু নানক, মীরাবাই, হরিদাস, তান্‌সেন, সুরদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাদু, কবীর প্রভৃতি জ্ঞানী ভক্তদের। কত বিয়োগ ও মিলন—পৃথ্বিরাজ, সংযুক্তা, কত বীর ও সংগঠক প্রতাপ, আকবর, শাজাহান, শিবাজী থেকে অতি সুদূরের উমা-মহেশ্বর, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ, বুদ্ধ-গোপার কথা। যখন যে পর্বটী আরম্ভ করতেন লোক চক্ষে জীবন্ত স্পষ্টরূপে তার চরিত্রেরা সব নিজেদের ধরা দিত। কেন? ভারতীয় মহাকাব্যের জীবন মরণের যাদু কাঠিটী তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। সে বিশ্ব-মনে—বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, ত্রিপিটক, জৈনসূত্র, শৈবাগম, বৈষ্ণব-পদাবলী, সুফীর হৃদয় ব্যথা, খৃষ্টীয় মরমীয়া তন্ত্র সর্বক্ষণ আঘাত কোরত। তাই বলি বিবেকানন্দ ছিলেন এক চলমান ধর্মমহাসভা। ২।১১।৫২

॥ আত্ম-সমর্পণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বিজয়াদি ভক্তদের বল্লেন, 'দেখ—সুখ দুঃখ দেহের অবশ্যম্ভাবী ধর্ম। কিন্তু যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে সে তার দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা সব তাঁর পায়ে সমর্পণ করে। একদিন শ্রীরামলক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে স্নান করতে গেলেন; তাঁরা তাঁদের ধনুক মাটিতে পুঁতে রাখলেন। স্নান কোরে উঠে

এসে লক্ষণ ধনুক তুলে দেখলেন তার হুলে রক্ত লেগে। রাম বল্লেন, "দেখত! বোধ হয় আমরা ধনুঃ হুলে কোন প্রাণীকে বিদ্ধ করেছি।" লক্ষণ মাটী খুঁড়ে দেখলেন একটা মস্ত কোলাব্যাঙ্ ধনুকের হুলে বিদ্ধ হয়ে মরছে। শ্রীরামচন্দ্র দুঃখিত হয়ে বল্লেন, "তুমি চ্যাঁচাতে পারলে না? তোমাকে আমরা বাঁচাবার চেষ্টা করতুম; সাপে ধরলে তো খুব চ্যাঁচাও।" ব্যাঙ্ বললে, "প্রভু! সাপে ধরলে চ্যাঁচাই 'রাম! রক্ষা কর', 'রক্ষা কর'। কিন্তু হে রাম! এবার যে তুমি মারছ, সেইজন্য চুপ কোরে আছি।" ৩।১১।৫২

॥ গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস ॥

স্বামিজী সন্ন্যাসের সঙ্গে কোন আশ্রমের আপোষ করেন নি। শ্রীনগরের রাস্তায় যারা গার্হস্থ্য-জীবনের মহত্বের সহিত সন্ন্যাসের তুলনা করত, তাদের তিনি অতি করুণার চক্ষে দেখতেন। তিনি বলতেন, 'জনকরাজা হওয়া, বল্লেই হলো; সিংহাসনে অনাসক্ত ভাবে বসে আছেন, যশঃ, ঐশ্বর্য, স্ত্রীপুত্র কোন দিকে হুঁশ নেই। পাশ্চাত্য দেশে আমাকে বলত আমার ঐ রকম অবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐরূপ একজন জনকের নামই শোনা যায়। তথাপি তোমাদের বংশধরদের বলতে ভুলো না, খদ্যোত ও সূর্যে যে তফাৎ, ডোবা ও সমুদ্রে যে তফাৎ, সরষে ও সুমেরু পর্বতে যে তফাৎ, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসে সেই তফাৎ।' ভণ্ড সাধুদেরও তিনি আশীর্বাদ করতেন; কারণ তারা সাহস কোরে আদর্শকে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের ভুলের ভেতর দিয়ে অপরকে হুঁশিয়ার করেছে, অনেক ব্যর্থমুখ জীবনকে সফলতার দিকে লক্ষ্য করিয়ে দিয়েছে। বলতেন, 'আজ যদি গেরুয়া জগতে না থাকত, তা হলে বিলাসব্যসন, কামকাঞ্চন পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যত্ব হরণ কোরে নিত।' ৪।১১।৫২

॥ পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ ॥

স্বামিজীর সমগ্র কর্মময় জীবনটী যদি পর্যবেক্ষণ করা যায় তা হলে দেখা যায়, সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে তিনি এক প্রবল পরাক্রান্ত মহান্ সূর্যের মত ভ্রমণ করেছেন। চিন্তায় প্লেটো, স্পষ্টবাক্যে সাভোনারোলা, গুরু বা ঈশ্বর দূত-

রূপে সর্বত্র পূজিত, বোধিসত্ত্বের মত শিষ্য মধ্যে বিরাজমান। কেউ কেউ তাঁর মুখমণ্ডলে বুদ্ধের জ্যোতিঃ, কেউ কেউ খৃষ্টের প্রেম দর্শন করেছেন। কেউ দেখেছেন তাঁর জিহ্বায় উপনিষদের ঋষি, কারও অনুভূতি স্বয়ং শংকরাচার্য—সকলেরই নিকট ছিলেন তিনি মূর্ত চরম জ্ঞান। ধর্ম মহাসভার নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন তাঁর বাণী চতুর্দিকে তাঁর মর্মের, ভারতের তথা তাঁর মহাগুরুর বার্তা বহন করতে লাগলো, তখন প্রত্যেকেরই মনে হতে লাগলো, "সত্যই এ ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে ভ্রমণ করেছে", এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক আধিকারিক পুরুষ। "ইনি এমন একজন লোক যিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়েছেন"—ইনি ঈশ্বরাজ্ঞা-প্রাপ্ত হয়ে দর্শিত-তত্ত্ব প্রচার করছেন। তাঁর উর্ধ্বহস্তে কেবল কৃপা ও অভয়, কণ্ঠস্বর কখন জলপ্রপাতের মত স্বচ্ছন্দ, কখনও বা বজ্রধ্বনির মত গম্ভীর, চরম সত্য সম্বন্ধে পূর্ণ প্রকাশ, আর মুখে প্রেম ও শুভেচ্ছা। ৫।১১।৫২

॥ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় ॥

ঠাকুর বলতেন, 'একজন লোক একটা কূয়ো খুঁড়তে আরম্ভ করলো। মাত্র কয়েক হাত খোঁড়া হয়েছে, এমন সময় একজন এসে বল্লে, "আরে ভাই, এখানে খুঁড়ে কোন লাভ নেই, তলায় কোন ঝরণা নেই, কেবল শুকনো বালি।" তার কথা শুনে লোকটা আর এক জায়গায় আরম্ভ করলে। হঠাৎ আবার আর একজন এসে বল্লে, "আরে মশাই, শুধুশুধু সময়, পয়সা ও পরিশ্রম নষ্ট করছেন ; এখানে একটা কূয়ো ছিল, কেবল বোদা জল, একটু দক্ষিণে যান বেশ ভাল জায়গা পাবেন—তলায় বেশ পরিষ্কার মিষ্টি জলের ঝরণা।" উপদেশ শুনে লোকটা আর একটা জায়গা ঠিক করলে, সেখানেও সেই একই বাধা, শেষে তার আর কূয়ো খোঁড়াই হলো না। লোকটার ছিল না দৃঢ়তা, বিশ্বাস, ধৈর্য। ঠিক ধর্ম জগতেও এমনি ঘটে থাকে। অবিশ্বাসী দুর্বল লোকেরা নানা গুরুস্থানে ঘুরে বেড়ায়, কিছুই লাভ হয় না। গুরুর অভাব নেই, সকলেই উপদেশ করতে পারে ; তাতে শিষ্যের কি হবে না হবে, তা কেউ ভার নিতে রাজি নয়। দৃঢ়-শিষ্যের বড়ই অভাব। "গুরু মিলে লাখ্ লাখ্, চেলা না মিলে এক।" ৬।১১।৫২

॥ সমাজ-সংস্কার ॥

স্বামিজী একবার তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ভারতে সমাজ সংস্কারকের কখনও অভাব হয়েছে কি? ভারতের চলমান ইতিহাসের খবর রাখ কি? শংকর কি ছিলেন? রামানুজ, নানক, চৈতন্য, কবির, দাদু এঁরা কে?—এ সব প্রচারকেরা কাঁরা? এই যে একটীর পর একটী তারকা আধ্যাত্মিক আকাশে প্রস্ফুটিত হয়ে শোভাবর্ধন করেছেন,—এই সব নবনব প্রচারকগুচ্ছ কাঁরা? নিম্নশ্রেণীর জন্য রামানুজ অনুভব করেন নি? চৈতন্য অনুভব করেন নি? তাঁরা কি প্যারিয়াদেরও নিজের প্রদর্শিত পথে আনবার চেষ্টা করেন নি? এঁরা মুসলমানদেরও কি টানেন নি? হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় কোরে একটী নূতন ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা নানক করেন নি কী? তাঁরা সকলেই ভারতকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নত করবার চেষ্টা করেছেন, সে সকল প্রচেষ্টার অবশেষও এখন ভারতবর্ষে বর্তমান। কেবল তাঁরা আধুনিক প্রচারকদের উৎপীড়ন ও অভিশাপ পরিত্যাগ করেছিলেন। ৭।১১।৫২

॥ সংসারের দড়ি ॥

বক্না বাছুর সারাদিন ছুটোছুটি কোরে বেড়ায়। কেবল খিদে পেলে মাঝেমাঝে এসে মার কাছে দুধ খেয়ে যায়। কিন্তু যেই গয়লা বাঁধতে আরম্ভ করলো, আর অমনি সব দৌড়-ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেল। কেবল চুপ কোরে দাঁড়িয়ে থাকে, আস্তে আস্তে চলে, শরীর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে অস্থি-চর্মসার হয়। ছোট ছেলেদেরও ঠিক তেমনি। দিন রাত।হাসি-খুসি, দৌড়-ঝাঁপ, পড়াশুনো, গল্প, ঝগড়া—কিন্তু যেই সংসারের দড়ি কাঁধে পড়লো, অমনি কোথায় সব আনন্দ ধীরে ধীরে পালালো; কোথায়ই বা মুখের লালিমা; ধীরে ধীরে অধিকার করলো ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, কপালে দাগ, চোখে কালি। চির-কিশোরই ধন্য—যে প্রভাত বায়ুর মত স্বাধীন, সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত স্নিগ্ধ, শিশিরের মত পবিত্র ও স্বচ্ছ। বে হলো, অর্ধেক মন গেল ভাগ হয়ে, ছেলে-পুলে হলে আরও তা থেকে কিছু খরচ হলো, ক্রমে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, অসন-বসনে মন একেবারে সব ছড়িয়ে পড়লো—"প্রভুজী! অবতোহে ভজব কোন্ বেলা?" ৮।১১।৫২

॥ অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান ॥

মনের অজ্ঞান-ভূমি রয়েছে, কিন্তু এ জ্ঞান-ভূমির তলায়। দেহ-সংঘের এ একটা অংশ বিশেষ। দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুমান মাত্র, পরন্তু ধর্ম—সত্য জানতে চায় মুখোমুখী ভাবে, তাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকবে না। সত্যের এই মুখোমুখী দর্শনই হচ্ছে, অতীন্দ্রিয় দর্শন, এই হলো সত্য দর্শনের একমাত্র ভিত্তি। এ সত্য দর্শন বা সত্যস্বরূপ হয়ে যাওয়া একই কথা। আপ্ত বলি কাদের যাঁদের সত্যের সহিত ইন্দ্রিয়াদি ব্যবধান-হীন সাক্ষাৎকার হয়েছে। সত্যের সাক্ষাৎকার হয়েছে তার প্রমাণ, তুমিও ঠিক ঐ ভাবে পরীক্ষা কোরে স্বয়ং অনুভব করতে পার। তোমারও ঐরূপ সক্ষাৎ অনুভূতির অভিজ্ঞান হলে, মন নিঃসংশয় হবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানের সত্য লাভের এক একটা বিশিষ্ট উপায় আছে। ধর্ম-বিজ্ঞানেরও তাই। ভক্তিযোগের পথ প্রেমের অনুশীলন, কর্মযোগের পথ সর্বকর্মে স্বার্থের বিসর্জন, জ্ঞানযোগের পথ জগতের সত্য মিথ্যা বিচার, রাজযোগের পথ ধ্যানের অভ্যাস। ৯।১১।৫২

॥ জাতীয়-তরী ॥

স্বামিজী এক ভারতীয় বক্তৃতায় বলছেন, 'হে ভারত ভারতী! আমাদের জাতীয়-তরী আজ ডুবতে বসেছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে এ আমাদের পারাপার করেছে, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরে সহস্র সহস্র লোককে এ আমাদের আদর্শ ব্রহ্ম ভূমিতে পৌছে দিয়েছে। আজ এতে ছিদ্র হয়েছে বলে কি এর নিন্দা করা আমাদের উচিত, না সমবেত ভাবে প্রাণপণে এর সংস্কার বিধান করা উচিত? এর চাইতে আর কোন জাতীয়-তরী কি মনুষ্যসমাজে অধিক কার্যকরী হয়েছে? এস হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর দিয়ে আমরা এর সংস্কার সাধন করি। যদি না পারি, তা হলে আমাদের সমবেত ভাবে ডুবতে হবে। এই বিরাট দেশকে রক্ষা করবার ক্ষমতা অপর দেশের সহায়তায় হবে না, আমাদের নিজেদের মস্তিষ্ক দিয়েই এর সংস্কার সাধন করতে হবে। আমাদের নিজেদের দোষের জন্য এই জীর্ণতাকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই, এ সম্বন্ধে আর একটিও নিষ্ঠুর কথা বা আর একটীও শাপবাক্য উচ্চারণ কোর না; হয় সাহায্য কর, নয় সরে দাঁড়াও, অপরকে বিরক্ত করো না। হে নির্ভীক অক্লান্তকর্মী!

তোমাদের ওপর ভারতের সর্বজাতির আশীর্বাণী সর্বদা উচ্চারিত হোক। ১০।১১।৫২

॥ মহাভাবের অনুভূতি ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন গীরিশকে বল্লেন, 'ভেবনা দর্শনে কেবল আনন্দ, তার ব্যাথাটাও একই রকমের। মহাভাবে আত্মা ঈশ্বরে ডুবে থাকে। দেহমন থর্‌-থর্‌ কোরে কাঁপতে থাকে। যেন কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকেছে—ঘর মড়মড় করতে থাকে—হয়ত বা ঘর একেবারে হুড়মুড় কোরে পড়েই গেল। একটু বিচ্ছেদ হলেই কী যাতনা, তা সাধারণে আর কি বুঝবে। বলে বিরহ-উত্তাপে রূপ-সনাতনের গায়ে এমন জ্বালা উপস্থিত হয় যে, যে গাছের তলায় তাঁরা বসতেন তার পাতাগুলো ঝলসে যেত। আমার ঐরূপ যখন হলো, তিনদিন বেহুঁশ হয়ে ছিলুম, নড়তে পারতুম না, এক জায়গায় পড়ে থাকতুম। ঐ সময় প্রথম মনে হোত আমার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা বিদ্যুতের ফাল চলে যাচ্ছে। আমি "মলুম" "মলুম" বলে চিৎকার করতুম তারপর আনন্দে বেহুঁশ হয়ে যেতুম। সংজ্ঞা হলে ব্রাহ্মণী আমায় নাওয়াতে নিয়ে যেত। আমার গায় হাত দিতে পারত না, হাত পুড়ে যেত, হাতে মোটা কাপড় জড়িয়ে তবে গায় হাত দিত, তারপর গঙ্গায় নিয়ে যেত। যখন আমি গড়াগড়ি দিতুম, গঙ্গামৃত্তিকা আমার গায় লেগে পুড়ে শক্ত হয়ে যেত।' ১১।১১।৫২

॥ কামজয় ॥

'কামজয়, হয় কি কোরে জান ?' একদিন ঠাকুর ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিজেকে প্রকৃতি ভাবতে পার ? আমি অনেকদিন ধরে ভবতারিণীর দাসী হয়ে ছিলুম—সাজ-গোজ সব মেয়েদের মত। মেয়েদের বেশেই পূজো করতুম। নইলে আট মাস (তোতাপুরীর আদেশে) আমার স্ত্রীকে আমার কাছে রাখলুম কি কোরে ? আমরা দুজনেই জানতুম আমরা মা ভবতারিণীর সখী। আমি যে পুরুষ তা ভুলেই গিয়েছিলুম। একদিন আমার স্ত্রী আমায় জিগ্যেস করলে, "আমাকে তুমি কি ভাবে দেখ ?" আমি বল্লুম, "সচ্চিদানন্দময়ী রূপেই

দেখি।" শিবলিঙ্গ গৌরীপট্ট উপাসনার মানে কি? না, "হে শিব! হে জগদম্বে! আর যেন জন্ম-পথ দর্শন করতে না হয়। আর যেন গর্ভযন্ত্রণা ভোগ না করতে হয়।" শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ময়ূরের পাখা, স্ত্রীচিহ্ন। অর্থাৎ জগদ্‌যোনিকে মস্তকে ধারণ কোরে আছেন। রাসচক্রে শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রী মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন—নাকে নোলক, হাতে বালা, পায়ে মল, ঘাগরা পরা—প্রকৃতি ভাব। প্রকৃতি ভাবে সিদ্ধ হলে প্রকৃতির সঙ্গে মেশবার অধিকার হয়। তখন তাদের সঙ্গে খেলা করা যায়।' ১২।১১।৫২

॥ মাতৃভাব ॥

ঠাকুর বাড়ীর একজন গৃহশিক্ষক কতকগুলি ছেলেপুলে নিয়ে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে এলেন (১১।১০।৮৪ শনিবার)। (ঐ দলে শোনা যায় রবীন্দ্রনাথও ছিলেন)। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলতে লাগলেন 'প্রকৃতি ভাবে সিদ্ধ না হলে, প্রকৃতি থেকে একেবারে তফাৎ। দেখনি, যখন বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে ছাতে ওঠে, তখন কি কেউ কোমর দোলায়? বাঁশ ধরে ধীরে ধীরে উঠতে হয়, নইলে পড়ে যাবে। ঈশ্বরলাভ করার পর আলাদা কথা, তখন আর তত ভয়ের কারণ নেই। আগে যেনতেন প্রকারে ছাতে ওঠো, তারপর নাচতে হয় নাচ। ধাপে দাঁড়িয়ে আবার কে নাচে? ছাতে উঠে আর অত বিধি-নিষেধ মানতে হয় না। ছাতে উঠে মানুষ বুঝতে পারে ছাতও যা দিয়ে তৈরী, সিঁড়িও তাই দিয়ে তৈরী। যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে শাস্ত্র ও গুরুরা এত সাবধান করেছেন, জগদম্বার দর্শন হলে বোঝা যায় সেই মা জগদম্বাই সর্ব স্ত্রীমূর্তি ধারণ কোরে জগৎ মুগ্ধ করছেন, তখন সে আর মুগ্ধ হয় না। তখন সর্ব নারীমূর্তিই মাতৃমূর্তি হয়ে যায়। তখন আর ভয় কি? তখনই শাক্তের সাধনার শেষ। তখন স্ত্রীপুরুষ সর্বত্রই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ীর অনুভব হয়। তখনই সত্যিকার মাতৃপূজার আরম্ভ।' ১৩।১১।৫২

॥ "স্থাপকায় চ ধর্মস্য" ॥

১৮৯৮, ৬ই ফেব্রুয়ারী, রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়ি, তাঁর স্ত্রী ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বামিজী খালি পায়ে, খোল বাজাতে বাজাতে, ভক্তদের সঙ্গে

চললেন, গিরীশ বাবু গান বাঁধলেন, "দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো কোরে।" শত শত লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁকে দর্শন করতে লাগলো। মেয়েরা শঙ্খ ও হুলু ধ্বনির সহিত তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। সুন্দর ঠাকুরঘর মার্বেলের মেজে, পোরসিলেনের মূর্তি। বিভূতি ভূষিত হয়ে স্বামিজী প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেন, তাঁর শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ মন্ত্র পড়ালেন। নীরোদ মহারাজের মা বল্লেন, "আমরা অতি গরীব, আমরা তাঁর সেবার ব্যবস্থা কী বা করব?" "স্বামিজী বল্লেন, "ঠাকুর তো চিরকাল চালাঘরে বাস করলেন, এখন এমন সুন্দর ঘরে বাস করবেন, ভক্তেরা সেবা করবে, আর কি চান তিনি?" এখানে স্বামিজী ঠাকুরের প্রণামমন্ত্র রচনা করলেন,—

"স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥" ১৪।১১।৫২

॥ মনের অবস্থা ॥

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রবি ঠাকুরদের বাড়ীর গৃহ শিক্ষককে বলছেন, 'মানুষ যখন বাইরের বিষয় নিয়ে থাকে, তখন মন অন্নময় কোষ অবলম্বন কোরে থাকে। যখন আপন মনে চিন্তা করে, তখন মন মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ অবলম্বন কোরে থাকে। সুষুপ্তিতে যে আনন্দ অনুভব হয় তা আনন্দময় কোষে। (সাত্ত্বিক সুষুপ্তিতে একটা নিরহং জগদভাবের জ্ঞান থাকে। জাগ্রৎ অবস্থায় তার আনন্দ-স্মৃতি উপলব্ধি হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় যে সুষুপ্তির স্মৃতি থাকে সে সুষুপ্তি হলো রাজসিক। আর তামসিক সুষুপ্তি যাদের হয়, তাদের তখন মনে হয় যে তাদের ঐ সময় সত্তা থাকে না)। সাত্ত্বিক সুষুপ্তির অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় শ্রীচৈতন্য সাধারণতঃ থাকতেন। তুরীয়াবস্থা জ্ঞানাজ্ঞানের পার, মহাকারণে চিত্ত লয় হয়, শ্রীচৈতন্যের ঐরূপ হোত। দয়ানন্দ বলত, "ভেতরের কুঠিতে প্রবেশ কোরে চারিপাশের দরজা বন্ধ কোরে দেওয়া"।' ১৫।১১।৫২

॥ ধ্যান ॥

ঠাকুর-বাড়ীর ঐ শিক্ষকটীকে ঠাকুর আবার বলছেন, 'আমি দীপ শিখার ধ্যান করি—বাইরের লাল অংশটা যেন স্থূল দেহ, তার মধ্যে সাদা অংশটা যেন

সূক্ষ্ম-শরীর এবং তার মধ্যে কালো অংশটা যেন কারণ-শরীর। ধ্যান ঠিকঠিক হচ্ছে কি না বুঝতে গেলে, তার অনেক লক্ষণ জানা চাই। তার একটা লক্ষণ, পাখী ধ্যানীর মাথায় বসে, মনে করে বুঝি একটা জড় পদার্থ। আদি সমাজে কেশবকে দেখলুম, অনেক লোকে তাকে ঘিরে বসে ধ্যান করছে। দেখলুম একেবারে নিশ্চল আমি কেশবকে দেখিয়ে মথুরকে বল্লুম, "কেবল ঐ লোকটার ফাতনা নড়েছে।" এই ধ্যান-শক্তির জন্য তার ঈশ্বরের কৃপায় এত নাম যশঃ। চোখ চেয়েও ধ্যান হয়, যেমন দাঁত কন্‌কনানির সময়, চোখ চেয়ে আছে, কিন্তু অবিরত মন রয়েছে ঐ দাঁতে।' শিক্ষকটী বল্লেন, 'মশায়! এটা আমি খুব বুঝি।' সকলে হাসতে লাগলো। ঠাকুর আবার বলছেন, 'সব কাজকর্ম করছে, কিন্তু মন রয়েছে ঐ দাঁতে। চোখ চেয়েও ঠিক ঐরূপ ধ্যান হয়, এমন কি কথা বলবার সময়ও মন থাকে ঈশ্বরের দিকে।' ১৬।১১।৫২

॥ মহানির্বাণের প্রান্তভাগে ॥

প্রভু গিরীশাদি ভক্তদের বলছেন, 'ব্যাধি হলো দেহের, দেহ হলো পঞ্চভূতের। আমি ভগবানের নানাবিধ মূর্তি দেখছি, তার মধ্যে এটাও একটা। আমি এখন সামনাসামনি কি দেখছি জান—ভগবান এ সব হয়ে রয়েছেন। জীব জন্তু যেন চামড়ার খোলে তৈরী, তার ভেতর দিয়ে ভগবান স্বয়ং হাত পা নাড়ছেন। আর একবার দেখলুম ঘর, বাড়ী, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু, বাছুর সব সেই এক বস্তু দিয়ে তৈরী—যেন সব মোমের তৈরী। একদিন দেখলুম ভগবান নিজেই হাঁড়িকাঠ, খাঁড়া, ঘাতক ও বলির পশু হয়ে রয়েছেন—কী অদ্ভুত দৃশ্য! এখন আমার আর যন্ত্রণা নেই, এখন আমার স্বরূপ পেইছি। লাটু গালে হাত দিয়ে বসে আছে, কিন্তু আমি দেখছি তিনিই বসে আছেন।' নরেন ও রাখালের চিবুক স্পর্শ কোরে বল্লেন, 'এবার কিন্তু আর দেহ থাকবে না। মার ইচ্ছা নয়। বোকা বামুন পেয়ে লোকে যা খুশী তাই, নিয়ে নিচ্ছে। কলিযুগ কিনা, জপ-ধ্যানে কেউ রাজি নয়।' ১৭।১১।৫২

॥ "সব এখান থেকেই" ॥

রাখাল ঠাকুরকে বল্লেন, 'মাকে বলুন, যাতে শরীরটা আর কিছু দিন থাকে।' নরেনও বিনতি জানালেন, 'আপনি ইচ্ছা করলেই মার ইচ্ছা হবে।' ঠাকুর বল্লেন, 'না রে না, এখন আর মাকে বলে কিছু হবে না। এখন আর মার ও আমার ইচ্ছার ভেদ খুজে পাচ্ছি না।' শ্রীশ্রীপ্রভুর আর দৃশ্য-দেহে থাকবার ইচ্ছে নেই, পূর্বেই মাষ্টারকে বলেছেন, 'এত কষ্ট ভোগ, তোরা কাঁদবি বলে। যদি তোরা সকলে বলিস তো এ শরীরটা ছেড়ে দেই।' আবার বলতে লাগলেন, 'এর মধ্যে দুটো, একটা মা (পূর্ণ) ও আর একটা ছেলে (অবতীর্ণ) ; ছেলেরই হাত ভেঙে ছিল, ছেলেরই এখন অসুখ। পূর্ণ ই অবতীর্ণ হন, মানুষ হয়ে ভক্ত সঙ্গে আসেন, তাঁর সঙ্গেসঙ্গে ভক্তরাও চলে যায়। বাউলের দল এলো, নাচলো, চলে গেল, কেউ চিনলে, কেউ চিনলে না। জীবের জন্য এই শরীর ধারণ, শরীর থাকলেই কষ্ট।' ঠাকুর নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে কি বলে বোধ হয় ?' নরেন বল্লেন, 'আপনি সত্যদর্শী সিদ্ধ মহাপুরুষ, আপনি স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণী।' শ্রীশ্রীপ্রভু নিজের বুকে হাত দিয়ে বল্লেন, 'দেখছি, যা কিছু আছে (অস্তি), সব এখান থেকেই।' ১৮।১১।৫২

॥ অবতার ॥

নরেনের সঙ্গে ঠাকুরের শ্রীবুদ্ধের উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছে। ঠাকুর হেসে বলছেন, 'এ একডালা গাছ নয়, পাঁচডালা। এখানে সব পাবে, মুসুরীর ডাল, তেঁতুল থেকে সব।' নরেন বল্লেন, 'আপনি ও সব উচ্চ অবস্থা সেরে, সাধারণের জন্য নীচেয় বসে আছেন।' ঠাকুর বল্লেন, 'কে যেন নীচেয় টেনে রেখেছে।' হাতে পাখা নিয়ে বল্লেন, 'ঠিক এই রকম দেখেছি, বুঝলি।' নরেন বল্লেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি।' ঠাকুর বল্লেন, 'কি বুঝলি বল ?' নরেন বল্লেন, 'ভাল কোরে শুনিনি।' ঠাকুর বল্লেন, 'আমি সচ্চিদানন্দ দর্শন করেছি। তিনি ও এখানে যে বাস করছে সে একই। নরেন বল্লেন 'হাঁ হাঁ সোঽহম্ সোঽহম্।' ঠাকুর বল্লেন, 'কেবল একটা দাগ আছে—ভক্ত ও ভগবানে ভেদ করেছে। এই ভেদ রাখার হেতু দুটো—জীব কল্যাণ ও সচ্চিদানন্দ সম্ভোগ।' নরেন বল্লেন, 'মহাত্মারা এই জন্য অহং রাখেন।' ঠাকুর বল্লেন,

'কুলির মত কাজ নয়, এতে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। নিজের খুশী, ভালবেসে লোকের মঙ্গল করেন।' ১৯।১১।৫২

॥ "তিনি স্বয়ং" ঃ দর্শনোপায় ॥

ঠাকুর মাষ্টারাদি ভক্তদের বলছেন, 'শিবের ভক্তেরা জ্ঞানী এবং বিষ্ণু ভক্তেরা ভক্ত হয়। মাষ্টার বল্লেন, 'কিন্তু শ্রীচৈতন্যে তো উভয়ই ছিল!' ঠাকুর বল্লেন, 'তাঁর কথা আলাদা, তিনি যে স্বয়ং! ঈশ্বর স্বয়ং যে ঐ খোলে রয়েছেন। সার্বভৌম তাঁর জিবে চিনি দিয়ে পরখ্ করলে, রস জয় হয়েছে কি না। চিনি ফুর্ ফুর্ কোরে উড়ে গেল। দেখ একবার, রক্ত-মাংসের ওপর কিরূপ আধিপত্য। যারা ঈশ্বর দর্শন করেছে, তারা জগৎকে গ্রাহ্যই করে না—লোক না পোক। যারা স্বরূপ উপলব্ধি করেছে, তারা সংসার ভয় করবে কেন? তারা ইচ্ছা করলেও সংসার ভোগ করতে পারে না। বিদেহ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত একটুআধটু সংসারের কিছু লেগে থাকে।' একজন জিগ্যেস করলে, 'প্রভু! কি কোরে তাঁর দর্শন পাব?' প্রভু বল্লেন, 'সংসারের সব জিনিষ থেকে মন কুড়িয়ে, তাঁর দিকে দিলেই দেখতে পাবে। দেখ চাতক গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী থাকতেও, সপ্ত সমুদ্রে কানায় কানায় জল থাকতেও মেঘের জল ছাড়া খায় না। একেই বলে একাগ্রতা যোগ।' ২০।১১।৫২

॥ টাকার সংসর্গ ॥

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়য়ারী ছিল বেদান্তী। ঠাকুরের বিছানার চাদর ময়লা দেখে বল্লে, 'আপনার নামে আমি দশহাজার টাকা রাখতে চাই, তার সুদে আপনার খরচ চলবে।' তার কথা শুনে ঠাকুর বল্লেন, 'যেন আমার মাথায় কেউ লাঠি বসিয়ে দিলে, আমি মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে গেলুম। সংজ্ঞালাভ কোরে বল্লুম, "এ রকম কথা যদি তুমি বল, তা হলে তুম্ হিঁয়া মত আও। আমার পক্ষে টাকা ছোঁয়া অসম্ভব, টাকা কাছে রাখাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" লোকটা খুব চালাক, আমাকে বলে কী—'তা হলে এখনও আপনার ত্যজ্য গ্রাহ্য হ্যায়—এখনও পূর্ণ জ্ঞান হয়া নেই।' আমি বল্লুম, "না বাবা, আমার এখনও

অতুনা দূর হয়া নেই।" (সকলের হাস্য)। লক্ষ্মীনারায়ণ শেষে টাকাটা হৃদের নামে রাখতে চাইলে! আমি বল্লুম, "তা হবে না বাপু। হৃদের কাছে থাকলেও আমি ওকে হুকুম করব, 'এ কর্', 'উ কর্'। যদি না করে তো আমার রাগ হবে।" টাকার সংসর্গ ভাল নয়। আয়নার পাশে দাঁড়ালেই ছায়া পড়বে।' ২১।১১।৫২

॥ কাশীতে মুক্তি ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসিত হয়ে এক ভক্তকে বললেন, 'যে কাশীতে দেহ ত্যাগ করে সে শিবের দর্শন পায়। শিব তাকে বলেন, "এ আমার নামরূপাত্মক শরীর, আমার এই মূর্তি মায়িক। ভক্তদের জন্য আমি এই দেহ ধারণ করি। এখন দেখ্! আমি সচ্চিদানন্দে মিশে যাই।" এই বলে চকিতে তিনি স্বীয় শরীর অন্তর্ধান করেন এবং মরণমুখ জীবকে তাঁর ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করান, সে মুক্ত হয়ে যায়।'

ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, "গঙ্গাপ্রাপ্তি মুক্তি কি?" প্রভু বল্লেন, 'ব্রহ্মজ্ঞান না হলে কেউ কখন মুক্ত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানীর যেখানেই মৃত্যু হোক সেখানেই মুক্তি। অজ্ঞানীর পক্ষে গঙ্গাপ্রাপ্তিই মুক্তি—(তাদের তো অধোগতি হয়ই না, পরন্তু উত্তমউত্তম লোকপ্রাপ্তি ঘটে। তবে এ সব ব্রহ্মজ্ঞানীর মুক্তি নয়)। পুরাণে আছে হরিভক্তি থাকলে চণ্ডালেরও মুক্তি হয়। এদের মতে মুক্তির জন্য ভগবানের নামই যথেষ্ট। পূজা-পাঠ, যাগ-যজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্র কিছু দরকার নেই, এক নাম-যজ্ঞই সার। বেদ মতে (ব্যাস এবং জৈমিনি মতে) ব্রাহ্মণ ছাড়া মুক্তি হয় না। যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র যথানিয়মিত হওয়া চাই। কিন্তু কলিকালে বৈদিক যাগযজ্ঞ করবার সময়, সামর্থ্য এবং অর্থ কোথায়? কলিকালে কর্মকাণ্ড বড় কঠিন। নারদীয় ভক্তি পথই ঠিক। এখন দশ মূলের পাচন নয়, ডি. গুপ্ত চাই, নইলে ম্যালোয়ারি সারবে কি করে?' ২২।১১।৫২

॥ মহাকাল মহাকালী ॥

দক্ষিণেশ্বরে কতকগুলি ছোকরা জিজ্ঞাসা করলে, "জ্ঞান কী?" প্রভু বল্লেন, 'ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপ। তাঁর আর এক নাম মহাকাল। একটা কথা

আছে, "অলখে (অলক্ষ্যকালে) আসে অলখে যায়, অলখের দেখা কেহ না পায়।" মহাকালের সঙ্গে যিনি খেলা করেন তিনি মহাকালী (নিয়তি—এই কর্মের এই ফল)। তিনি আত্মাশক্তি, ব্রহ্মের ওপর নানারূপ ভ্রান্তি বিস্তার কোরে ব্রহ্মের সঙ্গে খেলা করেন। মহাকাল-মহাকালী, ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ, এঁদের আলাদা করা যায় না। ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, ত্রিকালে নিত্য, মুখে বর্ণনা করা যায় না, খুব বেশী এইটুকু বলা যায় তিনি জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। এ জগৎটা তাঁর ওপর ভ্রান্তি কল্পনা। জগৎটা বাজি। বাজিকরই সত্য, বাজি মিথ্যা।' ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করলে, 'যদি বাজি মিথ্যা হয়, তো লোকে এ খেলা থেকে বেরুতে পারে না কেন?' ঠাকুর বল্লেন, 'সংস্কার! পুনঃপুনঃ মায়িক জগতে জন্মে এবং মায়ার খেলা দেখেদেখে, ওগুলো সত্য হয়ে যায়। মিথ্যা বোলে বোঝালেও বুঝতে পারে না। এক ধোপা রাজা হয়ে জন্মায়। ছেলেবেলা সে ধোপা ধোপা খেলতে ভালবাসত। সংস্কারশক্তি এমনি প্রবল।'
২৩।১১।৫২

॥ কুণ্ডলিনী জাগরণের গতিভেদ ॥

ঠাকুর একদিন নরেনকে বলছেন, 'হৃষিকেশ থেকে দক্ষিণেশ্বরে এক জন সাধু এসেছিল। সে দেখে বল্লে, "কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! পাঁচ রকমের সমাধির ক্রম আমি তোমাতে দেখছি। মর্কট গতিবৎ—বাঁদর যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে এক ডাল থেকে আর এক ডালে ওঠে, ঠিক তোমার মহাবায়ু তেমনি কোরে সহস্রারে ওঠে। মৎস্যবৎ—মাছ যেমন তরতরিয়ে জলের ভেতর যায়, মহাবায়ু তেমনি কুণ্ডলিনী পথে সহস্রারে চলে। পক্ষী-গতিবৎ—পাখীর মত কখন এ ডাল, কখন ও ডাল, কখন উঁচুতে, কখন নীচুতে বসতে বসতে ওঠে। পিপীলিকা গতিবৎ—পিঁপড়ের মত সুড়সুড় কোরে কুণ্ডলিনী পথে গতির অনুভব হয়। সর্প গতিবৎ—এঁকে বেঁকে মহাবায়ু সাপের মত সুষুম্না বেয়ে ওঠে।" ছাত বেশ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ওঠাই কঠিন। তবে যদি কেউ উঠে একটা দড়ি ফেলে দেয় এবং লোকটাকে টেনে তোলে, তখন অনেকটা সুবিধা হয়'। ২৪।১১।৫২

।। সন্ন্যাসী ও গর্ভধারিণী ।।

বাবুরাম মহারাজ একদিন বল্লেন, ঠাকুর একদিন স্বামিজীকে বলছিলেন, 'মা কি কম গা! চৈতন্যদেব মার অনুমতি না নিয়ে সন্ন্যাসী হতে পারলেন না। নিমাই সন্ন্যাসী হবে শুনে শচীমা বলেছিলেন, "আমি কেশব ভারতীকে কাটব।" চৈতন্য মাকে বল্লেন, "মা তুমি যদি অনুমতি না দাও, তো আমি সন্ন্যাসী হব না, তবে তুমি যদি আমাকে গৃহী কোরে রাখ, তা হলে আমি বাঁচব না। আর আমি যদি সন্ন্যাসী হই, তা হলে তুমি ডাকলেই আমি আসব, আমি তোমার কাছেকাছেই থাকব এবং যখন তখন দেখতে পারব!" তখন শচী মা আদেশ দিলেন। মা থাকতে নারদ সাধু হতে পারলেন না। বৃন্দাবনে গঙ্গামার ভালবাসায় আমার কোল্‌কাতা থেকে মন উঠে গেল, ভাবলুম আর কত কাল কৈবর্তের অন্ন খাব। হৃদে আর গঙ্গামা দুজনে আমার দুহাত ধরে টানাটানি। তারপর হৃদে বলায় মার কথা মনে পলো। বুড়ো হয়েছেন, মার চিন্তাতেই ভগবৎ চিন্তা মাথায় উঠবে। বরং মার কাছে কাছে থেকে শান্তিতে ঈশ্বর চিন্তা করা ভাল'। ২৫।১১।৫২

।। আত্মা শুদ্ধ ও এক ।।

স্বামিজীর অভিজ্ঞান, সব আধুনিক ধর্ম এই ধারণা নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছে যে, মানুষ একটা সময়ে অতি পবিত্র ছিল, যেখান থেকে তার পতন হলো; কিন্তু আবার সে তার সেই সরল অবস্থায় গমন করবে। কি কোরে এই ধারণাটা উঠলো বলা বড় কঠিন। জ্ঞান আত্মনিবাস, বাইরের ঘটনাবলী কেবল তাকে উত্তেজিত করে। জ্ঞানই আত্মার শক্তি। যুগযুগ ধরে এ কেবল শরীরের পর শরীর তৈরী কোরে যাচ্ছে। অসংখ্য জন্মান্তর আর কিছু নয় কেবল আত্মজীবনীর অনন্ত অধ্যায়ের ক্রম-বিন্যাস। দিন রাত এই দেহটা নিয়ে আমরা ব্যস্ত, দিন রাত চলছে গড়া ও মেরামত। সমস্ত বিশ্বটা উৎপত্তি-স্থিতি-নাশের প্রবাহ—নামরূপের বিস্তার ও সংকোচ—বিবর্তন, পরিবর্তন। সাক্ষী আত্মাই কেবল অপরিবর্তনীয় থেকে এই প্রবাহের ক্রম ও পূর্বাপর সম্বন্ধ দর্শন করছেন। মায়ার সংকোচ বিকাশে আত্মার সংকোচ বিকাশ একটা প্রতীয়মান ঘটনা। জগৎ জ্ঞান-স্বরূপ বটে, কিন্তু মনের দ্বারা

উপাধিত। ক্রমবিকাশ ও সংকোচ সবই মনোপাধিত। সীমানায় সমুদ্র—সাগর, উপসাগর; নইলে অসীম। বহুর ভেতর আত্মৈক্য অনুসন্ধানই যাবতীয় আধ্যাত্মিক নীতির মূল। অপরকে আঘাত মানে আমার আত্মাকেই আঘাত।
২৬।১১।৫২

।। সন্ন্যাসী ও গরীব ।।

স্বামিজী আমাদের অবধান করতে বলেছেন, মঠের ব্যাপারে গৃহস্থের কোন সম্পর্ক থাকবে না। সন্ন্যাসী কখন বড়লোক ঘঁ্যাসা হবে না, তার প্রয়োজন গরীব লোকের সঙ্গে। সন্ন্যাসী 'প্রেমসে' গরীবের সেবা করবে, আনন্দের সঙ্গে ও যথাসাধ্য। ধনীর সম্মান এবং তাদের শরণাপন্ন হওয়া এ হলো সন্ন্যাসী জীবনের সর্বনাশের পথ। এ পথে সাধু সাবধান। কর্মের পরিধি ছোট হোক, কিন্তু সাধুতা বজায় থাক। কামকাঞ্চন ত্যাগ কোরে, কর্মযোগের অছিলায় কামকাঞ্চনের লালসা পরিতৃপ্তির সন্ধানে বেরিয়ে কি কোরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত হওয়া যায়? গৃহী ধর্মনেতা হলেই সে ধর্মে ঘুণ ধরবে, সে আদর্শকে তার দুর্বলতার সহিত আপোষ করাবেই। ফলে দাঁড়াবে, সে ধর্মে কিছুকাল পরে পোকা লেগে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ কেঁদেছিলেন, "মা, সংসারীর সঙ্গে কথা বলে বলে জিব জ্বলে গেল। শুদ্ধসত্ত্ব সংসারহীন ভক্ত এনে দাও, কথা বলে বাঁচি।" ঘোর বিষয়ী ও কুৎসিৎ মনের স্পর্শও তিনি সহ্য করতে পারতেন না।
২৭।১১।৫২

।। ধ্যানমূর্তি ।।

উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু তবুও তাঁর শক্তির সমকক্ষ নয়। স্বাধীন চিন্তক, নাস্তিক, জড়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, তার্কিক, প্রয়োজনবাদী, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবৎ রচনা-বাদী—এই রকম আরও সব নানান্ রকম দল, যারা ধর্মের কোন গন্ধ পেলেই তার বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। ভেবেছিল এ হিন্দু 'বক্‌সারটা'কে তারা টপ্ কোরে 'নক্ আউট্' করবে এবং তার যে অধ্যাত্মিক বিদ্যা, তা পাশ্চাত্য সভ্যতা, দর্শন ও বিজ্ঞানের চাপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারা নির্ভয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ দিলে নিউইয়র্কে, কেবল তাদের ন্যায় ও বিশুদ্ধ বিচারকে অবলম্বন কোরে।—স্বামী এক

রথে সেই ব্যূহ ভেদে প্রবৃত্ত হলেন, চারিপাশে ঝকমক্ করছিল, যুক্তি, ন্যায়, সাধারণ বোধ, জড়বাদ, শক্তিবাদ, বংশানুক্রমিক-সংক্রমণ ইত্যাদি, ইত্যাদি, বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র, যাতে সাধারণের ভয়ে পেট খুঁকরে ওঠে। কিন্তু একি আশ্চর্য! এ লোকটা যে তাদের অস্ত্রেরই আরও ভাল ব্যবহার জানে, আর তাদের যুক্তিগুলো এবং তাদের ভুলগুলো যেন তার রোজকের কথা, সবই জানা, দেখালেন সমস্ত পাশ্চাত্য অনুশীলনের তাৎপর্য তারা ধ্বংসেতে এনেছে, জিজ্ঞাসা করলেন, "জীবনের সন্ধান পেয়েছ কি?" যুক্তি তাঁ থেকে সামুদ্রিক গাম্ভীর্যে ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়ে তাদের যুক্তির সকল সীমানা ছাড়িয়ে—স্থিতি ও গতি, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে অতিক্রম কোরে এমন এক সূচ্চস্তরে উপস্থিত হলো যে সেখানকার উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিকেরও মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হতে লাগলো। (ক্রমশঃ)॥

২৮।১১।৫২

॥ ধ্যানমূর্তি ॥

যখন যুদ্ধের অবসান হলো, নিউইয়র্কের সমস্ত চিন্তাজগৎ তখন একেবারে নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে বেদান্তের শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসনের শ্রান্তি-বিনাশী শান্ত হাওয়া বয়ে আসছে। বুদ্ধি তার দৈন্য দেখে লজ্জায় অধোবদন, সহজাতবোধ নিজেকে প্রাণের নিম্নস্তরের ধৃষ্টতা ভেবে সংকুচিত, বংশজাত সংক্রমণ বিভ্রান্ত পথহারা, বিজ্ঞানীর চক্ষু আতঙ্কগ্রস্ত—সম্মুখে এক বিরাট ধ্বংসভীতি রাক্ষসের ন্যায় দাঁড়িয়ে। এমন এক সংশয়াপন্ন পরিবেশে শান্ত বদনে হাস্য মুখে দাঁড়িয়ে গৈরিক পরিহিত ভারতের এক অভিনব ঋষি। ঈশ্বর ও ধর্মের মধুর সংগীত লহরী শতশত অশান্ত প্রাণে আশা ও শান্তিময় জীবনের উদ্বোধন করছে—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে অবস্থিত বিনীত, নতজানু, সংগ্রাম-প্রিয়, কিন্তু আন্তরিক, অবিশ্বাসী কিন্তু সত্যকামী অসংখ্য পরাজিত যোদ্ধা! তাদের অন্তরের প্রার্থনা—"অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।" ২৯।১১।৫২

॥ ভক্তিযোগ ॥

এ পথ সত্যিকার আন্তরিক ঈশ্বরানুসন্ধান। এ অনুসন্ধানের আরম্ভ, গতি ও শেষ এক অভিনব প্রেমে। এক মুহূর্তের এই উন্মাদনা, এই ঐশীবিরহ,

সংসারকে ভুলিয়ে দিয়ে বিরহীকে চিরমুক্ত করে দেয়। নারদ ভক্তিকে বলেন, "পরমপ্রেমরূপা" অর্থাৎ সচ্চিদানন্দে পরাসক্তি। মানুষ এর স্পর্শ পেলে সকলকে ভালবাসে, ঘৃণ্য বলে তার আর কিছু থাকে না। এ ভক্তি দিয়ে কিন্তু সংসারিক কিছু সুবিধা হয় না, কারণ সংসারের পুতিগন্ধ থাকতে তো ভক্তি-পদ্মের সৌরভ আমাদের চিত্তকে আমোদিত করবে না। ভক্তি কর্ম হতে মহীয়সী, যোগাদি হতে শ্রেষ্ঠা, কারণ তারা যে সকাম—তারা চায় চিত্ত-শুদ্ধি, সমাধি। ভক্তি চায় ভালবাসতে, ভালবাসার পাত্রের কাছে সে কিছুই চায় না—চায় তাঁর সেবা। "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে, আমার স্বভাব সে যে ভালবাসা বিনে জানি নে।" একবার ঠাকুর নরেন্দ্রকে বল্লেন, "তোর যদি আমার কথা শুনতে ভাল না লাগে, এখানে আসিস কেন?" নরেন্দ্র বল্লেন, "ভালবাসি বলে আসি।" জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আত্মার ঐক্যানুভূতি না হলে কি মানুষের এরূপ স্বাভাবিক অবস্থা আসে? ভগবান ভক্তের কাছে নানা মূর্তি ধরেও নিজেকে ছাপাতে পারেন না। ভক্ত তাই সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন। ৩০।১১।৫২

॥ শ্রীকৃষ্ণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অবির্ভাব বহুদিন পূর্বে। সেই জন্য তাতে হয়ত অনেক অবকল্পনা জড়িত। কিন্তু ইতিহাসে তিনি যে ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি অদ্ভুত কর্মযোগের আবিষ্কর্তা—এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। স্বার্থ-হীন কর্ম, ভালবাসা এবং কর্তব্য তাৎকালীক কোন সাহিত্যে পাওয়া যায় না বা ইতিপূর্বে আর কোন মহাপুরুষ এ প্রচার করেন নি। আর একটী বিষয় আমরা শ্রীকৃষ্ণের জীবনে পাই—গোপীদের প্রেম। যাদের জীবনে এ প্রকট হয়েছে তারা ছাড়া এই ঈশ্বরীর প্রেম অপর কেউ বুঝতে পারবে না। এই অদ্ভুত কর্মযোগ এবং গোপী-প্রেম ভগবান ব্যাস মহাভারত ও ভাগবতে লিপিবদ্ধ কোরে গেছেন। গোপী-প্রেম, ব্যাসের পুত্র পরমহংস অতি বিশুদ্ধ কুমার-যোগী শুকদেব প্রায়োপবেশনকারী পরীক্ষিতকে বলেছিলেন। ১।১২।৫২

॥ বিধান ॥

"বিধান" হচ্ছে সমজাতীয় বহু নিয়মের সংক্ষিপ্ত কল্পিত নাম। পরন্তু "বিধান" বলে বস্তুতঃ কোন পদার্থ নেই। আমরা এই শব্দটা ব্যবহার করি এই কর্মময় জগতের সমনিয়ত পূর্বাপর ঘটনাবলীর পরিবর্তে। এই বিধানকে যুক্তিহীন বিশ্বাসের ওপর স্থাপন করা উচিত নয়। এটা প্রত্যক্ষ এবং অবশ্যম্ভাবী ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে তবে তার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করা চলে। যেমন সরষের ভেতর ভূত থাকে, তেমনি যুক্তির ভেতরও ভুল থেকে যায়। এই ভুলকে জয় করবার যে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা, তাই আমাদের দেবতা করে। ব্যাধি যেমন শরীরের কোন একটা বিশৃঙ্খল ব্যাপার, যাকে আমাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাড়িয়ে বের করবার চেষ্টা করে, তেমনি আমাদের মধ্যে যে "পাপ-বোধের" অস্বস্তি, সেটা আমাদের ভেতরকার দেবত্বের সহিত, ঐ পশুটাকে বের করবার সংগ্রাম ক্লান্তি। ভ্রান্তিরূপ দুঃখ আসে বটে জীবনে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একটী অন্তর্নিহিত শক্তি তাকে জয় করবার জন্য উঠে পড়ে লাগে।—সেটী দৈবী-শক্তি। ২।১২।৫২

॥ ধ্যান ছবি ॥

বাবুরামের পিতৃ ভবন, ধুনির আগুন দাউ দাউ কোরে জ্বলছে, চারিপাশে জড় হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের নবীন সন্ন্যাসীর দল। ধুনির জ্যোতিতে দূরকে আরও গাঢ় অন্ধকার কোরেছে—উর্ধ্বে কালো আকাশের চন্দ্রাতপে রত্ন-কুচির কারুকার্য। চারিদিকে গ্রাম্য নিশার গভীর নিস্তব্ধতা ও প্রশান্তি ঝিম্ ঝিম্ করছে—সকলের চিত্ত ধ্যানমগ্ন। সহসা নরেন্দ্রের কণ্ঠস্বর সকলের হৃদয়ের শব্দহীন সুরকে জাগিয়ে তুললে "ঋষিকৃষ্ণে"র বিস্ময়কর জন্ম প্রহেলিকার কাহিনী দিয়ে। সকলের হৃদয় মেরীরই মতন সে আনন্দ বার্তাকে ধারণ করলে—সকলের হৃদয় "হোলি-গোষ্ঠে"র প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো—সকলের হৃদয়-গর্ভে ঈশ্বর জন্ম নিলেন মানবপুত্ররূপে—রক্ত মাংসের শরীরে ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান আবির্ভূত হলো। নরেন্দ্রের বাণী তাঁদের প্রদর্শন করালো নবাগত মহামানবের শৈশব, পথ প্রদর্শক হলো মিশরে, ফিরে এলো জেরুজেলামের

মন্দিরে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে, শোনালো অপূর্ব বিচার, দেখালো শিল্প সংগ্রহ। সকলে চমকে উঠলো, 'একি আজ যে রামকৃষ্ণের আমরাও সমবেত! আজ যে ক্রীস্‌মাস্ ইভ্!'—(রোমাঁরোলাঁর ভাষাচিত্রাবলম্বনে)। ৩।১২।৫২

॥ স্বাধীনতা ॥

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় জ্ঞানই যৌগিক, বিশ্লেষণ করলে জানতে পারবে। দ্বৈতবাদীরা মনে করে মন দেহ থেকে ভিন্ন, মৌলিক ও স্বাধীন। বই পড়ে দর্শন লাভ হয় না। যত পড়বে তত অপরের চিন্তায় মন ঘুলুবে। অগভীর দার্শনিকেরা মনটাকে মৌলিক ভাবে, তাই তারা ভাবে মন স্বাধীন। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক মন বিশ্লেষণ কোরে দেখায় যে সেটা যৌগিক। কাজেকাজেই প্রত্যেক যৌগিককেই বাইরের সাহায্যে একীভূত হয়ে থাকতে হবেই। সেই জন্য আমাদের 'ইচ্ছা' বাহ্য সাহায্য সাপেক্ষ। মানুষ খাবার ইচ্ছা করতে পারে না, যদি না ক্ষুধা পায়। ইচ্ছা বাসনার বশ। কিন্তু তথাপি আমরা মনে করি আমরা স্বাধীন। তা হলে এই সাপেক্ষ মন ও স্বাধীন সত্তা—দুটী কি? অজ্ঞেয়বাদীরা বলেন, স্বাধীনতার ধারণাটা ভ্রান্তি। তা হলে জগৎ প্রমাণ করে কে? কারণ আমরা সকলে এটাকে দেখছি, অনুভব করছি। কিন্তু আমাদের এই স্বাধীন ভাবটাও তো তাই—বিশ্বজনীন ঐক্য বোধ। স্বাধীনতা স্বীকার না করলে যুক্তির তো দাঁড়াবার স্থানই নেই। যুক্তি বলে অজ্ঞানের বন্ধন মানি না। আমি তা ধ্বংস করবই। যা স্বাধীন তা মৌলিক, অনপেক্ষ, অসীম এবং অনন্ত। প্রত্যেকের প্রচেষ্টা স্বাধীনতা লাভ। আনন্দের সন্ধান মানে দুঃখাত্মক প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। নৈতিকতা কী—না, প্রকৃতির দাসত্ব হতে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা। এগুলো হলো আমার স্বরূপের সম্পূর্ণতার প্রমাণ। ৪।১২।৫২

॥ নরলীলা ॥

ঠাকুর একদিন মণিলালকে বলছেন, 'হাত ভাঙার পর থেকে আমার একটা পরিবর্তন এসেছে, এখন নরলীলায় খুব আনন্দ পাই। নিত্য—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আর লীলা—বহু হয়ে খেলা;—কখন ঈশ্বরীয় ভাবে, কখন দেবতা হয়ে,

কখন মানুষ হয়ে, কখন বা জগৎ হয়ে। বৈষ্ণবচরণ বলতো, 'নরলীলায় বিশ্বাস হলে তবে ঠিক্‌ঠিক্ জ্ঞান হয়।' মানুষ কখন কখন ঈশ্বরীয় দর্শন পায়, তখন আনন্দ সাগরে ভাসে। যেমন হঠাৎ কোন প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হলে হয়। সে দিন বাবুরামকে দেখে ওমনি হলো।

শিব যখন নিজের স্বরূপ দেখেন, তখন আনন্দে নৃত্য করেন, আর বলেন, "ওগো! আমি কে! আমি কে!" নারদ রামচন্দ্রকে বল্লেন, "প্রভু! আপনিই সব পুরুষ এবং সীতা সব রমণী।" কুমারী পূজা করে কেন? সব নারীই মা জগদম্বা, কিন্তু কুমারীতে অধিক প্রকাশ। মা যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি। রাধাবাজারে ফটো তুলতে নিয়ে গেল, তার পর রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী যাওয়ার কথা। কেশব সেখানে আসবে। ঠিক্ করলুম, এই সব কথা তাকে বলব। কিন্তু গিয়ে সব ভুলে গেলুম। তখন বল্লুম, "তবে মা তুমিই বল, আমি আর কি বলবো"।' ৫।১২।৫২

॥ অনুলোম-বিলোম ॥

একদিন ঠাকুর ভক্তদের বলছেন, 'ভগবানই প্রভু, আবার তিনিই ভৃত্য। এই হলো ঠিক্‌ঠিক্ জ্ঞান। প্রথম বিচার, 'নেতি' 'নেতি',—ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা। তারপর সেই লোকই দেখে ঈশ্বরই মায়ায় জীব, জগৎ হয়ে আছেন। প্রথম 'নেতি', তারপর 'ইতি'। কিন্তু পুরাণ মত—বেল বলতে শাঁস, বীজ ও খোলা। খোলা, বীজ ফেলে শাঁস খেতে হয়। কিন্তু বাদ দিলে ওজনে কম পড়ে। সেইরূপ জীব, জগৎ বাদ দিয়ে সচ্চিদানন্দে পৌছতে হয়। সচ্চিদানন্দ লাভ হলে তখন বোঝা যায়, তিনিই জীব, জগৎ হয়ে রয়েছেন। শাঁস, বীজ, খোলার মূল সত্তা হলো এক—যেমন দুধ ও মাখন। সচ্চিদানন্দ এমন কঠিন হলেন কিরূপে? ঈশ্বরে সবই সম্ভব—দেখ শুক্র-শোণিত থেকে এতবড় মানুষ হচ্ছে। দেখ প্রলয়ে সর্বভূত আকাশে মিশে যায়। আবার সৃষ্টিকালে সেই আকাশে মহৎ ভেসে ওঠে, মহৎ হতে আবার অহংকার। একেই বলে সৃষ্টির অনুলোম-বিলোম, বিকাশ-সংকোচ। ভক্ত দুই-ই মানে—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আবার জীব, জগৎ, ঈশ্বর। জ্ঞানযোগী কিন্তু অখণ্ডে মিলে যায়, আর ফেরে না।' ৬।১২।৫২

॥ ভক্তের থাক্ ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলছেন, 'খণ্ডদর্শীরা ভগবানকে বিশিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করে। তিন রকমের ভক্ত—অধম বলে, "ভগবান কেবল স্বর্গে থাকেন।" মধ্যম বলে, "ভগবান হৃদয়ে বাস করেন।" কিন্তু উত্তম ভক্ত বলে, "হরিঃ অন্তর্বহিঃ।" নরেন আমাকে ঠাট্টা কোরে বলে, "তা হলে কি ঘটি ভগবান, বাটি ভগবান?" (শুনে সকলে হাসতে লাগলো)। তাঁকে দেখলে তবে সন্দেহ যায়, শোনা ও দেখা অনেক তফাৎ, শুনে ষোল আনা বিশ্বাস হয় না। মুখোমুখী দেখা চাই। দর্শন হলে আর বাহ্-পূজা থাকে না। দর্শনের পর আমার মন্দিরের পূজো শেষ হলো। মা দেখালেন—সব শুদ্ধ-ব্রহ্ম, পূজোর সাজ, বেদী, চৌকাঠ—সব শুদ্ধ-ব্রহ্ম, চিন্ময়—মানুষ, পশু, সব প্রাণী শুদ্ধ-ব্রহ্ম, চৈতন্যময়। তখন পাগলের মত চারিদিকে ফুল ছড়াতে লাগলুম। যা দেখি তাই পূজো করি। শিব পূজো করতে গিয়ে দেখি এই বিশ্বটা বিরাট শিব, অষ্ট মূর্তিতে ব্যপ্ত হয়ে রয়েছেন। শিব পূজো শেষ হলো। ফুলগুলো দেখি শিবের মাথায় তোড়া সাজান।' ৭।১২।৫২

॥ দর্শন ও কল্পনা ॥

ত্রৈলোক্য বল্লেন, "আহা শ্রীভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টি!" ঠাকুর বল্লেন, আরে আমার এ সব দর্শন, তোমাদের মত কেবল কথার কথা নয়। এ সব বিদ্যুতের মত আমার কাছে, দপ্ কোরে স্ফুরণ হলো। আমি এ সব হিসেব কোরে, ভেবে চিন্তে, কবির কথায় বলছি না—এ সব ঈশ্বর-সৃষ্ট নয়, এ সব ঈশ্বর স্বয়ং। তিনি দেখালেন সেই বিশ্বরূপে ফুলের গাছগুলো তোড়ার মত। আমার পুষ্পচয়ন শেষ হলো। আমি মানুষকেও এমনি ভাবে দেখি—সচ্চিদানন্দ সাগরে তুলোর বালিসের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসেভেসে বেড়াচ্ছে—ডুবছে, উঠছে। দেহটা ক্ষণিক, ভগবানই সত্য। দেহ এই আছে, এই নেই। একবার খুব পেটের অসুখে ভুগছি, হৃদয় বল্লে, "মামা একবার মাকে বল্লে হয় না।" আমি লজ্জায় বলতে পারলুম না, বল্লুম, "মা সুসাইটিতে যাদুঘরে মানুষের হাড়গোড়ের খাঁচা দেখেছিলুম, হাড়গুলো তার দিয়ে বেঁধেবেঁধে মানুষের কাঠামো তৈরী

করেছে। মা এই শরীরটা একটু জোড়া দিয়ে রাখ, তা হলে তোমার নাম গুণ কীর্তন করতে পারি। ৮।১২।৫২

॥ নিবেদিতা ॥

নিবেদিতা তো পরাজিতা হওয়ার মেয়ে নয়। দেখতে সুকুমারী কিন্তু এ যে সাক্ষাৎ অপরাজিতা, দিন রাত গুরুর সহিত তুমুল সংগ্রাম—সামাজিক, সাহিত্যিক, আর্টিষ্টিক, বৈজ্ঞানিক কোন বিষয়ে ন্যূন নয়—প্রমাণ করতে চায় প্রাচ্য অনুশীলন প্রতীচ্যের নীচেয়। সময় সময় গৈরিকাচ্ছাদিত অতি কোমল হৃদয়-কমলে কঠোর বজ্রের ন্যায় দুষ্ট আঘাত, তার সঙ্গিনীদেরও বিরক্ত কোরে তুলতো। দেখতে নবনীত তুষার মেঘের ন্যায়, কিন্তু তা হতে যে মেঘবিদ্যুতের স্ফুরণ হোত তা বিবেকানন্দের স্বচ্ছ নীল হৃদয়াকাশ ভিন্ন ধারণ করে কার সাধ্য! শ্রীরামকৃষ্ণকেও কি নরেন্দ্রনাথের এতটা রূঢ় আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল? কিন্তু বর্জন করবার যো নেই, শ্রীগুরু তো কেবল যোগই শিক্ষা দিয়েছেন, বিয়োগ তো শেখান নি। কিন্তু আজ আল্‌মোরায় শ্রীরামকৃষ্ণের সেই দৈববাণী সফল হবার দিন—"স্পর্শের দ্বারা নরেন জ্ঞান দান করবে"; যে শক্তি কোনকোন দুর্দান্ত সাধকের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝেমাঝে প্রকাশ করতেন। আজ স্বামী সকলকে বলছেন, "জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘনাইত হচ্ছে—অরণ্যের নিস্তব্ধতায় ফিরে যাব; যখন ফিরব, নিয়ে আসব শান্তি। আজ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ। প্রতিপদের চাঁদকে মুসলমানেরা বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে—নব জীবনের উদীয়মান প্রতীক।" এই বলে, ঐ বিদ্রোহী শিষ্যাটির মাথায় হাত দিলেন; তার অবশ অঙ্গ তাঁর পদ-তলে লুটিয়ে পড়ে মাথা নত করল,—এক মধুর সন্ধি স্থাপিত হলো। ব্যথা ও ক্ষত উপশমিত হলো বটে, গভীর অনন্ত মঙ্গলের শুভদর্শনে, কিন্তু গূঢ় কল্পনার ভ্রান্তিটুকু একেবারে চুরমার হয়ে পড়ে রইল—মার্গারেট্ মরলো, কিন্তু নিবেদিতার জন্ম হলো। ৯।১২।৫২

॥ শান্তি ॥

"দেখ মহা পরাক্রমে আসে অই ! অই !
মহাশক্তি, কিন্তু চঞ্চলতা নাহি কিছু তার।
দিশেহারা অন্ধকারে আলোক বর্তিকা পথে জ্বলে
ধাঁধান আলোকে যাহা স্নিগ্ধ ছায়া ঐ।"

—শ্রীবিবেকানন্দ

[লেখক কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের "Peace" নামক কবিতার অনুবাদ হইতে]। ১০।১২।৫২

॥ ধ্যান ছবি ॥

আজ লণ্ডনে রবিবার, দোকানপাট ব্যবসাবাণিজ্য এক রকম বন্ধ বললেই চলে ; রাস্তা ঠাণ্ডা, কারণ ভারী গাড়ীগুলির চলাচল খুব কম। লোকদের রবিবাসরীয় পরিচ্ছদ ও চাল চলন গম্ভীর, পোষাক ধূসর বর্ণের এবং সংযত ; অর্ধ নিস্তব্ধ পথিকেরা উপাসনা মন্দিরের দিকে চলেছে। আজ স্বামিজীকে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হবে,—যাঁর আগমনের জন্য তারা কত ভাব নিয়ে প্রতীক্ষা করেছিল। কারুশিল্পীদের জন্য উৎসর্গীকৃত 'হলো' আজ এ সম্মিলনী—দেয়ালে কত বিচিত্র ছবি টাঙান। পাম্, ফুল ও ফার্ণ দিয়ে প্ল্যাটফরম্ সাজান হয়েছে—সেখান থেকে ইংরেজের রাজধানীর লোকদের তিনি বিদায় বাণী শোনাবেন। সব রকমের ও স্তরের লোক সেখানে ছিল, কিন্তু সকল মনের একটা সাধারণ বাসনা, তাঁকে দেখা, তাঁর কথা শোনা, অথবা যদি সম্ভব হয় তাঁর পরিচ্ছদাংশ স্পর্শ করা। মধুর সঙ্গীত ধ্বনি, সম্মান ও প্রীতির অভিব্যক্তি, অনুমোদনের হর্ষধ্বনির মধ্যে কেহ কেহ নিস্তব্ধ, বিরহভারাক্রান্ত অশ্রুময় চক্ষু, বাহিরের ন্যায় ভিতরেও বিষাদের ছায়া। বিভিন্ন পোষাক পরিচ্ছদে, চারিপাশে ঘেরা, উজ্জ্বল পীতবর্ণের মানুষটী জীবন্ত সূর্য কিরণের মত চলেছেন ; হাস্য মুখে বলছেন, "হাঁ, হাঁ, আবার দেখা হবে।"—(এরিক্ হেমণ্ডের ভাষাচিত্রাবলম্বনে)। ১১।১২।৫২

॥ আবির্ভাব কালে ॥

পিপাসায় প্রাণ যায়, এমন সময় আমরা বিবেকানন্দের অমৃতময় বাণী শুনলুম। আমরা বহুদিন ধরে ধর্ম সম্বন্ধে অনিশ্চয় এবং হতাশ হয়েছিলুম, অর্ধ শতাব্দী ধরে ইউরোপের উৎকৃষ্ট মস্তিষ্কেরা এর কোন সমাধানই করতে পারেন নি। খৃষ্টধর্মের শুষ্ক বিধি-নিষেধে মন স্থির রাখা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এমন কোন যন্ত্রও আমাদের হাতে ছিল না যে ঐ বিধি-নিষেধের রূঢ় খোলাটা ভেঙে তার ভেতরকার সত্যের কোমল শাঁসটী আমরা বের কোরে নিতে পারি। কিন্তু বেদান্ত এসে সেই কাজটী করলো। তাদের সন্দিগ্ধ ধর্মকে যুক্তি ও গভীর দার্শনিক ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত করলো। এতকাল অন্ধকারে ঘুরে বেড়ান শেষ হলো, আলোকের সন্ধান পাওয়া গেল। স্বামিজীর গম্ভীর অভিব্যক্তি, "অহং ব্রহ্মাস্মি" খুব জানা কথা, কিন্তু আজ পর্যন্ত সাহস কোরে সর্বসমক্ষে বলা হয় নি। আর হলো মানবতার ঐক্য বিধান। তার লুকান তথ্যটীর যুক্তিও নিহিত ওখানে—আত্মার ঐক্য!—বিশ্বজনীন সেবা! অতীতে এমন নির্ভীকভাবে এ কখনও প্রচারিত হয় নি। নানা দ্বার দিয়ে এতদিনে আমরা একই ঈপ্সিত স্থানে পৌছুলুম।—(নিবেদিতার অভিজ্ঞান)। ১২।১২।৫২

॥ আত্মবিশ্বাস ॥

এ হলো প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, আত্মরক্ষার সংগ্রাম মানে আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করা। যেখানে জীবন সেখানেই সংগ্রাম, সেখানেই আত্মশক্তির অভিব্যক্তি। সমগ্র জাতির ইতিহাস পাঠ কোরে দেখ, এই হলো বিধান। শুধু আমাদের জাতিই প্রকৃতির স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছে, সেইজন্য আমরা জীবন্তের চাইতে মৃতই বেশী। আমরা যাদুগ্রস্ত। আজ হাজার বছর ধরে আমাদের বলা হচ্ছে আমরা দুর্বল, আমরা কিছু নই, আমরা কেউ নই—এই রকম সব নানা কথা। আর তাইতে আমাদের বিশ্বাস জন্মে গেছে। স্বামিজীর শরীরটাও আমাদের দেশে জন্মেছে, কিন্তু তিনি কখনও ঐ ধৃষ্ট মতে মত দেন নি। তিনি তাঁর আত্মায় প্রচণ্ড বিশ্বাসী ছিলেন। সেই জন্য যারা আমাদের হীন ও দুর্বল বলে ঘৃণা করে, তারাই তাঁকে তাদের শিক্ষক বলে

মানে। আমরাও যদি স্বাত্মায় বিশ্বাসী হই—যে আত্মা অনন্ত শক্তিমান, অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ, অনমনীয় তেজঃস্বরূপ, তা হলে তোমরাও তাঁকে অতিক্রম করতে পারবে। ১৩।১২।৫২

॥ সব একাকার ॥

প্রভু একবার বল্লেন, 'এমন অবস্থাও গেছে যে মাঝিরা রাঁধছে, যখন নবদ্বীপে বেড়াতে গেছি, সেখানে গিয়ে হাজির। মথুর বুঝতে পেরে ডেকে বল্লে, "বাবা, ওখানে কি করছ, চলে এসো, চলে এসো।" এখন কিন্তু বামুন এবং প্রসাদ ছাড়া খাবার জো নেই। কামারপুকুরে আমার খেলুড়ে চিনে শাঁখারীর পায় পড়ি আর কি—"ওরে হরি বল্, হরি বল্।" চিনে বল্লে, "তোর প্রথম ভক্তির তোড় এসেছে, তাই তুই একজনের সঙ্গে আর একজনকে ভেদ করতে পারছিস না।" চিনে ঠিক বলেছিল, প্রথম যখন প্রবল ঝড় ওঠে, ধুলোয় সব ঢেকে যায়, তখন আম গাছ, তেঁতুল গাছ চেনা যায় না।' একজন ভক্ত বল্লে, 'প্রভু! এইরূপ জ্ঞানোন্মাদ, প্রেমোন্মাদ আমাদের এলেই হয়েছে আর কি, সংসার ধর্মটর্ম সব চুলোয় যাবে।' প্রভু হেসে বল্লেন, 'দেখ, যোগী হলো দু রকমের—গুপ্তযোগী ও ব্যক্তযোগী। গুপ্তযোগীরা সংসারে থাকে, কিন্তু তারা ত্যাগ করে মনেমনে।' রাম দত্ত বল্লেন, 'প্রভু যেন আমাদের বোকা বোঝাচ্ছেন। গেরস্থ জ্ঞানী হতে পারে, কিন্তু কখনও বিজ্ঞানী হতে পারে না।' প্রভু হেসে বল্লেন, 'শেষে হবে বই কি। আগে থাকতে জোর করে কিছু করতে নেই।' ১৪।১২।৫২

॥ জপ ও ভক্তি ॥

প্রভু একবার মুখুজ্যেকে বলছেন, 'শুধু জপের দ্বারা ভগবান লাভ হয়। নির্জনে গোপনে বসে জপ করলে ঈশ্বর-কৃপা হয়, তখন দর্শনও হয়। যেমন গঙ্গা-গর্ভে বাহাদুরী কাঠ ডুবে আছে, ছেকোল দিয়ে বাঁধা ড্যাঙার সঙ্গে, এক একটা পাব ধরেধরে যদি নীচেয় যাও, তাহলে ঐ বাহাদুরী কাঠের স্পর্শ পাবে। পূজোর চাইতে জপ বড়, জপের চাইতে ধ্যান বড়, ধ্যানের চাইতে ভাব বড়, ভাবের চাইতে বড় মহাভাব বা প্রেম। শ্রীচৈতন্যের প্রেম হয়েছিল, প্রেম হলে

ভগবানকে বাঁধবার ডোর পাওয়া গেল। ভক্তি যখন তীব্র ও স্বাভাবিক হয় তখন তাকে বলে রাগানুগা। আর সাধারণ বিধি-নিষেধযুক্ত পূজা-পাঠাদি হলো বৈধী ভক্তি—এই এলো, এই চলে গেল। রাগভক্তি যেন পাতাল ফোঁড়া শিব, অনাদি লিঙ্গ কেউ মূল পায় না। বলে একেবারে কাশী গিয়ে ঠেকেছে। অবতার এবং অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গদের রাগ ভক্তি হয়—সাধারণের এ হওয়া বড় কঠিন। ১৫।১২।৫২

॥ রাধা-তত্ত্ব ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ এক পণ্ডিতকে বলছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ—রাধা প্রকৃতি, চিৎ শক্তি—আদ্যা শক্তি। রাধা প্রকৃতির সমবেত গুণত্রয়—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াবার সময় দেখবে প্রথম লাল কালোয় মেশান, তারপর কেবল লাল, তারপর একেবারে সাদা। বৈষ্ণবেরা রাধার তিনটী দিক্ স্বীকার করে—কাম-রাধা সম্ভোগাত্মিকা—(কৃষ্ণ আমার); প্রেমরাধা সেবাত্মিকা—(আমি তোমার); নিত্যরাধা—যোগমায়া, নন্দ দেখেছিলেন গোপাল কোলে। বেদান্তের ব্রহ্ম ও চিৎশক্তি একই, যেমন জল ও জলের শৈত্য। জল ভাবতে গেলেই শৈত্য, শৈত্য ভাবতে গেলেই জল। অথবা যেমন সাপ ও সাপের কুটীল গতি। একটাকে ছেড়ে আর একটা চিন্তা করা যায় না। আদিম সত্তা হলো ব্রহ্ম, তখন কর্ম বা কর্মেচ্ছা নেই। মানুষ যখন কাপড় পরে তখন সে উলঙ্গ অবস্থায় যা ছিল তা-ই থাকে। আগে উলঙ্গ ছিল, এখন মাত্র কাপড় পরেছে, এইমাত্র তফাৎ। কাপড় ছাড়াও সে থাকতে পারে। সাপে বিষ থাকে কিন্তু তাতে সাপের কিছু হয় না। ব্রহ্ম মায়াতে নির্লিপ্ত, কিন্তু জীব লিপ্ত। ১৬।১২।৫২

॥ বাধা ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ আমাদের একটী বাণী দিয়ে গেছেন, 'আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে সংসারের মধ্যে প্রকাশ করছি, যা আমাদের হাতে গড়া নয় এবং যা আমাদিকে পদেপদে কেবল বাধাই দেয়। যে পরিবেশ পেলে আমার জীবনের পূর্ণ বিকাশ হতে পারত সেরূপ আয়োজন কোন দিকেই নেই। সুতরাং এই

যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্ব অনিবার্য। কারোকারো জীবনে সেই দ্বন্দ্বটাই কেবল চোখে পড়ে এবং সে কেবল বেসুরই বাজিয়ে তোলে। আবার কোন কোন গুণী সংসারের এই অপরিত্যজ্য দ্বন্দ্বের মধ্যেই সংগীতের ঐক্যতান সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁর সমস্ত অভাব ও ব্যাঘাতের মধ্যেই সৌন্দর্য রক্ষা করেন। মঙ্গলই সেই সৌন্দর্য। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে তাঁদের অপ্রতিহত স্বাধীনতা বিকাশের পথে যে ক্ষতির অভিজ্ঞান, মঙ্গল তার চেয়ে অনেক বেশী পূরণ কোরে দেয়। বস্তুতঃ দ্বন্দ্বের বাধাই মঙ্গলের সৌন্দর্যকে বিকশিত করবার অবকাশ দেয় —এ সংগ্রামে স্বার্থের ক্ষতিই ক্ষতিপূরণের প্রধান উপায় হয়ে ওঠে।' ১৭।১২।৫২

।। প্রাচীন প্রথা ।।

সব ধর্ম খুঁজে দেখ, যা কিছু পুরাতন সব পবিত্র। আমাদের ঋষিরা ভূর্জ পত্রে লিখতেন, তারপর কাগজ বার হলো, কিন্তু ভূর্জ পত্রের মত পবিত্র নয়। অতি প্রাচীন কালে ঋষিরা পূজার বাসনকোসন ব্যবহার করতেন, কিন্তু এখন অনেক উন্নত ধরণের বাসন সৃষ্টি হয়েছে বটে, তা হলেও পূজোর সাজের বাসনের মত পবিত্র নয়। দশ হাজার বছর পূর্বে কাঠেকাঠে ঘসে আগুন বের করা হোত, তাই এখনও যজ্ঞে অরণি কাষ্ঠের আগুন অতি পবিত্র বলে গৃহীত—তা যতই ভাল দিয়াশলাই বেরুক। ভারতের আর্য জাতির মধ্যেও ঐ একই প্রবৃত্তি। বিদ্যুৎ বজ্রাগ্নি অতি পবিত্র—হিব্রুরা বলে। তারা পার্চমেণ্টে লিখত, এখন কাগজ বেরুলেও পার্চমেণ্ট অতি পবিত্র। আমাদের যেমন তাল-পাতার পুঁথি। ধর্মের যা কিছু বিধি-নিষেধ আজ পবিত্র বলে আমরা গ্রহণ কোরে থাকি, সবই প্রাচীন বলে। বিজ্ঞান নানা রহস্য উদ্ঘোটন করলেও তদনুকূল সমাজ আমাদের গড়তে সাহস হয় না, প্রাচীন আচার পদ্ধতি বাধা-প্রাপ্ত হবে বলে। ১৮।১২।৫২

।। ভারতের সুর ।।

মন-মাতুরায় স্বামিজী বললেন, 'আমার পাশ্চাত্যে এই সামান্য কাজ দেখেই তোমরা আমাকে এত অনুধাবন ও প্রশংসা করছ, কিন্তু যে সব মহাত্মারা

ভবিষ্যতে আসবেন তাদের বিষয় চিন্তা করেছ কি? আমার সামান্য কাজে তোমাদের এত প্রশংসা, কিন্তু ভবিষ্যতে যে সব আধ্যাত্মিক মহামানব এবং পৃথিবী কম্পনকারীদের আগমন হবে, তাদের বেলায় তোমরা কি করবে? ভারত ধর্ম ভূমি; হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। শতশত বর্ষের ঐ একই রূপ আধ্যাত্মিক শিক্ষাই তাদের এইরূপ করেছে, তারা শিক্ষা বলতে একমাত্র ধর্মই বোঝে। সব জাতের কেবল একটাই মাত্র কর্তব্য নেই। প্রত্যেককেই কি দোকানদার হতে হবে? না প্রত্যেককেই মাষ্টারী করতে হবে? না, সব জাতই পরস্পর কেবল লড়াই করবে? পৃথিবীতে সর্ব জাতির কর্মের সমন্বয় দরকার। ভগবান মনুষ্য জীবনীর 'অরকেষ্ট্রা'তে ভারতকে কেবল আধ্যাত্মিক সুরটাই বাজাবার ভার দিয়েছেন। এ আমি বেশ বুঝতে পারছি।' ১৯।১২।৫২

।। ভারতের ধর্ম-প্রতীক ।।

বিবেকানন্দকে প্রশংসা মানে, কোনও ব্যক্তিকে ভারত ভারতী তার হৃদয়ের পূজোপহার দেয় নি। তারা পূজো করেছে তাদের সনাতন ধর্মকে। রবীন্দ্রনাথের গানে বা মহাত্মা গান্ধীর কর্মে যদি তারা ধর্মের সন্ধান না পেত তা হলে তারা তাঁদের উপেক্ষাই কোরত। তাদের এই শ্রদ্ধাভারাবনত হৃদয়গুলির বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায় তাদের আদর্শ কী এবং সেই আদর্শটী এখনও তাদের গভীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই ভারতবর্ষ এখনও বেঁচে আছে--মরি মরি কোরেও বেঁচে আছে; দেখছ না জীবনস্পন্দন ক্রমেই বেড়ে উঠছে—যেই তার মহাপুরুষরা তার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক খাদ্য তাদের মুখে ধরে দিচ্ছেন। সব জাতের সব ব্যক্তির এক খাদ্য নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে তার উপযুক্ত খাদ্য ও কর্মের আবেষ্টনী দিলেই অমনি সে জেগে উঠবে। স্থলপদ্ম ও গন্ধরাজদের দেখনি, উপযুক্ত খাদ্য ও আবেষ্টনী পেলেই তারা সর্ব ঋতুতে পুষ্পের ভেতর দিয়ে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করে? ২০।১২।৫২

।। বুদ্ধত্ব ।।

বুদ্ধের জন্মও যেমন মহত্ব পূর্ণ, মৃত্যুও তেমনি। মৃত্যুর পূর্বে অতি নীচ জাতির অন্নও তিনি উপেক্ষা কোরতে পারলেন না—বুদ্ধত্ব তো তার মধ্যেও রয়েছে—

শিষ্যদের নিষেধ করলেন, কিন্তু নিজে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। বল্লেন, "চুন্দকে বল গিয়ে যে সে তার খাদ্য দিয়ে আমাকে এই দেহ-কারাগার থেকে অব্যাহতি দিলে।" বৃদ্ধ বহুদূর থেকে তাঁর কৃপার জন্য এসেছে জেনে তিনি পরিনির্বাণের পথে অপেক্ষা করলেন, তাকে উপদেশ করবার জন্য। আনন্দ কাঁদছে দেখে বল্লেন, "একি! এই কি আমার শিক্ষার ফল! কোন মিথ্যা বন্ধন রেখো না, আমার ওপর কিছুর জন্য নির্ভর করো না; ব্যক্তি অনিত্য, তাকে সম্মান দেখিয়ে কি হবে? বুদ্ধ ব্যক্তি নয়, বুদ্ধ এক অনাদি অনন্ত অনুভূতি। আনন্দ, নিজের মুক্তি নিজে সাধন না করলে, কেউ তোমাকে বুদ্ধত্ব এনে দিতে পারবে না।" ২১।১২।৫২

।। বিজ্ঞান ।।

কেশবচন্দ্র তাঁর ভারতবর্ষীয় ভাইদের সম্বোধন করে লিখেছিলেন (১৮৮০)—'অন্ধ বিশ্বাসীদের মত সব কিছু বিশ্বাস কোরো না। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে বিজ্ঞানই আমাদের ধর্ম হয়। সব চাইতে বিজ্ঞানের সম্মান করা উচিত। জড় বিজ্ঞানকে বেদের চাইতে বড় মনে করবে, আত্মবিজ্ঞানকে বাইবেলের চাইতে বড় মনে করবে। আজ জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, শরীর বিজ্ঞান, উদ্ভিদ ও রসায়ণ শাস্ত্র প্রকৃতির অধীশ্বরের জীবন্ত ধর্মগ্রন্থ। দর্শন, ন্যায়, শীল-শাস্ত্র, যোগ, ভাব-ভক্তি ও প্রার্থনা আত্মাধীশ্বরের জীবন্ত বেদ। নববিধানে সবই বিজ্ঞান সম্মত হওয়া চাই। রাহস্যিক বিদ্যা দিয়ে বুদ্ধি-বিবেকের জগৎকে ঝাপসা কোরে ফেল না। স্বপ্ন কল্পনার নেশায় নিজেকে মশগুল কোরে রেখ না। স্বচ্ছ দৃষ্টি ও দৃঢ় প্রমাণ দ্বারা সব জিনিষ পরখ কোরে নাও এবং যা একবার সত্য বলে পরিচিত হয়েছে, তাকে দৃঢ় ভাবে ধরে থাক; তোমাদের সমস্ত বিশ্বাস ও প্রার্থনা, দর্শন ও যুক্তি সমবেত ভাবে পরস্পরের পুষ্টি বিধান পূর্বক একটা যথার্থ বিজ্ঞানে সমন্বিত হোক। ২২।১২।৫২

।। বুদ্ধি ।।

অনেক সময় বলা হয় বুদ্ধি সেরূপ বলবান নয় যে জগৎ রহস্য ভেদ কোরে সত্য আবিষ্কার করবে। যুক্তির সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই ভুলে পরিপূর্ণ, সেইজন্য

সংঘকর্তাদের মানা উচিত। ক্যাথলিক্ প্রভৃতি সব সংঘকর্তাদের এক রা। কিন্তু এর মধ্যে কোন অনুভূতি খুঁজে পাওয়া যায় না। বুদ্ধি যদি দুর্বল হয়, তা হলে সংঘকর্তারা তো আরও দুর্বল, কাজেকাজেই তাঁদের সাহায্য নেওয়া অপেক্ষা বুদ্ধিকে ধরে থাকাই ভাল। তার দুর্বলতা সত্ত্বেও সত্য লাভের আশা তবু একটু রইল। আমাদের বুদ্ধির অনুসরণ করাই ভাল এবং যাঁরা তার অনুসরণকারী তাদের সহানুভূতি দেখানই ভাল, তা তাদের কোনরূপ সঠিক সিদ্ধান্ত না থাকলেও বরং নাস্তিক হওয়া ভাল তবুও অসংখ্য কুসংস্কারকে দেবতা বলে স্বীকার করা উচিত নয়। আমাদের উদ্দেশ্য জীবনের প্রগতি। কেবল মতবাদ মুখস্থ কোরে কে কবে জীবনকে উচ্চস্তরে নিয়ে গিয়েছে? অনুভূতিতেই শক্তি নিহিত এবং সেই অনুভূতি আমাদের আন্তর চিন্তা প্রসূত। ২৩।১২।৫২

।। মহাপ্রস্থানের পথে স্বামিজী ।।

আমার জন্ম বর্ষে (১৮৯১, ১৭ই ফেব্রুয়ারী) ভারত এক গভীর হতে গভীরতম আত্মার সংসার হতে মহাপ্রস্থান ("Great Departure"—Romain Rolland) দর্শন করেছিল। দিল্লীতে সারদানন্দ, কৃপানন্দ, অখণ্ডানন্দের চোখের সামনে থেকে নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ অন্তর্ধান হলেন। তখনও বিবেকানন্দ কে তা কেউ জানে না। রত্ন কুড়াবার জন্য এ ডুবুরী ভারতের জ্ঞান সাগরে ডুব দিলেন, উপরের লহরী-ক্রীড়া তাঁর আর কোন চিহ্নই রাখল না। তিনি ডুব দিলেন জয় কালী বলে, এই ভারত জনমহাসাগরের অগাধ জলে। মাঝে মাঝে যে তার দু চারটে ফুট দেখা যেতে লাগলো তা মাত্র সাধারণ একটা গেরুয়াধারী ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই গভীর জলের মৎস্যটীর সহিত ঐরূপ অপর কোন জলজীবীর সাক্ষাৎ হলেই, তাঁর চোখের দীপ্তিতে স্তম্ভিত হয়ে তাঁকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হোত। এই অজ্ঞাতবাসের চীবর ছিল তাঁর দুখানি—বহির্বাস-সেবা এবং অঙ্গবাস-স্বাধীনতা,—পরিকল্পনাহীন, জাতিহীন, গৃহহীন,—একমাত্র সাথী, তাও অলক্ষ্যে—প্রিয়তম গুরুদেব। কিন্তু তবুও দুঃখিত, বাসনা-ক্লান্ত, দুষ্টকর্ম, দুর্দশাগ্রস্ত, জরাক্রান্ত ধনী ও গরীবের গায়ের হাওয়া ক্রমাগত তাঁকে উৎপীড়িত করত। জীবনবেদ তাঁর কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁর গুরুকে মা ভবতারিণী যা স্বপ্নের মত, একটা প্রতীকের মত, পঞ্চবটীতে

দেখিয়ে ছিলেন—অনন্ত কোটি দুঃখাবনত মুখ—পঞ্চভূতের ফাঁদে ক্রন্দনশীল ব্রহ্ম—ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ; সেই চিত্র তাঁরও সামনে উপস্থিত হলো। তখন তাঁর অবস্থা নিবাত-কবচ-যুদ্ধে অর্জুনের মত, স্বর্গ-সৌন্দর্য দর্শন করতে গিয়ে আবির্ভূত হলো অজ্ঞান, দারিদ্র্য, ব্যাধিরূপ মহাসুর—ভারতীয় স্বর্গ গ্রাসের জন্য উদ্যতাস্ত্র। ২৪।১২।৫২

॥ মানুষ ॥

কতক্ষণ মানুষকে মননশীল বলব, যতক্ষণ সে বাহ্য ও আন্তর জগতে আধিপত্যের চেষ্টা করছে। কি ভাবে ? স্থূল ও সূক্ষ্ম শক্তিগুলি আয়ত্বের দ্বারা। মনোঽণুর শক্তিই হচ্ছে বাহ্য স্থূল ক্রিয়ার তাৎপর্য। বাহ্যকে নিয়মিত করা খুব বাহাদুরী, কিন্তু অন্তর নিয়মন আরও কঠিন। চন্দ্র সূর্যের গতির নিয়মাবলী জানা খুব শক্তিশালী মনের কাজ, কিন্তু চিত্তের সংযম ও অসংযমের নিয়মাবলী জানা আরও আরও কঠিন। এ হলো ধর্মের এলাকা। কিন্তু অসুর যে দেবতাকে বধ করতে চায়—অধিভূত যে অধিদৈবকে নিপীড়িত কোরে অধ্যাত্মকে নিগড়াবদ্ধ করতে চায়। জগতে একটীর অপরটীর ওপর মাঝে মাঝে প্রাধান্য দেখা যায় বটে, কিন্তু একটীর অপরটিকে নিঃশেষিত করবার ক্ষমতা ভগবান কোন কালে কাকেও দেন নি। দেখা যায় অতি বলশালী নিষ্ঠুরেও হঠাৎ হত্যাকর্মে দয়া এসে দেখা দেয়, ঈশ্বরেচ্ছায়। ২৫।১২।৫২

॥ বুদ্ধি ও বোধি ॥

স্বামিজী বুদ্ধিকে ভূতবিজ্ঞান বা 'সাইন্‌সে'র কোঠাতেই রাখতে চান। কিন্তু তাঁর বোধি হচ্ছে ভূতবিজ্ঞানের এলাকার বাইরে। কারণ ভূতবিজ্ঞানের জ্ঞান তো পাঁচটা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি পর্যন্ত, কিন্তু ইন্দ্রিয় বিলীন হলে বোধি স্বয়ম্প্রভ বিদ্যুতের ন্যায় চম্‌কিয়ে ওঠে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ দুটোর মধ্যে কোন ব্যবধান স্বীকার করেন নি, কারণ তাঁর বোধি—বুদ্ধিরই আরও সূক্ষ্মরূপ। কাজে কাজেই বুদ্ধ ও বিবেকানন্দের নির্বিকল্পের কারণ এটাকে বলা যায় কি ? অরবিন্দ বলছেন, "প্রতীয়মান সত্যের নিকট পদানত হওয়াই ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক বুদ্ধির

দোষ—সেগুলোর অন্তর্দেশে হাতিয়ার চালিয়ে বিশ্লেষণ করতে তথাকথিত বিজ্ঞান ভয় পায়। বিজ্ঞানের প্রতীয়মান বর্তমান রহস্যটা উহার অন্তর্দেশীয় বোধি-রূপ রহস্যেরই প্রতীক।" কাজে কাজেই তাঁর মতে 'বুদ্ধি ও বোধি'—এ দুটোর মধ্যে ব্যবধান নেই, যেন দুটো প্রতীয়মান মেঝের একটা ছাত। একই জ্ঞান-নদীর তরঙ্গের সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা। কিন্তু বোধি আমাদের চিত্তের যাবতীয় সূক্ষ্মানুভূতির পশ্চাতে; বুদ্ধির খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়—এ জ্ঞান ও অজ্ঞান, সত্য ও অসত্য, বিদ্যা ও অবিদ্যার মাঝামাঝি একটা জায়গা বা অবস্থা, যেখান থেকে অজ্ঞেয়ের খবর পাওয়া যায়। যে খবরগুলিকে বুদ্ধির সহকারীরা পরে বাস্তবের সঙ্গে খতিয়ে দেখে;—তখন তাদের সত্যগুলিকে কখন সম্ভব আবার কখনও বা অসম্ভব বলে বোধ হয়। বোধি ও বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রায় আত্মার সমকক্ষ, কিন্তু এখনও নির্গুণে গলে যায় নি। কারণ এখনও একটু বলাবলির মধ্যে আছে। ২৬।১২।৫২

॥ মন্ত্র দেওয়া ও নেওয়া ॥

একদিন মা বল্লেন, 'মন্ত্রের দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়। বৈকুণ্ঠে একদিন নারদ চলে গেলে ঠাকুর লক্ষ্মীকে বল্লেন, "ওখানটা গোবর দাও।" লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন? নারদ এত ভক্ত!" ঠাকুর বল্লেন, "ও এখনও মন্ত্র নেয় নি; এখনও ওর দেহ শুদ্ধ হয় নি।" বৈষ্ণবেরা মন্ত্র দিয়ে বলে, "এখন মন তোর।" "মানুষগুরু মন্ত্র দেয় কানে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।" মন্ত্রের সহিত ইষ্টের, হৃদয়ে আবির্ভাব ঘটে। এ মানতেই হবে। মন শুদ্ধ না হলে কিছুই হলো না। ইষ্টের আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গে মন শুদ্ধ হতে থাকে। "গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া হলো, একের দয়া বিনে জীব ছারে খারে গেল।"—একের কি? না, মনের।' মানুষগুরুর মন্ত্র বড় জোর দেহটা শুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু জগদ্-গুরুর মন্ত্র প্রাণে—সে মন্ত্র চিত্ত শুদ্ধি করে, জীবের তত্ত্বজ্ঞান বুদ্ধিতে স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তখন ভক্ত ভগবানের আকর্ষণ অনুভব করে। খৃষ্টানরা একে "পবিত্রাত্মা" বলে, অর্থাৎ ঈশ্বর-কৃপার অবতরণ। শ্রীশ্রীমা আবার বলতেন, 'মন্ত্রের মধ্য দিয়ে গুরু হতে শিষ্যে শক্তি যায়, যেমন এক পূর্ণ কুম্ভ হতে আর এক খালি কুম্ভে জল ঢালা। আবার শিষ্যের দোষগুণ গুরুকে আশ্রয় করে—শিষ্যের পাপ নিতে

হয় তাই এত ব্যাধি। রাখাল সেইজন্য যাকেতাকে মন্ত্র দিতে চায় না।' আবার বলতেন, 'শিক্ষাগুরু অনেক হয়, কিন্তু দীক্ষাগুরু বদলাতে নেই।' ২৭।১২।৫২

।। মনের উচ্চউচ্চ ভূমি ।।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, 'বেদান্তের সপ্তম ভূমি এবং তন্ত্রের ষট্‌চক্রে অনেক মিল আছে। বেদের প্রথম তিনটি ভূমি—অভ্যাসরূপিনী শুভেচ্ছা, বিচারণা এবং সাঙ্গ ভাবনা বা তনুমানসা। এগুলিকে তন্ত্রের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান এবং মণিপুর চক্রের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। সাধারণের সংস্কারশক্তি এই পর্যন্ত ওঠা নামা করে—লিঙ্গ, নাভি, গুহ্য। মনঃশক্তি যখন চতুর্থভূমি বিলাসিনী বা সত্ত্বাপত্তি অর্থাৎ অনাহত চক্রে ওঠে, তখন জীব নিজের সূক্ষ্ম শরীর প্রত্যক্ষ করে, ঠিক প্রজ্বলিত দীপশিখার মত; তা ছাড়া বিচিত্র আলোক দর্শন করে, আর বলে, "একি! একি!" তারপর মন যখন পঞ্চম ভূমি, শুদ্ধ-সম্বিৎ বা অসংশক্তি অর্থাৎ কণ্ঠে বিশুদ্ধ-চক্রে ওঠে, তখন সাধকের ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। তারপর হলো ষষ্ঠ ভূমি অসংবেদনা বা পদার্থ-ভাবনা অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র—এখান থেকে ব্রহ্মদর্শন হয়, কিন্তু তবুও কাচের মত একটা স্বচ্ছ ব্যবধান থাকে, ছুঁই ছুঁই কিন্তু ছুঁতে পারা যায় না। মহাভারতের সময়কার জনক রাজা ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করতেন পঞ্চমভূমি থেকে, আবার কখনকখন ষষ্ঠ ভূমিতেও থাকতেন। তারপর সপ্তম ভূমি অর্থাৎ তুর্যগা বা উপশান্তা, যাকে তন্ত্রে সহস্রার-চক্র বলে। জীব এখানে ব্রহ্মলীন হয়—এই হলো অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—এখানে দেহজ্ঞান থাকে না, বাহ্য জগৎ থাকে না, বহুত্ব বিলয় পায়, এখানে বুদ্ধির নাশ হয়। তারপর তুর্যাতীতা নির্বিকল্প ভূমি বা নির্বাণরূপিণী—বলা-কওয়া, দেখা-শুনা, মাপা-যোকার বাইরে।' ২৮।১২।৫২

।। ঈশ্বর সম্ভোগ ।।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের অবস্থা বোঝাবার জন্য চৈতন্যদেবকে অনেক সময় নির্দেশ করতেন—'চৈতন্যদেব মনের তিনটে অবস্থায় ঈশ্বর সম্ভোগ করতেন।

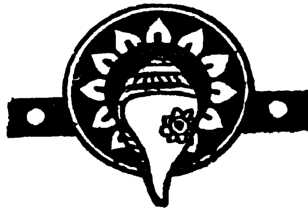
প্রথম জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-জ্ঞানভূমি—স্থূল ও সূক্ষ্ম। দ্বিতীয় অর্ধবাহ্য দশা—যখন তাঁর মন কারণ শরীর আশ্রয় কোরে ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হোত। তৃতীয় আন্তর দশা—মন তখন মহাকারণে বিলয় হোত। বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গেও এর সামঞ্জস্য আছে—স্থূল শরীর হ'লো অন্নময়, প্রাণময় কোষ; সূক্ষ্ম শরীর—মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ, কারণ শরীর—আনন্দময় কোষ। পঞ্চ কোষের বাইরে মহাকারণ। শ্রীচৈতন্যের মন যখন এখানে ডুবতো তখন তাঁর অসম্প্রজ্ঞাত, নির্বিকল্প বা জড় সমাধি হোত। বাহ্যদশায় তিনি ভগবানের নাম ও উপদেশ করতেন, অর্ধবাহ্যদশায় ভক্তসঙ্গে নৃত্য করতেন এবং আন্তর দশায় সমাধিতে মুহ্যমান হয়ে থাকতেন। শ্রীচৈতন্য প্রেমাবতার, কি কোরে ভগবানকে ভালবাসতে হয়, শেখাবার জন্য পৃথিবীতে আসা। ভক্তি হলেই হলো—হঠযোগের দরকার করে না।' ২৯।১২।৫২

।। হঠযোগ ও রাজযোগ ।।

বেলঘরের এক গায়ক কুণ্ডলিনী জাগরণের গান গাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, 'যোগ দু রকমের—হঠযোগ ও রাজযোগ। হঠযোগী কেবল স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের কসরৎ করে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অলৌকিক শক্তিলাভ, দীর্ঘায়ু এবং অষ্টসিদ্ধি। কিন্তু রাজযোগীর উদ্দেশ্য ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য। এদের মধ্যে রাজযোগই ভাল। হঠযোগীরা দেহ নিয়েই ব্যস্ত—নেতি, ধৌতি, আসন, প্রাণায়াম, জিহ্বার কসরৎ। একটা যাদুকর আসনের কসরৎ দেখাতে দেখাতে তার জিবটা তালুতে ঢুকে গেল এবং তখনই তার শরীরটা স্থির হয়ে গেল। লোকে মরে গেছে ভেবে তাকে গোর দিলে। অনেকদিন পর গোরটা ভেঙে পড়ায় এবং তার জিবটা খুলে যাওয়ায় তার জ্ঞান ফিরে এলো, আর সে বলতে লাগলো, "লাগ্ ভেল্কি, লাগ্ ভেল্কি।"—এ সব প্রাণের খেলা। বেদান্তীরা হঠযোগ নেয় না, রাজযোগ অভ্যাস করে অর্থাৎ কি কোরে জ্ঞান-ভক্তি সহায়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ সাধিত হয়। কলিতে অন্নগত প্রাণ, হঠযোগ দ্বারা শরীর ঠিক কোরে, তারপর রাজযোগ। অত সময় কোথায়! কলির জীব।' ৩০।১২।৫২

॥ কর্মযোগ ও মনোযোগ ॥

একদিন প্রভু মণিলালকে বলছেন, দুটো রাস্তা,—কর্মযোগ ও মনোযোগ। গেরস্থরা সংসারের যাবতীয় কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে ফল সমর্পণ পূর্বক অনাসক্ত ভাবে। সন্ন্যাসীদের সর্ব গার্হস্থ্য কর্ম ত্যাগ, তবে তাদেরও নিষ্কামকর্ম প্রথম অবস্থায় থাকে, যেমন দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ, ভিক্ষাগ্রহণ, তীর্থভ্রমণ, ঈশ্বরের পূজা, জপ ইত্যাদি। যে কোন কর্মই হোক যদি অনাসক্ত ভাবে করা যায় তা হলে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে জ্ঞান ভক্তির যোগ্যতা লাভ কোরবে ও ঈশ্বর দর্শন কোরবে। কিন্তু এ সবও অন্তরঙ্গ কর্মযোগ। এর পর হলো মনোযোগ—এ যোগীদের সাধনের কোন চিহ্ন কেউ কখনও দেখতে পায় না। এঁদের ভেতরে ভেতরে পরমাত্মায় জীবাত্মায় সংযোগ হয়, যেমন জড় ভরত, শুকদেব। তারা চুল দাড়ি কামায় না। কিন্তু ভক্তি-যোগেও সব সিদ্ধ হয়, আপনা আপনি কুম্ভক হয়। মন সংযোগ হলেই প্রাণায়াম হয়। আবার প্রাণায়াম হলেই মন স্থির হয়। আমি মাকে কেঁদে কেঁদে বলেছিলুম, "যোগীরা জ্ঞানীরা যা অনুভব করে, তা আমাকে করিয়ে দাও।" মা বেদ বেদান্ত পুরাণ ও তন্ত্রের সিদ্ধান্ত সব জানিয়ে দিয়েছেন। ৩১।১২।৫২



ওঁ নমো ব্রহ্মাদিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসংপ্রদায়কর্ত্তৃভ্যো বংশঋষিভ্যো মহদ্ভ্যো নমো গুরুভ্যঃ।

উপাসনা

অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃৎ অগময়েতি।   বৃঃ উঃ ১।৩।২৮
আবিরাবীর্ম এধি ॥—ঋগ্বেদীয় শান্তি পাঠ
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ শ্বেঃ উঃ ৪।২১

দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি

উপাসনা

।। প্রার্থনা ।।

পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ আমাদের এমনি ভাবে প্রার্থনা করতে শেখাতেন, 'জয় প্রভু! জয় প্রভু! জয় প্রভু! জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! জয় মা আনন্দময়ী তারা ব্রহ্মময়ী! জয় ভগবান! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গঙ্গা, গীতা, গুরু, গোবিন্দ! হে প্রভু! তুমি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ঈশ্বর! বিধাতা! তুমি সকলের অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ বিচারক! তুমি কর্মফল বিধাতা, মহান্যায়বান! সকল হৃদয়ের ইচ্ছা ও কর্ম তুমি সব জান, তোমাকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না; কিন্তু তথাপি তুমি দয়াময়! অনন্ত তোমার ধৈর্য, অনন্ত তোমার স্থৈর্য, অনন্ত তোমার ক্ষমা। প্রভু! আমায় ক্ষমা কর, আমার দুর্বলতা নাশ কর। আমার চিত্ত অকামহত কর, আমার কার্য তোমার সেবাতে পূর্ণ হোক। জয় প্রভু! জয় প্রভু! জয় প্রভু! জয় রামকৃষ্ণ!' ১।১।৫২

।। প্রার্থনা ।।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ! জয় ভগবান! হে সচ্চিদানন্দ সূর্য! আমাদের জীবন আলোকিত কর। আমাদের মনের কোণের সকল অন্ধকার দূর কর। আমাদের চিত্ত জ্ঞানময় হোক, প্রেমময় হোক। হে হৃদয়মন্দিরের আরাধ্যতম দেবতা! আমাদের সতর্ক হবার সামর্থ্য দাও, যেন ষড় রিপুর কোনটাই আমাদের হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ না করে। আমাদের জ্ঞান-নয়ন যেন সদা সতর্ক প্রহরীর ন্যায় জাগ্রত থাকে। হে হৃদয়ের আরাধ্যতম! তোমাকে যেন আমরা নিত্য পূজা করতে, স্মরণ করতে, তোমার নিকট প্রার্থনা করতে, তোমার পবিত্র নাম জপ করতে না ভুলি। হে ব্রহ্মণ্! তুমিই আমার আত্মারূপী। অহমিকার

কলুষ হতে আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ কোরে, আমাকে সম্পূর্ণ তোমার কোরে নাও। জয় প্রভু রামকৃষ্ণ! ২।১।৫২

।। প্রার্থনা ।।

জয় মা! জয় মা আনন্দময়ী! মা তোমার আশীর্বাদে আমাদের চিত্ত দৃঢ় হোক। সুখে দুঃখে তোমার উপদেশে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি। তুমি বলেছিলে, "শ্রীহরি যখন যে অবস্থায় রাখেন, তখন সেই অবস্থায়ই স্থির থাকতে হয়।" মা তোমার কৃপায় যেন হৃদয়ে তোমার অমৃতময়ী বাণীতে অটল বিশ্বাস আসে। তুমিই তো মা জীব চিত্তে বুদ্ধিরূপে সদ্‌বুদ্ধি দাও আবার ভ্রান্তিরূপে তাকে নানা বিপাকে ফেল। মা পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া বড় কঠিন, তুমি নিরাপদে আমাকে চালিত কর। আমি যেন তোমার পদতরী অবলম্বনে অনায়াসে এই ভবসাগর পার হয়ে যাই। জয় মা আনন্দময়ী! তোমার জয় হোক! ৩।১।৫২

।। আত্মনিবেদন ।।

তুমি মধুর! তুমি মধুর! তোমার সকলই মধুর! তোমার চলন মধুর! তোমার বোলন মধুর! আমার পরাণ বঁধু! হে প্রভু! আমার দেহ মন প্রাণ তোমাময় হোক। হে আমার সর্বস্ব, আমার যা কিছু অণু পরমাণু, আমার যা কিছু আকূতি, বিনতি, প্রার্থনা, আমার যা কিছু আনন্দ, চাওয়া পাওয়া সব তোমারি দিকে ব্যাকুল হয়ে নিরন্তর ধাবিত হোক। হে দেব! হে দয়াময়! আর আমায় ভুলে থেক না। "দেই তুলসী তিল দেহ সমরপিনু দয়া জনু ন ছোড়বি মোঁহে।" হে প্রভু! তুমি আমায় ধর, তোমায় তো কেউ কখন ধরতে পারে নি। তুমি সদাই আমায় ধরে থাক, আমিও যেন তোমায় না ছাড়ি। ৪।১।৫২

।। প্রার্থনা ।।

জয় মা! আনন্দময়ি তারা ব্রহ্মময়ি! "আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"—ধর্ম থাকলেই অধর্ম আছে। মা! আমায় ধর্মাধর্মের পারে

নিয়ে চল, তোমার আনন্দময়ী মূর্তি দর্শন কোরে ধন্য হই। "এ দীন জনার ভাগ্যে সে দিন কবে বা হবে।" মা গো! তোমার অপার অনন্ত সচ্চিদানন্দ-ময় রূপসাগরে ধীরে ধীরে ডুবে যাব, আমার সকল আমিত্ব ঘুচে গিয়ে, কবে আমার সর্বস্ব তুমিময় হয়ে যাবে—এ দীন জনার ভাগ্যে সেদিন কবে হবে মা! কবে "গভীর জলে মীনের মত" ঐ সচ্চিদানন্দ সাগরে খেলা করব? কবে মুক্ত বিহঙ্গের মত সচ্চিদানন্দ আকাশে সেচ্ছায় বিচরণশীল হব! ৫।১।৫২

॥ ওঁ আনন্দম্ ॥

হে প্রভু! তোমার চকিত আভাসও সর্বদুঃখ হর। একবার যার ওপর তোমার মধুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, সে যে কি আনন্দ, সে যার হয়েছে সেই জানে। আনন্দ রসে তার সর্বশরীর জরে যায়, সে আনন্দ-জ্ঞানে জড়ীভূত হয়ে পড়ে। সপ্তলোকবাসী তোমার আনন্দ প্রতিবিম্বে মুগ্ধ, তোমার আনন্দ রসে মগ্ন হয়ে আছে। যদি এই সৃষ্টিতে আনন্দ না থাকত, তা হলে কেই বা জীবন ধারণ করত? মানুষ নিঃশ্বাসটী ফেলে আনন্দের জন্য। আনন্দস্বরূপ তুমি আছ বলেই সৃষ্টির তাৎপর্য, নইলে সৃষ্টি নিরর্থক একটা কল্পনা। যেখানে সৃষ্টির আনন্দ আবৃত, সেখানেই ব্যর্থতা। ৬।১।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

মঙ্গলময়ি মা! মঙ্গল কর। ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য, ভালমন্দ বুঝি না মা, যাতে মঙ্গল হয় তাই কর। কারণ তুমিই জীবের মঙ্গলামঙ্গলের কর্ত্রী, তুমিই সকলের অন্তর্যামিনী হয়ে জীবের সকল কর্মের সাক্ষিনী। কিসে ভাল হয়, তা তো জানি না মা! কারণ যা ভাল বলে বুঝেছি, তাই আবার খারাপে পরিণত হয়েছে। যাকে খারাপ বুঝেছি, তাই শেষে ভাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাধির আক্রমণে, লোকের অযথা অত্যাচারে কতই দুঃখিত হয়েছি, কিন্তু তুমিই দেখিয়ে দিয়েছ অমঙ্গলের ভেতর দিয়ে কিরূপে মঙ্গল আসে। দুঃখের শিক্ষা মা তোমারই দান। সুখের বিশ্রান্তিতে লাভ কোথায়? ৭।১।৫২

।। প্রার্থনা ।।

মা ! "সকল কাজের সময় পাই, কেবল তোমায় ডাকার সময় পাই না।" মা ! তুমি আমার আত্মস্বরূপিনী, তুমি যেন আমার কাছে অপরিচিত হয়ে থেকো না। নানান্ কাজে ঘুরে বেড়াই, তোমার ভালবাসার কথা কি স্মরণ থাকে ? ছেলে খেলা করে, ঘুরেঘুরে বেড়ায়, কিন্তু যদি শোনে যে তার মা কোথায় যাচ্ছে, অমনি সে খেলা ফেলে মার কাছে দৌড় দেয়। মা ! আমি যেন শরীর ও ইন্দ্রিয়ের মোহে পড়ে তোমার কথা ভুলে না যাই। আমাকে বল দাও মা, যেন সকল নীচ বৃত্তি আমি ত্যাগ করতে পারি। মনের কোলাহল দূর হোক মা, আমি যেন অন্তরের নিভৃত কন্দরে তোমাতে ধ্যানস্থ থাকতে পারি। ৮।১।৫২

।। মনন ।।

হে মন ! `কোন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ কর, অনন্তের বিষয় ভাবনা কব। একটা সামান্য কীটের অঙ্গ, ফুলের রেণু, বালুকণা পরীক্ষা কর, তত্ত্বজ্ঞানের কোন পরিসীমা পাবে না ; এখন বোঝ, যে শক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালন, গ্রহ নক্ষত্রের, পরমাণু অণুর সংস্থান, সামান্য বীজ থেকে যিনি মহান্ বৃক্ষকে প্রস্ফুরিত করছেন, অণু পরমাণুর মন্থন কোরে যিনি কোটী সূর্যের উৎক্ষেপ করছেন, সে শক্তি কি মহীয়সী, একবার ভাব দেখি ! তিনি আমাদের ভেতরই আছেন, তিনিই আমাদের শুভ বুদ্ধিকে প্রবোধিত করেন, তাঁর ক্রীড়াতেই নক্ষত্র খসে পড়ে, পুষ্প জীর্ণ হয়, সাধু অসাধু, অসাধু সাধু বৃত্তি অবলম্বন করে। অনির্বচনীয়া তাঁর পন্থা। তাঁর জয় হোক ! তাঁকে নমস্কার ! ৯।১।৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে সর্বদর্শী বিচারক ! উৎপীড়িতদের প্রতি তোমার দৃষ্টি সদাই সজাগ আছে। আমাদের প্রার্থনা তোমার কাছে পৌছবে নিশ্চয়, তারা কখনও ব্যর্থ হয়ে ফিরবে না। আমাদের অদৃষ্ট আমাদের স্বয়ংকৃত ; ধিক্কার দিয়ে কি হবে। আমরা ফলপ্রার্থী হয়েই কর্ম করি, কর্মফলদাতা তুমি তাই বিধান কর। কিছু

কাল পরে আমাদের ঈপ্সিত ফল উপস্থিত হলে আমরা তাকে অস্বীকার করি এবং আমাদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেই। হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রারব্ধ ক্ষয়ের শক্তি দাও, তুমি আমাদের সঞ্চিত কর্ম নষ্ট কর কারণ তোমার নাম জীব-"কপাল-মোচন"। ১০।১।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

মা! তুমি আমার হৃদয়ে থেকে সকল কর্মের বিধান কর। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, যেমন চালাবে, তেমনি চলব। আমার অভিমান নাশ কর। তোমার শক্তিতে চন্দ্র সূর্য দৃশ্য হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলতে সমর্থ হই। তোমার শক্তিতেই আমরা এত দুঃখ সহ্য করি। প্রতি দুঃখের ভেতর দিয়েই তুমি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছ। সুখ তো জীবনের বিশ্রাম, সেও তো তুমি দান কর, নইলে কে কবে বিশ্রাম লাভ করেছে। এই সংসার চাঞ্চল্যে একমাত্র শক্তিদাত্রী তুমিই, কারণ শান্তিকরি তোমারই নাম,—তোমার কৃপাতেই লোকে চিত্তপ্রসাদ প্রাপ্ত হয়। ১১।১।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

হে প্রভু! আমি যেন তোমার দেওয়া কর্তব্য সম্পাদন করতে পারি। যত দুঃখই আসুক, তোমার দিকে তাকিয়ে যেন সহ্য করতে পারি। যত সুখই আসুক আমি যেন তাতে মুগ্ধ না হই। আমি যেন তোমাকে ছাড়া আর কিছু না চাই, কারণ তুমি ছাড়া আমার তো আর কেউ আপনার বলে নেই। বাহিরের প্রলোভনে আমি যেন মুগ্ধ না হই, আমি যেন পরমুখাপেক্ষী না হই—তোমার দিকেই যেন আমার দৃষ্টি স্থির থাকে। হে প্রভু! বর্তমান অন্ধকারে তুমিই আমার একমাত্র উজ্জ্বল ধ্রুবতারা, বর্তমান হিংসা ও ভোগের মোহাবর্তে তুমিই আমার একমাত্র পথ প্রদর্শক—একমাত্র দীপ্ত-স্তম্ভ। ১২।১।৫২

।। নিদিধ্যাসন ।।

চিত্ত সংযমপূর্বক ভ্রূদ্বয় মধ্যে ওঁকার চিন্তা পূর্বক, অন্য স্মৃতি সম্পূর্ণ ত্যাগ কোরে, চিত্তবৃত্তি তনু (ক্ষীণ) ভাব প্রাপ্ত হলে, যখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" শব্দার্থ বিচারের দ্বারা যাঁকে জানতে পারা যায়, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের আমি স্তব করি। যিনি ব্রহ্ম নামে বিখ্যাত, যাঁ অপেক্ষা অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ দেবতা নেই, যিনি নিত্য, সত্য, বুদ্ধ, মুক্ত, পরিপূর্ণ, আনন্দ, নিরঞ্জন, যিনি হৃৎপুণ্ডরীকে দহরাকাশে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় প্রকাশ হয়ে ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন, সেই অনাদি, অনন্ত, অপার, অতর্ক, ব্রহ্মবিদ্ হৃদয়বিহারী, সংসার তিমিরহারী, স্বয়ং প্রকাশ, যিনি জ্ঞেয়াতীত, অথচ তত্ত্বধ্যানযোগে যিনি হৃদয় মন্দিরে প্রকাশিত, সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে যেন আমি ধ্যান করতে সমর্থ হই। ১৩।১।৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে প্রভো! অন্য কথা বলব না, অন্য কথা শুনব না, অন্য কথা চিন্তা করব না, অন্য বিষয় স্মরণ করব না, আর কারও ভাবনা কোরব না, অন্যের আশ্রয় কখনও গ্রহণ করব না, এক ভক্তির সহিত তোমার চরণপদ্ম ছাড়া। হে শ্রীনিবাস! হে পুরুষোত্তম! আমাকে তোমার দাস্য দাও। তুমি আমার মাতা, তুমি পিতা, বন্ধু, সখা, তুমি আমার বিদ্যা, তুমি আমার ঐশ্বর্য, সম্পৎ, হে দেবদেব! তুমি আমার সর্বস্ব। হে প্রভু! নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী! আমি গৃহ, তুমি গৃহকর্তা। তুমি যেমন চালাও তেমনি চলি, তুমি যেমন বলাও তেমনি বলি। ১৪।১।৫২

।। প্রপন্ন গীতা ।।

"নাথ! যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাঽস্তু সদাত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাঽপসর্পতু॥"
"কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নরাণাং মনসি স্থিতম্॥

নিত্যোৎসবো ভবেৎ তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলম্‌।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥"

ওঁ রামকৃষ্ণঃ! ওঁ রামকৃষ্ণঃ! ওঁ রামকৃষ্ণঃ! হরিঃ ওঁ তৎ সৎ! ১৫।১।৫২

॥ মাতৃ-শরণ ॥

যিনি তপস্যার দ্বারা জাজ্জ্বল্যমানা, যিনি প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় কান্তিমতী, যাঁর ভ্রূভঙ্গে জগৎ সংসার অন্তর্হিত হয়, আমার সহস্রদল পদ্মে বিরাজিতা সেই সারদা দেবীকে ভজনা করি। নিজ সঙ্গীত, স্তোত্র, জপ স্তুতিতে যিনি প্রসন্না হন, সন্তানের প্রতি যিনি সদা স্নেহশীলা, সেই অক্রোধমূর্তি মা সারদার পাদপদ্মে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণত হই। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাদি দেবতাগণ যাঁর ক্রীড়া-পুত্তলি মাত্র, যারা তাঁর সেবা কোরে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন, যিনি বিরূপা হলে কোন শব্দ-অর্থ-প্রত্যয় চিত্তে স্ফুরিত হয় না, স্নিগ্ধ বদনচ্ছটায় যিনি সদা আশীর্বাদপরায়ণা, সেই আমার মা সারদা দেবীর শরণাপন্ন হই। ১৬।১।৫২

॥ দক্ষিণামূর্তি ॥

"বটবিটপী সমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্তিদেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥"

যিনি বট বিটপী সমীপে ভূমিভাগে উপবিষ্ট, যিনি নিকটবর্তী মুনিগণকে জ্ঞান দান করছেন, যিনি ত্রিভুবনের গুরু, ঈশ্বর ও জীবের জন্ম-মরণ-দুঃখচ্ছেদ-দক্ষ, সেই মঙ্গলময় গুরু মূর্তিকে নমস্কার।

"চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥"

কি আশ্চর্য! বটবৃক্ষমূলে শিষ্যেরা সব বৃদ্ধ, আর গুরু হলেন যুবা; আবার গুরু মৌন হয়ে ব্যাখ্যা করছেন এবং তাতে শিষ্যদের সংশয় ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

"ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈক মূর্ত্তয়ে।
নির্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥"

যিনি প্রণবের অর্থস্বরূপ, একমাত্র শুদ্ধ জ্ঞানমূর্তি, নির্মল ও প্রশান্ত সেই ওঁ-কারকে নমস্কার, সেই দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার।

"নিধয়ে সর্ব-বিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগীণাম্।
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥"

যিনি সর্ববিদ্যার আধার, ভবরোগের ভিষক্, সর্বলোকের গুরু, সেই দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার। ১৭।১।৫২

॥ ষট্‌পদী ॥

হে বিষ্ণো! আমার অবিনয় দূর কর, মনঃ সংযত কর, বিষয় মৃগতৃষ্ণিকার শান্তি কর, সর্বভূতে আমার দয়া বিস্তার কর, হে প্রভো! আমায় ভবসাগর হোতে পার কর। যে সুরনদী জাহ্নবী, তোমার পাদপদ্ম মধুতে পরিপূর্ণ, যা তোমার দিব্য দেহ সম্ভোগ হেতু সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্মবারিরূপে জগতে খ্যাত, সেই তুমি হে রামকৃষ্ণ! আমার ভবভয়জনিত সন্তাপ দূর কর, আমি তোমার পদারবিন্দ ভজনা করি।

"সত্যপি ভেদাপগমে, নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ, কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥"

—শ্রীশঙ্কর ॥ ১৮।১।৫২

॥ শিবাপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্র ॥

"কিং যানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ
প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদিরে
ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ।
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্বতী-বল্লভম্ ॥
আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি-ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।

লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মাত্বাং শরণাগতঃ শরণদ ত্বং রক্ষরক্ষাধুনা॥
করচরণ কৃতং বাক্কায়জং বা
শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো॥”

—শ্রীশঙ্কর॥ ১৯।১।৫২

॥ হরগৌর্য্যাষ্টক ॥

জগদম্বার সহিত আমাদের কুলদেবতা পশুপতির আমরা ভজনা করি। হে সাম্বশিব! আমরা তোমার। আমরা সাম্বশিবের স্তব করি; সুর অসুর, উরগ সাম্বশিবের দ্বারাই নিস্তার প্রাপ্ত হযেছে, আমরা সাম্বশিবের জন্য নমস্কার বিরচিত করি। জগদম্বার-সহিত-শিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে আর আমরা কাহাকেও ভজনা করি না; আমরা সাম্বশিবের অনুচর। জগদম্বার সহিত সেই পরব্রহ্ম শিবে আমাদের রতি হোক। ইতি দশশ্লোকী স্তুতি—শ্রীশংকর॥

“সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ
সদা শিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥”—শ্রীশঙ্কর॥ ২০।১।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

মাগো! তুমি চির আনন্দময়ী! আমি যেন তোমার পাদপদ্ম হতে কখনও বঞ্চিত না হই। জয় মা দুর্গে, নারায়ণি, গৌরি, মহালক্ষ্মি। মা তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমি ওঁকার, তুমিই প্রণবের অর্থরূপা, তুমিই সবিকল্পা, তুমিই নির্বিকল্পা। তুমি কালরূপে সর্বগ্রাসিনী, আবার নিস্পন্দা আদ্যাকালী রূপে মহাকালকেও গ্রাস কোরে ব্রহ্মস্বরূপারূপে অবস্থান কর। “যদি বল ছাড় ছাড় মা! তবু না ছাড়িব। সোনার নূপুর হয়ে, তোমার চরণে বাজিব॥ রুণু-

ঝুণু রূপেতে মাগো চরণে বাজিব। আর জয় শিব, জয় শিব নাম জপিতে থাকিব॥" মা যখন কিছু ছিল না, তখন তুমিই একমাত্র সত্তারূপে বর্তমান ছিলে—তোমা হতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাদির আবির্ভাব॥ ২১।১।৫২

॥ শিবস্তোত্র ॥

"প্রাতর্নমামি গিরীশং গিরিজার্দ্ধদেহং
সর্গস্থিতিপ্রলয়কারণমাদিদেবম্।
বিশ্বেশ্বরং বিজিতবিশ্বমনোভিরামং
সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥
প্রাতর্ভজামি শিবমেকমনন্তমাদ্যং
বেদান্তবেদ্যমনঘং পুরুষং মহান্তম্।
নামাদি ভেদ রহিতং ষড়্ভাবশূন্যং
সংসার রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥"—ইতি শিব-প্রাতঃস্মরণ॥
"বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়
কর্ণামৃতায় শশিশেখর ধারণায়।
কর্পূরকান্তিধবলায় জটাধরায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥
ভক্তিপ্রিয়ায় ভবরোগভয়াপহায়
উগ্রায় দুর্গ-ভবসাগর তরণায়।
জ্যোতির্ময়ায় গুণনাম সুনর্তকায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥"—ইতি দারিদ্র্য দহন

—শ্রীবশিষ্ঠ॥ ২২।১।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

মা! আমার কোন কামনা বাসনা পূরণের দরকার নেই, আমার কোন লোকের সাহায্যেরও দরকার নেই। মা! কেবল তুমি আমার থাক, তা হলেই আমার সব পাওয়া হবে। "গিরি। গণেশ আমার শুভকরী। ঘরে আনব চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী জটাধারী। গিরি! গণেশ

আমার শুভকরী।" মা তোমায় পেলেই তো সব পাওয়া হলো। ঠাকুর 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলে দুই ফেলে ছিলেন, কিন্তু মালক্ষ্মীকে হৃদয়ে রাখলেন, বললেন, 'তোমার বিভূতি চাই না মা, তোমাকে চাই; তোমাকে আমি হৃদয়াসনে বসাই, তুমি চিরদিন সেখানে থাক, তা হলেই আমার সব পাওয়া হবে।' ২৩৷১৷৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে প্রভো! আমি যেন আমার ইচ্ছাটাই তোমার ইচ্ছা বলে গ্রহণ কোরে না ফেলি। প্রত্যেক কাজের পূর্বে যেন তোমার আদেশ প্রতীক্ষা করে থাকি। প্রলোভন কিংবা কোন সাংসারিক সুবিধার জন্য হঠকারীর ন্যায় নিজ মোহকে তোমার ইচ্ছা বলে গ্রহণ না করি। যারা তোমার গুরুত্বে বিশ্বাস করে, তারা সহজে কারও কথায় বা নিজের উত্তেজনায় পূর্ণ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। তারা নিজ দেহ-মন-প্রাণ তোমাতে সমর্পণ করেছে, তাদের অহমিকা দূর হয়েছে, তারা নিজের ঢাক নিজে বাজায় না, নিজের কথা নিজে বলে না, তাদের হৃদয়-পদ্ম হতে তোমার শ্রীমুখের বাণীই নিঃসৃত হয়—"তরঙ্গে তাহার ভেসে যায় নরনারী।" "শ্যামলিয়া মুঝকো তোরা বন্‌শী বানব।" ২৪৷১৷৫২

।। আত্মপূজা ।।

"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ॥

—ইতি মৈত্রেয়ী উপনিষৎ

তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং শিবাত্মনে।
নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে॥
যোগী দেহাভিমানী স্যাদ্ ভোগী কর্মণি তৎপরঃ।
জ্ঞানী মোক্ষাভিলাষী চ তত্ত্বজ্ঞে নাভিমানিতা॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃণামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং সর্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা॥ —শ্রীশংকর

—এই দেহ দেবালয়, দেবতা জীব সদাশিব। আমি অজ্ঞান-নির্মাল্য পরিত্যাগ করি; আমি তাঁকে সোঽহম্ মন্ত্রে পূজো করি। তুমি আমি, আমি তুমি, আমি অনন্ত স্বরূপ, তুমিও শিবস্বরূপ, আমি ও তুমি এক, সেই দেবাদিদেব পরমাত্মাকে নমস্কার করি, আমি সেই পরমাত্মা, আমাকেই নমস্কার করি। ২৫।১।৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ! তুমি জীবের পাপ নিজ শরীরে ধারণ কোরে কত কষ্টই না পেয়েছ। আমি যেন আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের ফল, তোমার ধৈর্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা স্মরণ কোরে সহ্য করতে পারি। আমার চিত্ত যেন আনন্দিত হয় যে আমার প্রারব্ধ খণ্ডিত হচ্ছে। তোমার দেওয়া সুখদুঃখ আমি সানন্দে বরণ করি। আমি যেন অসৎ হতে বিরত থাকি। আমার যদি তোমার পাদপদ্মে অচ্যুত স্মরণ থাকে, তা হলে কি ভয় আর জনমে মরণে, বিপদে সম্পদে, স্বর্গে নরকে! যখন যে অবস্থায় রাখ, তখন যেন তোমার পাদপদ্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি না তিরোহিত হয়। হে নাথ! তুমি সর্বস্ব আমার! ২৬।১।৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে সচ্চিদানন্দময়ি জগন্মাত! তোমার জয় হোক। আমাদের মত নগণ্য কীটেরও প্রতি তোমার কত দয়া। তুমি আমাদের মোহাবর্ত থেকে উদ্ধারের জন্য স্বয়ং পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছ। হে দয়াময়ি মা! কত সান্ত্বনাই না তুমি আমাদের দিয়ে থাক, তোমার অনন্ত অপার প্রেম আমার ভেতর বিন্দুরূপে মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়ে আমাকে কী আনন্দময়ই না কোরে তোলে, সে আনন্দ আবার অপরকেও সিক্ত কোরে তোলে। মাগো! আমরা কি তোমার সেই প্রেমকণারও যোগ্য হয়েছি? তুমি ভক্তিরূপে আমাদের ভেতর আবির্ভূত হও এবং আমাদের তোমার দিকে আকর্ষণ কর; সেই আকর্ষণ মাধুর্যে আমরা যেন সংসার বিমুখ হই। ২৭।১।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

হে প্রিয়তম! তোমার আবির্ভাবে আমার হৃদয় আনন্দে উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে। তুমি আমার জয়! তুমি আমার পরমানন্দ! তুমি আমার আশা ও ভরসা! বিপদে একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু এখনও আমার ভালবাসায় খাদ আছে, আমার পবিত্রতায় অসম্পূর্ণতা আছে, হে প্রভু! তোমার নিকট হতে আমার সান্ত্বনার প্রয়োজন এখনও প্রত্যহই দরকার; ইন্দ্রিয় সংগ্রামে তোমার নিকট হতে এখনও আমার শক্তি সাহায্য দরকার, সেইজন্য সর্বদাই আমার নিকট প্রেরণা দান কর, সমস্ত পবিত্র অভ্যাসে আমাকে ভূষিত কর। "নান্যাস্পৃহা রঘুপতে হৃদয়ে স্মদীয়ে। সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা" ২৮।১।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

হে প্রভু! তোমার ধ্যান কি মধুর! আমার চিত্ত যখন তোমার প্রেমাস্বাদ করে তখন সে একেবারে পাগল হয়ে যায়। হে আনন্দঘন! প্রেমোৎস! তোমার কৃপার কি শেষ আছে? আমাদের দাস্য দাও, আমাদের তুমি যথার্থ সেবক কর। আমরা অতি ক্ষুদ্র শক্তি, তোমার সেবার কি জানি? তুমি আমাদের সেবা গ্রহণের জন্য কী অপূর্ব সৃষ্টিই না রচনা করেছ। তোমার দানের তুলনায় আমাদের সেবা কি নগণ্য। হে চির অভিভাবক! আমরা কি জানি যে তোমার দুটি সদা জাগ্রত-চক্ষু আমাদের পর্যবেক্ষণ ও রক্ষা করছে। তবুও তুমি কৃপা কোরে আমাকে তোমার সেবার ভার দিয়েছ। এই সেবাতেই তোমার পুণ্য সঙ্গ লাভ হয়—হৃদয় ভাবে মহিমোজ্জল হয়ে ওঠে। ২৯।১।৫২

॥ অচ্যুতাষ্টক ॥

"অচ্যুতং কেশবং রাম-নারায়ণং
কৃষ্ণদামোদরং বাসুদেবং হরিম্।
শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং
জানকীনায়কং রামচন্দ্রং ভজে॥

অচ্যুতং কেশবং সত্যভামা ধবং
মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাধিতম্।
ইন্দিরামন্দিরং চেতসা সুন্দরং
দেবকীনন্দনং নন্দজং সন্দধে॥
বিষ্ণবে জিষ্ণবে শঙ্খিনে চক্রিণে
রুক্মিণী রাগিণে জানকী জানয়ে।
বল্লবী বল্লভায়ার্চ্চিতায়াত্মনে
কংস বিধ্বংসিনে বংশিনে তে নমঃ॥
কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম নারায়ণ
শ্রীপতে বাসুদেবাজিত শ্রীনিধে।
অচ্যুতানন্ত হে মাধবাধোক্ষজ
দ্বারকানায়ক দৌপদী রক্ষক॥" —শ্রীশঙ্কর॥ ৩০।১।৫২

॥ শ্রীপঞ্চমী প্রার্থনা ॥

আজ শ্রীপঞ্চমী। মা সরস্বতী আমার প্রতি কৃপা করুন। মা আমাদের বুদ্ধিকে প্রবুদ্ধ করুন। হে মেধারূপিনি! আমাকে ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত কর। আমি যেন ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করি, আমি যেন ব্রহ্মকে প্রত্যাখ্যান না করি; ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। আমি যেন সর্বদা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে তৎপর হই। মা যেন কখনও আমাকে ত্যাগ না করেন, আমি যেন অবিদ্যাগ্রস্ত না হই। আমি যেন আমার শুষ্ক মরুচিত্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমে উজ্জীবিত করতে পারি। আমি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের সদা শরণাগত থাকি, তিনিও যেন সর্বদা আমাকে তাঁর শরণ দান করেন। ৩১।১।৫২

॥ নীলকণ্ঠ স্তব ॥

"নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাক হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥

নমঃ সুরাধিনাথায় সোমসূর্যাগ্নিচক্ষুষে।
ব্রহ্মণে চৈব রুদ্রায় বিষ্ণবে চৈব তে নমঃ॥
নমঃ সাংখ্যায় যোগায় ভূতনাথায় বৈ নমঃ।
কপর্দ্দিনে কপালায় শঙ্করায় হরায় চ॥
বিরূপায় সুরূপায় শিবায় বরদায় চ।
ত্রিপুরঘ্নে মথঘ্নায় মাতৃণাং পতয়ে নমঃ॥"—স্কন্দ পুরাণ॥

হে শিব! ধন্য তোমার বলবীর্য পরাক্রম, ধন্য তোমার যোগ বল; হে দেব দেব! ধন্য তোমার বিভূতি; হে গঙ্গাজল প্লবিত চন্দ্রমৌলে! তুমিই বিষ্ণু, চতুরানন, যম, কুবের; তুমি সূক্ষ্ম-পুরুষ অব্যয়; তুমি সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম পরম পরমাত্মা। ১।২।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

হে শিব! তোমার নাম আমার চিত্তে জয়যুক্ত হোক। হে মঙ্গলময়! আমার চিত্তের পাপ তাপ ঘুচিয়ে তোমার মত আমায় শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ কর। হে প্রভু! তুমি প্রসন্ন হও। আমি আমার প্রতি অঙ্গে তোমার নাম জপ করি—আমার প্রতি অঙ্গে তোমার প্রকাশ হোক। আমার অঙ্গের কালিমা দূর হয়ে, সত্ত্বজ্যোতিঃতে উচ্ছলিত হোক। আমি যেন শিব-স্বরূপ হই। আমি তোমার ধ্যান করি—হৃদয় আমার শিবজ্যোতিঃতে পূর্ণ হোক। আমি তোমার পূজা করি—আমার ইন্দ্রিয়-কর্ম সাধু হোক। তুমি আমার আত্মারূপে প্রকাশিত হও। বিশ্বের যাবতীয় কল্যাণগুণ তোমার জ্যোতিরঙ্গে পুষ্পরূপে বর্ষণ করি। জ্ঞানের অমৃতধারায় তুমি স্নান কর—ভক্তির অমৃতধারায় তোমার পাদ্য কল্পনা করি। করুণার অমৃত জ্যোতিঃ তোমার দৃষ্টি হোক। ২।২।৫২।

॥ প্রার্থনা ॥

ঠাকুর তুমিই মনের ভেতর কথা বল, আর আমি সেইগুলো বাইরে প্রকাশ করি। তাই তারা এত শোনে। যখনই লোকে প্রশ্ন করে তখনই

তুমি সেগুলো শোন ও জবাব দাও। নইলে আমি এত শীঘ্র এমন সমাধান কি কোরে করি। কথার পূর্বে তো কখনও কোনও বিষয় ভাবি না—অনেক সময় প্রস্তুত হবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন কথাই মনে আসে না; কিন্তু যখনই কথা বলতে আরম্ভ করি তখনই মনের অফুরন্ত ভাণ্ডারের চাবিকাঠি খুলে দাও। তখন আর বলবার সময় পাওয়া যায় না, অসংখ্য ভাব যেন ভিড় কোরে দাঁড়ায়, সকলেই আগে আসবার জন্য ব্যস্ত। ধন্য প্রভু! অন্তরে তোমার সত্ত্ব সমুদ্রশায়ী মূর্তি, যার ক্ষীণালোক মাঝে মাঝে আমাদের বুদ্ধিকে স্পর্শ দিয়ে যায়। ৩।২।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

মন চকোর প্রাণ ভরে সুধাকরের সুধা পান কর। নব বসন্তের নবীন শ্যামলের নব বৈচিত্র্যের উজ্জীবন যাবজ্জীব প্রত্যক্ষ কর, দ্রষ্টা সাক্ষিরূপে আনন্দ কর। যেখানেই জীবন, সেখানেই বিস্তার।—যেখানেই বিস্তার, মা! সেখানেই তোমার অনুভূতি! যেখানেই তুমি, সেখানেই প্রেম। মা! জীবনে যেন প্রেমের নিদর্শন পাই। প্রেমহীন জীবন, যেন জলহীন মৎস্য, প্রেমহীন জীবন জীবন নয়—যন্ত্র। যদি প্রেম থাকে অতি কুৎসিতও সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে, অতি দুঃখের মধ্যেও আনন্দের ধারা বয়ে যায়, অতি ক্ষুদ্রের মধ্যেও তোমারই সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। মা! তোমার প্রেমই একমাত্র অহংকারের সহস্র ফণার গরল নির্জিত করতে পারে। সর্ব নিষ্ঠুর দংশনই সুখস্পর্শ বলে বোধ হয়। জয় মা আনন্দময়ী! ৪।২।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

হে প্রভু! আমি যেন মিথ্যা কথা না বলি, যেন হঠকারিতা না করি, যেন বৃথা প্রতিজ্ঞা না করি; বাজে গল্প কোরে যেন সময় না কাটাই। হে প্রভু! আমার প্রতি কৃপা বর্ষণ কর। প্রত্যেক বাক্যের পূর্বে যেন আমি তোমাকে স্মরণ কোরে কথা বলি। প্রত্যেক কর্মের পূর্বে যেন আমি তা তোমাকে নিবেদন করি। হে প্রভু! শুভকর্মের ফল যেন আমাকে আসক্ত

করতে না পারে। তোমার সঙ্গ ছাড়া আর যেন আমার কোনও প্রার্থীত বস্তু না থাকে। 'আমি যেন সর্বদা সেবাপরায়ণ হই। কারও নিকট প্রতিদান লাভেচ্ছার বন্ধন হতে আমাকে মুক্ত কর। তোমার প্রদত্ত ফলে যেন আমি সন্তুষ্ট থাকি। ৫।২।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

হে প্রভু। তুমি আমাদের প্রতি কৃপা কর! তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন সিক্ত হই। তোমার প্রেমময় দৃষ্টি সর্বদা যেন আমাদের ওপর কিরণ বিতরণ করে। হে প্রভু! তোমার নাম পৃথিবীতে জয়যুক্ত হোক। তোমার প্রেম বৈরাগ্য সকলে অনুভব করুক। সকলে তোমার জয় গান করুক, সকলে তোমার কীর্তনানন্দে মগ্ন হোক। সকলে তোমাকে পেয়ে আনন্দ করুক। তুমি দুর্বলের বল, ভীত জনের অভয় দাতা, তুমি ন্যায়বান, দুষ্টের দমনকারী দর্পহারী ভগবান। সমগ্র পৃথিবী তোমার মহিমা গানে ধ্বনিত হয়ে উঠুক—কাম কাঞ্চনের প্রভাব নিরস্ত হোক। জগতে শান্তি আসুক, বিশ্ববাসী আনন্দে থাকুক, হিংসাদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা দূর হোক। ৬।২।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

কার আশীর্বাদে দেখলুম সে দেশ, শশী তপনের যেথা প্রবেশ নেই! কে আমার কপালে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলে, "তোমার জ্ঞানচক্ষু ঠাকুর খুলে দেবেন", সকল জীবনের সকল অপরাধের ক্ষমা কার নিকট পেলুম! কার কৃপায় অন্ধ কারাগৃহের অন্ধ জীবনশিখা প্রদীপ্ত হলো! অখণ্ডের ঘরের চাবি কাঠিটি তুলে রেখেছ কেন মা!—কবে আবার খুলে দেখাবে, আমার সকল দুঃখ দারিদ্র্য, শোক মোহের অবসান হবে চিরকালের জন্য। যখন তুমি দুঃখের আবরণ সরিয়ে দাও, চক্ষু যখন অন্তর্বহির সকল বাধা মুক্ত হয়, তখন দেখি অনন্ত চিৎসত্তা-সুখসায়রে অভিনব অচিন্ত্য লীলার ভাসমান দ্বীপমণি যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি। আমি অন্ধ ছিলাম তুমি চক্ষু দিলে, আমি বধির ছিলাম, তোমার দিব্য বাণী শুনালে, চিত্ত স্বচ্ছ হলো, অকথিত জ্ঞান প্রতিভাত হলো। ৭।২।৫২

।। প্রার্থনা ।।

চারিদিকে সচ্চিদানন্দ সাগর, কিন্তু চাতক মোল পিপাসায়। অন্দরে অমৃতের উৎস, গৃহস্বামী মোল বাহিরে জলের সন্ধানে ঘুরে। কে তুমি গুরু! দিলে সন্ধান সে উৎসের—বাঁচালে আমায় হাজার হয়রানি থেকে। এত দুর্বল আমি—নিজে তো পারি না কিছু—হাত ধরে নিয়ে এসে, নিজে শুষ্ক বাসনায় অমৃতের উৎস ধরে দাও। হে প্রভু! তুমি ছাড়া তোমার ও আমার মধ্যে এ কুহেলিকার আবরণ কে ঘোচাবে। মা! তুমিই আমার প্রভু! হে প্রভু! তুমি ও মা একই। মা! তুমি যে গৃহহারার গৃহ, দুঃস্থের আশ্রয় ও আশা। দুঃখের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা তোমার মধুরোজ্জ্বল পুরীর দ্বারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে প্রাণ যায়, চোখ যে ধাঁধিয়ে এলো, অশ্রুর ফোয়ারা শুকিয়ে গেল, তোমার পা কি দিয়ে ধোয়াব মা! ৮।২।৫২

।। প্রার্থনা ।।

জগৎ এক সঙ্গে মরতে যাচ্ছিল। আমার গুরু অমৃত ছিটিয়ে তাদের বাঁচালেন—অমৃতের বাণী শুনিয়ে জড়কে জীবন্ত করেছেন। চিত্ত ছিল মরুভূমি, বানালেন সেখানে উদ্যান। সে যে প্রেমে হাসে কাঁদে!—প্রেম সিন্ধু হৃদে বিদ্যমান—দুস্তর অপার মহিমা তার—সেই পারের নেয়ে আমার গুরু।

কেন জানি না তোমায় ভালবাসি; কেন জানি না তোমার অনুসন্ধান কোরে ঘুরে বেড়াই, মা কবে তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, আমার চিত্ত তোমাতে তাদাত্ম্য লাভ করবে, আমি চিরতরে তোমার হয়ে যাব, তোমাতে সাযুজ্য লাভ করব, তুমি ছাড়া আমার নিজস্ব বলে কি আছে মা! ৯।২।৫২

।। হরিনাম মালা ।।

"গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপী বল্লভম্।
গোবর্দ্ধন ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতী প্রিয়ম্॥
নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্।
নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকান্তকম্॥

পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমম্।
পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্॥
বামনং বিশ্বরূপঞ্চ বাসুদেবঞ্চ বিহ্বলম্।
বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুব্যাসং ত্বং বন্দে দেববল্লভম্॥ ১০।২।৫২

॥ অচ্যুতাষ্টক ॥

"অচ্যুতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্
রামকৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণো।
বাসুদেব ভগবন্ননিরুদ্ধ
শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্॥
বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ
নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র
মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে
শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্॥
রামচন্দ্র রঘুনায়ক দেব
দীননাথ দুরিতক্ষয়কারিণ্।
যাদবেন্দ্র যদুভূষণ যজ্ঞ
শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্॥
দেবকীতনয় দুঃখদাবাগ্নে
রাধিকারমণ রম্য সুমূর্ত্তে।
দুঃখমোচন দয়ার্ণব নাথ
শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্॥"—১১।২।৫২

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমরা সে ধ্বনি শুনেছি—মা জগদম্বার আশীর্বাদ শ্রীরামকৃষ্ণে রূপায়িত হয়েছে। এ কথা নির্ভয়ে প্রচার কর—তিনি দুর্বলকে রক্ষা করেন, তিনি সকলকে সেবক করেন। জীবের পাপ ভার লাঘবের জন্য কঠোর তপস্যা

কোরে আত্মাহুতি দান করেন। দুরারোহ শিখর ও দুর্লঙ্ঘ্য তরঙ্গ অতিক্রম কোরে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর—"দুষ্কৃত নাশের জন্য শ্রীভগবান পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন। একবার এসেছিলেন পিতা ও পুত্র রূপে, এবার এসেছেন মাতা ও পুত্র রূপে। বল শ্রীবুদ্ধ আবার এসেছেন, 'ঋষিকৃষ্ণ' আবার এসেছেন, শ্রীশঙ্কর আবার এসেছেন, শ্রীচৈতন্যে আবার এসেছেন—একই জীবনে সকল সাধনা একীভূত কোরে আমাদেরই মধ্যে"। ১২।২।৫২

॥ নিদিধ্যাসন ॥

"প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্।
যৎ স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তিমবৈতি নিত্যং
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ॥
প্রাতর্ভজামি মনসো বচসামগম্যং
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ।
যন্নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচু-
স্তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্॥
প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্।
যস্মিন্নিদং জগদশেষমশেষমূর্তৌ
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম্ ইব প্রতিভাসিতং বৈ॥—ইতি প্রাতঃস্মরণ
—শ্রীশংকর॥

ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম॥ ওঁ চিৎসদানন্দং ব্রহ্ম॥ ওঁ সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম॥ ওঁ চিদানন্দমেকম্ সদ্ ব্রহ্ম॥ হরিঃ ওঁ তৎ সৎ॥ ১৩।২।৫২

॥ দুর্গাপরাধ-ক্ষমাপন-স্তোত্রম্ ॥

"ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতি কথাম্।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পরং জানে মাতস্ত্বদনুশরণং ক্লেশ হরণম্॥
পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি কৃতিনঃ
পরং ক্ষীণোঽয়ং তে নিরতিশয় দীনাধমস্তুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিত কৃতির্নো তব শিবে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥
জগন্মাতর্মাতস্তবচরণসেবা ন রচিতা
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপিভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে
কুপুত্রো জয়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥—শ্রীশংকর ১৪।২।৫২

॥ শিবমহিম্ন স্তোত্রম্ ॥

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

বেদ, সাংখ্য, শৈব, যোগ, বৈষ্ণব শাস্ত্র—এই ভিন্ন ভিন্ন পথের উপাসনার মধ্যে—এইটী শ্রেষ্ঠ, এইটী হিতকর—এইরূপ রুচিভেদে মনুষ্যেরা সরল বা কুটীল পথে গমন করলেও জল যেমন সরল বা কুটীল পথে গমন করেও একমাত্র সমুদ্রেই গমন করে, সেইরূপ তুমিই তাহাদের একমাত্র গম্য অর্থাৎ যে যে মতেই উপাসনা করুক হে শিব! সে সব তোমারই উপাসনা।

"অসিত গিরি সমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।

লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণনামীশ পারং ন যাতি ॥"

যদি সিন্ধু পাত্রে নীল পর্বততুল্য কালি গোলা যায়, সুরতরুবর শাখা সমূহ লেখনী, পৃথিবীর মত বৃহৎ কাগজ হয় এবং সাক্ষাৎ সরস্বতী যদি চিরকাল লেখেন, তা হলেও হে ঈশ্বর! তোমার মহিমা লিখেও শেষ করতে পারবেন না।—(কাশীখণ্ড) ॥

"হে শিব। তোমার মহিমা আমি কি জানি বল! তোমার মহিমার কে পার পেয়েছে!" —শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ ১৫।২।৫২

॥ বরুণ সূক্ত ॥

"হে ঊর্ধ্বের পরাক্রান্ত দেবতা! আমাদের সকল গোপন কর্ম নিকটস্থের ন্যায় দর্শন কর, আমরা মনে করি, আমরা খুব গোপনে কর্ম করি; কিন্তু বরুণ দেব আমাদের সকল কর্ম আকাশরূপে দর্শন করেন। আমরা যে-কোন গুপ্ত গৃহেই নিজেদের গোপন করি, তিনি আমাদের সকল কর্মের সন্ধান রাখেন, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি আছেন বরুণ এবং আমাদের সকল পরামর্শই তাঁর নিকট প্রকাশিত। এ পৃথিবী তাঁর, এই বিরাট অপার আকাশ, এই অপার সমুদ্র বরুণের, সেই বরুণ তাদের ধারণ করেন, আবার এই ক্ষুদ্রের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করেন, তাঁর সহস্র চক্ষু সদা জাগ্রত। (অথর্ববেদ) ॥ ১৬।২।৫২

॥ মহাকালী স্তুতি ॥

মা! তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা। তুমি অমরত্বের জ্ঞান সুধা, হে অনাদি-অনন্ত-অপারা! তুমি অনির্বাচ্যা, তথাপি তুমি শব্দের অর্থ ও প্রত্যয় স্বরূপা, তুমি হ্রস্বদীর্ঘ-প্লুতা, উদাত্তা, অনুদাত্তা স্বরিৎ স্বরূপা। তুমি মাতৃকা বর্ণা, তুমি ছাড়া জগৎ অপ্রকাশিত থাকে। তুমি সাবিত্রী, লক্ষ্মী, তুমিই উমা মাহেশ্বরী শক্তি। তোমাকে আশ্রয় কোরেই সব আছে। সাংখ্যের প্রধান, 'ভাগবতের কাল তুমিই। তোমা থেকেই সব বেরোয়, আবার তুমিই

তাদের ভক্ষণ কর। তুমি সৃষ্টি, কর্ত্রী, তুমি সৃষ্টি, তুমি সৃষ্টির উপাদান, তুমি সৃষ্টির রক্ষিকা ও সংহারিকা। (শ্রীশ্রীচণ্ডী)। ১৭।২।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

ওঁ সর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিং
বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিম্।
নির্মুক্তবন্ধনমপারসুখাম্বুরাশিং
শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি॥" বাক্যবৃত্তি—শ্রীশংকর॥

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণানন্দনাথায় ঐঁ নমো সারদাদেব্যম্বায়ৈ নমো নমঃ॥

"অব শিব পার করো মেরো নেইয়া।
অউ ঘট ঘাট অগাধ জলধি
বল্লী লাগে না খেওইয়া॥
বারি বরোবরি বারি রহো হায়
তা পর অতি পূরৈবয়া
থর থর কম্পত আজি হিয়া মেরো
শিব কি দেত দুহৈয়া।
দেবী সহায় প্রভাত পুকারত
শিব পিতু গিরিজা মেইয়া॥"

চারিপাশে অগাধ জল, লগি আমার থই পায় না, তার ওপর আবার পূবে হাওয়া। হে পিতঃ শিব! মাতঃ গিরিজা! তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে। এ সংসার জলধির চারিপাশে আঘাটার ভয়ে আমার চিত্ত থর থর কাঁপছে, আর কার শরণ নেব? শিবেরই দোহাই দেই। ১৮।২।৫২

॥ জয় লীলাধাম ॥

"বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা * * *
লক্ষ শত ভক্ত চিত বাক্য হারা॥—শ্রীরবীন্দ্রনাথ

জয় চৈতন্যময় লীলা ধাম! জয় অজয়! জয়রামবাটী! জয় কামার-পুকুর! ঝামাপুকুর! ঠন্ঠনে কালীবাড়ী! জয় দক্ষিণেশ্বর! কালীঘাট! গঙ্গা! বাগবাজার! কাঁকুড়গাছি! জয় ব্রাহ্মসমাজ! চিত্তেশ্বরী! জয় শ্যামপুকুর! কাশীপুর! জয় কল্যাণেশ্বর! রাধামাধব! হর পার্বতী! জয় জয় বেলুড় ধাম! জয় পেনেটী! কালনা! শ্রীনবদ্বীপ! জয় বৈদ্যনাথ! কাশী বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা! জয় ত্রিবেণী-প্রয়াগ! শ্রীবৃন্দাবন-যমুনা! জয় জয় শ্রীগয়া ক্ষেত্র শ্রীগদাধর! ১৯।২।৫২

।। শ্রীগীতা ।।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"—ইতি শ্রীধর॥ মহাভারত॥

"যং ব্রহ্মবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তিদিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈস্যাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগা।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ॥"
—ইতি বিঃ ভাগবত ১২।১৩।১॥

"গীতা সুগীতা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ-পদ্মাৎ বিনিঃসৃতম্॥
"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গৃতামৃতং মহৎ॥"
—ইতি গীতা-মাহাত্ম্য বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার॥ মহাভারত॥

"অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টদশাধ্যায়িনীম্।
অম্বত্বমনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিনীম্॥
"গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি-গেহিনী॥
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তি-নাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থ-জ্ঞানমঞ্জরী॥"—ইতি গীতা-মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার॥ ২০।২।৫২

॥ নরনারায়ণ ॥

"স্তিমিত চিৎ সিন্ধু ভেদি উঠিল কি জ্যোতিঃ ঘন।
কোটী সূর্য্য গলাইয়ে ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন ॥"—স্বামী সারদানন্দ

—o—

"যারে দেখলে পরাণ জেগে ওঠে, হরি নাম আপনি ফোটে
এমন মনের মানুষ মেলে কোই ?
আমি পাই যদি সেই মনের মানুষ, আদর কোরে বুকে লই !
(ও তার অঙ্গের পরশে শীতল হই, পরশ মণি ছুঁয়ে আমি সোনা হই)
(তার) সদাই অঙ্গে পীরিত পুলক, নয়নে পীরিত ধারা
(সে যে) নাম রসে বিভোর পাগল প্রেমে মাতোয়ারা ;
(সে যে মাতোয়ারা, নাম রসে প্রেমে বিভোর আপনা হারা)
মলয় বাতাস পরশে যেমন, মালতী ফুটেরে বনে।
(তেমনি) তার অঙ্গের বাতাস লেগে নাম ফোটে রে মনে ॥
(ফোটে নাম ফুল, হৃদয় লতায়
তার ভাব মলয় পবন পরশে তাহে প্রেম মধু)
(আছে নাম ফুল—ভক্ত অলি,
প্রেম মধু লোভে নামে প্রেমে মাখামাখি)

—o—

ওঁ বীরেশ্বরায় বিদ্মহে। মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো নরঃ প্রচোদয়াৎ। ২১।২।৫২

॥ সংগীত ॥

চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে।"—নব বিধান সঙ্গীত

—o—

"আমার মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানিগো ও দিন দয়াময়ি, তুমি দুর্গমেতে দুখহরা ॥
তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমি আদ্য মূলে গো মা।
আছ সর্ব ঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা ॥

তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা।
অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা ॥" ২২।২।৫২

॥ বীরেশ্বর স্তুতি ॥

"প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিহরং সুরেশং
গঙ্গাধরং বৃষভবাহনমম্বিকেশম্।
খট্টাঙ্গশূলবরদাভয়হস্তমীশং
সংসার রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥"

—ইতি শিব প্রাতঃ স্মরণস্তোত্রম্ ॥

"বিভূষিতং বালমষ্টবর্ষাকৃতিং শিশুম্।
আকর্ণপূর্ণনেত্রঞ্চ সুবক্ত্র্ দশনচ্ছদম্ ॥
চারুপিঙ্গজটামৌলিং নগ্নং প্রহাসিতাননম্।
শৈশবোচিত নেপথ্যধারিণং চিত্তহারিণম্ ॥
পঠন্তং শ্রুতিসূক্তানি হসন্তঞ্চৈব লীলয়া ॥" —বীরেশ্বর ধ্যান ॥

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু ছাড়া আর কিছু নেই, সেই এক মহারুদ্র সত্যস্বরূপ মহেশ্বরের শরণাপন্ন হই। রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, শুক্তিতে রজতের ন্যায়, মরীচিকায় জল ভ্রান্তির ন্যায় যাঁতে জগৎ ভাসমান, তাঁর শরণাপন্ন হই। ২৩।২।৫২

॥ শিব বন্দনা ॥

হে ঈশ্বর! আমাকে দাস্য দাও। হে শিব! আমার মঙ্গল কর। হে মৃত্যুঞ্জয়! আমার দেহাভিমান দূর কর। আমাকে অমর কর। হে মায়াপতি! আমাকে মায়া মুক্ত কর। হে বিশ্বপিতা! আমি তো তোমার জগৎ ছাড়া নই। হে মহাকাল! কাল ভয় হতে আমাকে নিস্তার কর। হে কামারি! আমাকে বিশুদ্ধ কর। হে গৌরীপতে! মায়ের পাদপদ্মে আমার মনভৃঙ্গ যেন সদা চিন্মধু পানে তৃপ্ত থাকে। অন্য কামনা আর আমার নেই প্রভু! আমার চিত্ত যেন সাম্বসদাশিবময় হয়ে থাকে। জয় সাম্ব সদাশিব! জয় সাম্ব সদাশিব! জয় সাম্ব সদাশিব! সাম্ব শিব! ওঁ নমো শিবায়। ২৪।২।৫২

।। অরূপ বন্দনা ।।

যাগযজ্ঞ, পূজা, হোম, স্বর্গ, জীবনের যা কিছু রীতি-নীতি, সব নামরূপ। এর পারে দাঁড়িয়ে আছে নিরালায়, নগ্নশিশু পরমহংস। সেখান থেকে নামলে দেখা যায়, প্রতি নামরূপে তারই প্রতিচ্ছবি। সে হলো স্বয়ংবিম্ব হয়েও অবিম্ব—সে হলো একলা, নির্জন, নিরপেক্ষ মৌনী।

হে আমার প্রিয়! আজ কেবল তোমারই কথা মনে পড়ছে, এই শীতের নৈশ নিস্তব্ধতায়। আমার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু তুমি। হে প্রিয়! কেন তুমি অহমতীত অসম্পর্কিত ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে পালিয়ে আছ? আমার আমি যে তোমারই প্রতিবিম্ব। হে নির্জন! নির্জর! গম্ভীর মহামৌনী—আমি যে তোমারই ঋষি! কথা কও! কথা কও! হে অনাদি! অনন্ত অপার। ২৫।২।৫২

।। শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা ।।

হে অনাদি অনন্ত অপার—তোমাকে নমস্কার। তোমার কল্যাণময়ী মূর্তিকে নমস্কার। হে নিরহঙ্কার নিরীহ পুরুষ! তোমাকে নমস্কার। হে সত্যস্বরূপ! সত্যবাক্! সত্যসংকল্প! তোমাকে নমস্কার। হে অভূত-পূর্ব সত্য নীতির আদর্শ! তোমাকে নমস্কার। হে সর্বংসহ! তপস্যার মূর্ত-বিগ্রহ! তোমাকে নমস্কার। হে কলির প্রতাপবিনাশী! জিতকাম-কাঞ্চন! তোমাকে নমস্কার। হে শুদ্ধ ও পবিত্রের। অগ্রগণ্য! হে সরল! নিরভিমান বালক পরমহংস শিরোমণি! তোমাকে নমস্কার। হে দয়াময় করুণানিদান! প্রচ্ছন্ন মাতৃ-মূর্তি! তোমাকে নমস্কার। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ। জয় প্রভু দীনবন্ধু। ২৬।২।৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে প্রভু। আমি যেন তোমার কৃপায় তোমার অনন্ত স্বরূপের উপলব্ধি করি। আমাকে কল্যাণকৃৎ কর। তোমার ধ্যানে যেন আমি নিরহংকার নিরীহ হই। তোমার নাম প্রভাবে যেন আমি সত্যময় হই। তোমার চরিত্র যেন হৃদয়ে সম্যক্ প্রতিভাত হয়। আমায় তুমি সর্বংসহ কর। তপস্যা যেন

আমার শরীরে শান্তিতে বাস করে। চিন্তা ও ব্যাধি যেন আমাকে আক্রমণ না করে। শীল যেন আমার শরীরে জীবন্ত হয়ে বাস করে। হে শুদ্ধ ও পবিত্র। আমাকে শুদ্ধ ও পবিত্র কর। হে প্রভু। আমার কুটিলতা দূর কর, আমাকে শিশুর মত সরল কর। রজনীগন্ধার মত আমার চরিত্র শুভ্র কর, গোলাপের মত আমাকে তপস্যার শিশিরে স্নাত কর, পদ্মের মত মন আমার শোভনীয় কর। হে সচ্চিদম্বে। তোমার ছদ্মবেশ অপসারিত কর।
২৭।২।৫২

।। সশক্তিক শ্রীগুরু ধ্যানম্ ।।

ওঁ শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশং শুদ্ধ ক্ষৌমবিরাজিতং।
গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয়করাম্বুজম্ ॥
বিমল পরমহংসং সারদাম্বা সহায়কং।
পরানন্দ রসোল্লাসলোচনদ্বয় পঙ্কজম্ ॥
ভজামি রামকৃষ্ণ ত্বাং গুরুং ব্রহ্মস্বরূপকম্।
কালিকাধিষ্ঠিতং মূর্তিং যোগমায়া সমাবৃতম্ ॥ ইতি শ্রীরামকৃষ্ণধ্যানম্ ॥
ওঁ সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে।
প্রফুল্লপদ্ম পত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাম্ ॥
রামকৃষ্ণ বামভাগে সচ্চিৎশ্রীসুখরূপিনীম্।
ভজামি সারদাম্বিকাং বেদান্তজ্ঞানবোধিনীম্ ॥
দয়ারূপাং মায়ারূপাং মায়াতীতাং কৃপাময়ীং।
মেধারূপাং সরস্বতীং সাধকতপোরক্ষিনীম্ ॥ ইতি শ্রীসারদাম্বাধ্যানম্ ॥

২৮।২।৫২

।। মহামায়া ।।

মা, তোর খেলা কে বুঝবে বল
কেন ঐ কালোরূপে সকল রূপের বিলয় হলো ?
অসীমের ঐ কালো বুকে
সাত রঙের যে ঝরনা ঝরে

কেন তারা সবাই মিলে
জ্যোতির কমল রূপটী নিলে।
শ্বেতকোরকে নীলশিখাটী
তুই মা আমার হৃদ্‌ বিলাসী
কভু বর্ণমালা (কভু) বনমালা
কভু বাঁশী, (কভু) অসি ঝলমলো ॥

—বাসুদেবানন্দ ॥ ২৯।২।৫২

॥ অম্বাগীতি ॥

(কেগো) অসুর দলিয়া যায় ॥
পদ তলে কিবা জবার রুচি
মঞ্জির সিঞ্জে রিমি ঝিমি ঝিমি
অলক্তে রক্তকমল ফুটি
(ভক্ত) ভ্রমরে ডাকিছে আয় ॥
কুঞ্চিত চঞ্চল অলক পাশে
চন্দ্ররেখা মঞ্জুহাসে
পরমানন্দ রস উল্লাসে করুণা নয়নে চায় ॥
অমৃতবক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া
স্নেহ তরঙ্গ উঠিছে দুলিয়া
এসমা কাঞ্চি পুরেতে ফিরিয়া
সন্তান কাঁদে পায় ॥—বাসুদেবানন্দ ॥ ১।৩।৫২

॥ সোমস্তুতি ॥

"যেখানে অনন্ত আলোক, সেই অক্ষয় জগতে আমায় প্রতিষ্ঠা কর, যেখানে পরমাত্মাসূর্য সদা স্বমহিমায় প্রকাশিত—হে সোম! আমাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত কর।

"যেখানে বিবস্বানের (আলোকের) পুত্রগণ রাজত্ব করেন, সেই রহস্যময়

স্বর্গে, যেখানে নদীতে সদা সুখ প্লাবন, সেই স্বর্গের অন্তর্নিহিত স্বর্গে, যেখানে সবই জ্যোতির্ময়, সেখানে আমাকে অমর কর, হে সোম!

"প্রাণে যেথায় সদা স্বাধীন প্রবাহ, সেখানে ইচ্ছার সদা সফলতা, সেখানে জ্ঞানস্বরূপ সোম সদা তুমি বাস কর, যে দেশে ক্ষুৎপিপাসা মৃত্যু জরা ভয় নেই, সেখানে আমায় অমর কর হে সোম!"—ঋগ্বেদ ॥ ২।৩।৫২

॥ দেবীগীতি ॥

"মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামা পদ নীল কমলে
কালী পদ নীল কমলে!
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হলো কামাদি কুসুম সকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল।
যত পঞ্চতত্ত্ব প্রধানমত্ত ঐ রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এতদিনে।
যত সুখদুঃখ সমান হলো আনন্দ সাগর উথলে ॥—শ্রীকমলাকান্ত।

জয় মা আনন্দময়ী! তারা শিব সুন্দরী! নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু ॥ ৩।৩।৫২

॥ দুর্গাপ্রশস্তি ॥

"তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত মা, তুমি সে পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল ॥
দশমহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার।
এবার কোনরূপে আমায় করতে হবে পার ॥
চল অচল তুমি মা, তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি মা, তুমি বিশ্বমূল ॥
ত্রিলোক জননী তুমি ত্রিলোক তারিণী।
সকলের শক্তি তুমি মা, তোমার শক্তি তুমি ॥
বায়ু অন্ধকার আদি শূন্য আর আকাশ
রূপ দিগ্‌ দিগন্তর তোমা হতে প্রকাশ ॥

ব্রহ্মাবিষ্ণু আদি করি যতেক অমরে।
তবশক্তি প্রকাশিছে সকল শরীরে॥
শ্রীদুর্গা নাম জপ সদা রসনা আমার।
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার॥" ৪।৩।৫২

॥ দুর্গাপ্রশস্তি ॥

"যেখানে সেখানে থাকি মা, থাকিগো কাননে।
নিশিদিন থাকে মন, যেন ও রাঙ্গা চরণে॥
যেখানে সেখানে মরি মা, মরিগো বিপাকে।
অন্তকালে জিহ্বা যেন মা, শ্রীদুর্গা বলে ডাকে॥
যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে।
সুধা মাখা তারা নাম মা, আর কার আছে॥
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা, তোর চরণে বাজিব॥
যখন বসিবে মা গো শিব সন্নিধানে।
জয় শিব! জয় শিব! বলে বাজিব চরণে॥
চরণে লিখিতে নাম আঁচড় যদি যায়।
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায়॥
শঙ্করী হইয়ে মা গো গগনে উড়িবে।
মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে॥
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন, যাবে গো পরাণী।
কৃপা কোরে দিও (মাগো), রাঙা চরণ দুখানি॥" ৫।৩।৫২

॥ ডেভিডের গান ॥

"আর কতকাল? আর কতকাল? প্রভু দুর্বৃত্তদের জয় জয়াকার হবে?

"আর কতকাল তারা রূঢ় বাক্যের প্রয়োগে আনন্দ করবে এবং শঠতার গর্ব করবে?

"তোমার নিরীহ ভক্তদের যে তারা চুরমার কোরে ফেল্লে, হে প্রভু! তোমার সন্তান ধারা যে লোপ পাবে।

"যিনি কর্ণ দিয়েছেন, তিনি কি কারও অন্তরের আর্তনাদ শোনেন না? যিনি চক্ষু দিয়েছেন, তিনি কি দেখতে পান না?

"যিনি অবিশ্বাসীদের শাসন করেন, তিনি কি নির্ভুল নন? যিনি মানব চিত্তে জ্ঞান বিকাশ করেন, তিনি কি অজ্ঞ?" ৬।৩।৫২

।। প্রার্থনা ।।

প্রভু হে! আবার তোমার নিকট আমার মর্ম কথা বলি। আমি তো চুপ করে থাকতে পারি না। তুমি যে অন্তরযামী, তুমি আমার মর্মকথা না জেনে কি কোরে থাকবে। যাদের তুমি ভালবাস, তাঁদের জন্য তুমি কি সৌভাগ্যই না সঞ্চয় কোরে রেখেছ। যারা তোমাকে ভয় করে, তাদের তুমি কত রকমেই না রক্ষা কর। যারা তোমাকে ভালবাসে তুমি তাদের কে? যারা তোমার সেবা করে তাদের তুমি কে? তোমার ধ্যানে কেন তাদের অকথিত আনন্দ? তারা কি ভাষায় বলতে পারে সচ্চিদানন্দের কোমল স্পর্শ প্রাণে কিরূপ? হে রসঘন! বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে আনন্দ উৎসরূপে তোমারই প্রকাশ। তোমার কৃপা অকথিত! তোমার প্রেম অকথিত! ৭।৩।৫২

।। বিশ্রাম ।।

সর্বোপরি এবং সর্ব বস্তুতে আমার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণে বিশ্রাম করুক। কারণ "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা, মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু, মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ।" হে প্রভু! আমাকে আশীর্বাদ কর, আমি যেন তোমাতে বিশ্রাম লাভ করতে পারি। আমার যেন সর্বদা স্মরণ থাকে সর্বসৃষ্ট পদার্থ নশ্বর, সর্বস্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দু দিনের, যশঃ ও সম্মান তৈলহীন দীপের ন্যায় নিষ্প্রভ হয়ে যায়; শক্তি ও সমৃদ্ধিকে ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে হবেই; জ্ঞান বুদ্ধির দৌড় আর কতদূর; সম্পদ ও শিল্প কালে অরুচি হয়ে পড়বেই; ইন্দ্রিয় সুখ নিষ্প্রভ হবেই; প্রশংসার কালী রোজ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে—একথা সর্বদা যেন আমার মনে থাকে প্রভু! ৮।৩।৫২

॥ পরাপূজা ॥

"আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ
সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং।
পূজা তে বিবিধোপভোগরচনা
নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ॥
সঞ্চারস্ত পদোঃ প্রদাক্ষিণ বিধিঃ
স্তোত্রাণি সর্বাঃ গিরো।
যদ্‌যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং
শম্ভো! তবারাধনম্॥—শ্রীশংকর

হে শম্ভো! তুমি আত্মা, গিরিজামতি, পঞ্চপ্রাণ সহচর, শরীর গৃহ, বিবিধ নিদ্রা সমাধিস্থিতি, পদদ্বয় সঞ্চরণ প্রদক্ষিণ বিধি, এবং সমস্ত বাক্য তোমার স্তোত্র, আর আমি যে কর্ম করি সে সমুদয়ই তোমার আরাধনা। ওঁ নমো শিবায়॥
৯।৩।৫২

॥ এক তুমিই সব জান ॥

হে প্রভু! আমি আমার গুণ বা দোষের কথা কি বলব—আমার দেহটা তো একটা ছায়ের কণা; নিজের বাহাদুরী আর কত করব, যখন সৃষ্টি স্থিতি-লয়কারী তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তোমার অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কীর্ত্তির কথা যখন স্মরণ করি, তখন আমার শক্তি সামর্থ আত্মম্ভরিতা গুণ না হয়ে দুর্বলতা বলে প্রতীয়মান হয়—আমার আমিত্ব একটা শূন্যতায় পরিণত হয়, তখন তোমার কৃপা ছাড়া সে অজ্ঞান স্রোতে আর কিছু আশ্রয় করবার থাকে না। আমি কোথা হতে এসেছি? কোথায় যাব? এ জগতে আমার কর্তব্য কী? হে প্রভু! তা তুমিই একমাত্র জান। ১০।৩।৫২

॥ অম্বাস্তোত্র ॥

"স্বরচিত লীলাগার মনোহর এ সংসার
সুখ দুঃখ লয়ে যথা নানা খেলা খেলিছ
পূর্ণজ্ঞান দিবে তাই, জন্ম হতে সুখ নাই,
দুঃখ পথ দিয়া মোর করে ধরি চলেছ।"—শ্রীবিবেকানন্দ
[শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের অনুবাদ হইতে]

॥ রামভজন ॥

রামচন্দ্র গুণধাম আমারি!
নবদূর্বাদল কান্তি উজল হৃদি মন্দির মঙ্গলকারী বিহারী ॥
সর্বারাধ্য হে দেব দেব শ্রী অযোধ্যা পুরজন তাপনিবারী ;
কৌশল্যা সুত দশরথ নন্দন নট সুন্দর সরযু তটচারী ॥
কমল নেত্র বিমল মুখ মণ্ডল তরুণারুণ ভাতি গণ্ডে ;
বক্ষ পীন কোটি ক্ষীণ অসীম শক্তি সুবলিত ভুজ দণ্ডে।
রম্ভা তরু উরু চরণে উদিত চারু চন্দ্র নখর দ্যোসারি
শীর্ষে প্রখর কোটি ভানু করোজ্জ্বল
ঝলমল মুকুট করে ধনুধারী ॥—বিশ্বরূপ গোস্বামী ॥ ১১।৩।৫২

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনার তাৎপর্য ॥

আমার মা সেই আগ্বা প্রথমা শক্তি। তিনি সর্বব্যাপিনী—দৃশ্যমান জগতের ভেতরে ও বাইরে অবস্থিতা। তিনি এই বিশ্বের জননী, তিনি সমগ্র বিশ্বের লালনকারিণী ধাত্রী। তিনি উর্ণনাভ, এ বিশ্ব তাঁর উর্ণার বয়ন। তিনি লুতাতন্তু আপনার মধ্য হতে বাহিরে প্রক্ষেপ করেছেন এবং স্বয়ং তাতে আবদ্ধ হয়ে আছেন, আবার নিজেই তা ছেদ করেন। তিনিই ধৃতা ও ধারিণী, তিনিই খোসা ও শাঁস, "তাঁর মুখই অরূপ ব্রহ্মের মূর্তরূপ"।

জয় প্রভু! তোমার জয় হোক! তোমার চিন্তা তন্দ্রাচ্ছন্ন দেবদেবীদের

জাগিয়ে তুলল। ঘুমন্ত নন্দন-কাননের নির্ঝর-সৌন্দর্য-ধারাগুলির তুমিই স্বপ্ন ভঙ্গ করলে। ১২।৩।৫২

॥ সোঽহম্ ॥

"মায়াতৎকার্য্যবিলয়ে নেশ্বরত্বং ন জীবতা।
ততঃ শুদ্ধ চিদেবাঽহং চিদ্ব্যোমনিরুপাধিতঃ॥

মায়া ও তার কার্য বিলয় হলে আর ঈশ্বরত্ব বা জীবত্ব থাকে না, কারণ চিদাকাশ উপাধি শূন্য হলে, 'আমি' শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করি।

"সত্যচিদ্‌ঘনমনন্তমদ্বয়ং
সর্বদৃশ্যরহিতং নিরাময়ম্।
যৎপদং বিমলমদ্বয়ং শিবং
তৎসদাহমিতি মৌনমাশ্রয়ে॥

সত্য, চিৎস্বরূপ, অনন্ত, অদ্বয়, সর্বদৃশ্যরহিত নিরাময় যে অদ্বয় শিব বিমল পদ, আমি সর্বদা তৎস্বরূপ জেনে মৌনাবলম্বন করি।

"পূর্ণমদ্বয়মখণ্ডচেতনং
বিশ্বভেদকলনাদিবর্জিতম্।
অদ্বিতীয়পরসংবিদংশকং
তৎসদাহমিতি মৌনমাশ্রয়ে॥

পূর্ণ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড চেতন, বিশ্বভেদ কল্পনাদিবর্জিত, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হতে পর=ভিন্ন যে সংবিৎ=বৃত্তিরূপজ্ঞান যাঁর অংশ, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ, এই জন্য আমি মৌনাবলম্বন করি।

"জন্মমৃত্যুসুখদুঃখবর্জিতম্
জাতি-নীতি-কুল-গোত্রদূরগম্।
চিদ্বিবর্ত্তজগতোঽস্য কারণং
তৎসদাহমিতি মৌনমাশ্রয়ে॥

যাঁর জন্মমৃত্যু সুখ দুঃখ নেই ; জাতি কুল নীতি গোত্র যাঁ হতে দূরে অবস্থান করে ; চৈতন্যের বিবর্তরূপ জগতের যিনি কারণ, আমি সদা তৎ স্বরূপ, অতএব আমি মৌনাবলম্বন করি।

"উলূকস্য যথা ভানাবন্ধকারঃ প্রতীয়তে।
স্বপ্রকাশে পরানন্দে তমো মূঢ়স্য ভাসতে॥"

—স্বাত্মপ্রকাশিকা, শ্রীশংকর॥

যেমন সূর্য কিরণে পেচকের অন্ধকার প্রতীত হয়, সেইরূপ মূঢ়ের নিকট স্বপ্রকাশ পরানন্দে অজ্ঞানান্ধকার আবির্ভূত হয়। ১৩।৩।৫২

॥ ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা ॥

"অসঙ্গোঽহমসঙ্গোঽহমসঙ্গোঽহং পুনঃপুনঃ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥
নিত্য-শুদ্ধ-বিমুক্তোঽহং নিরাকারোঽহমক্ষরঃ।
ভূমানন্দ স্বরূপোঽহমেবাহমব্যয়ঃ॥
নিত্যোঽহং নিরবদ্যোঽহং নিরাকারোঽহমক্ষরঃ।
পরমানন্দরূপোঽহমেবাহমব্যয়ঃ॥
শুদ্ধচৈতন্যরূপোঽহমাত্মারামোঽহমেব চ।
অখণ্ডানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥
স্বয়ং প্রকাশরূপোঽহং চিন্ময়োঽহং পরোঽস্ম্যহম্।
অদ্বৈতানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥"

—শ্রীশংকর॥ ১৪।৩।৫২

॥ নর-নারায়ণ ॥

সচ্চিদানন্দ-সাগর-মথনোদ্ভূত জ্ঞানঘন মূর্তি তোমাকে নমস্কার। ভক্তি তোমার হৃদয়ে অন্তঃসলিলা—অতি কঠোর জ্ঞানের আবরণে, হৃদয়ের অতি গভীরতম প্রদেশে এ ফল্গুসলিলার বাস। এই পরাপ্রেমই অখণ্ডের ঘরে তোমাকে রসাস্বাদের নিমিত্ত তোমার ধ্যানময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা কোরে রেখেছে। হে নরঋষি! তোমার শরীর অদ্বৈত বেদান্তঘন—আত্মার অভিঃ মন্ত্র নিয়ে জীব কল্যাণের জন্য তুমি আবির্ভূত। অখিল ধর্মের অধীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের তুমি কর্ম-প্রকাশ—বাসুদেবের কর্মযোগ তুমি বাস্তব করলে—শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপ্রসূতা

আধ্যাত্মিক গঙ্গা তুমি বিশ্বময় বইয়ে দিলে। আজ তোমাকে নমস্কার—আমি যেন প্রত্যহ তোমাকে নমস্কার করতে না ভুলি—তোমার আদর্শ ছবি যেন হৃদয়ে আমার সদা জাগরুক থাকে। ১৫।৩।৫২

।। অভিঃ ।।

হে তপোজ্জ্বল দৃপ্ত সন্ন্যাসী! হৃদয়ে বল দাও—অভিঃ মন্ত্র হৃদয়ে স্ফুরিত হোক, চিত্ত যেন সেবায় অবসাদ প্রাপ্ত না হয়—তপস্যায় যেন ভীতি না আসে, শ্রীশ্রীজগদম্বার রক্ষা-কর্ত্রীত্ব যেন বিস্মৃত না হই, 'তোমার শুভেচ্ছাই তোমার কর্মীদের রক্ষাকবচ'—একথা যেন কদাচ বিস্মৃত না হই। হে স্বামিন্! হৃদয়ে বল দাও—অভিঃ মন্ত্র হৃদয়ে স্ফুরিত হোক, এ জীবন পুণ্যময় কর—বিশ্বাসময় কর—ধ্যানময় কর—নির্ভরতায় পূর্ণ কর—শান্তিময় কর—সেবাময় কর—আনন্দময় কর—দেহ ও মন নিষ্কলুষ কর—পশুকে দেবতা কর—জীবন কৃতার্থ কর। ১৬।৩।৫২

।। হরিস্তুতি ।।

আত্মা ভিন্ন এই দেহে আর কে আছে? একমাত্র "সেই আনন্দময় পুরুষই প্রাণাপানাদিরূপে অধিষ্ঠিত" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রুতি যাঁর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন,—"তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে"।

আমি প্রাণ, আমি বাক্য, আমি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়, আমি মন, আমি বুদ্ধি—পৃথক ও সমষ্টিরূপে আমিই এই প্রাণাদিরূপে বর্তমান, এইরূপ মননে 'আমিই তিনি'—রূপে যিনি প্রতিপন্ন হন,—"তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে"।

আমি প্রাণ নই, দেহ নই, মন বুদ্ধি অহংকার নই; যিনি জ্ঞানময় পুরুষ, 'তিনিই আমি' এই প্রকারে যাঁকে জানা যায়—"তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে"।—শ্রীশঙ্কর॥ ১৭।৩।৫২

।। প্রপন্ন গীতা ।।

"যদি গমনমধস্তাৎ কালপাশানুবন্ধো
যদি কুলবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে।
কৃমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা
মমভবতু হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা ॥
"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব ॥
"তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী
গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্বানি তীর্থানি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গঃ ॥
"যে মানবা বিগতরাগ পরাবরাজ্ঞা
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানেন তেন হত কিল্বিষ চেতনাস্তে
মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥" ১৮।৩।৫২

।। অনুভূতি ।।

আমার জীবনের প্রতি নিঃশ্বাস, আমার আয়ুর প্রতিক্ষণে সেই সত্যেরই আগমন। জীবনের প্রতি সংগ্রামে আরামে তারই বিকাশ ও অনুভূতি—প্রতিক্ষণে প্রতি ভুলে ও অভিজ্ঞানে তারই মূর্ত স্পর্শ দিয়ে যায়। জীবনের যাবতীয় কাকুতি মিনতি—ক্রোধ অভিমান তাকেই বজায় রাখবার জন্য। সেই সত্য আনন্দ স্বরূপ। তাই হে প্রেম! তোমাকে আমরা এত ভালবাসি, জীবনের প্রতি সংগ্রামে তোমাকে আমরা এমনি কোরে জয় করতে চাই, জীবনের পরাজয়ে তাই তোমার এত বিরহ ভোগ করি। জীবনের শীত বসন্ত বর্ষা গ্রীষ্ম সেই সত্যেরই উৎসব ঘোষণা করে—কখনও বা সে অতি রুক্ষ, কখনও অতি

মোহনীয়, কখনও অতি জ্বালাময় আবার কখনও সবুজ নূতন সৃষ্টির কেবলই প্ররোচনা। ১৯।৩।৫২

।। ধ্যানের প্রান্ত ভূমি ।।

ধীরে ধীরে সৃষ্টিতে প্রলয়ের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, সমস্ত জগৎ ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে এলো, দূরে শুনছি এক বিরাট বিশাল সিন্ধুর গভীর কল্লোল, সমস্ত বিশ্বের প্রলয় তাতে ঝাঁপ দেবার জন্য ছুটেছে—সে গর্জনে চিত্ত ভীত চকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐ সাগরের মলয় স্পর্শে একি শিহরন! কোন্ আনন্দ অতলে তলিয়ে যাবার সুদূর স্মৃতি জেগে উঠে চিত্তকে বিহ্বল কোরে তুলছে—হৃদয়ে আর কিছু নেই, মাত্র এই ঘোর অন্ধকারে একটী করুণার দীপ্ত শিখা—নিভৃত অন্তরকোণে জ্বলছে, নীরবে হৃদয় যন্ত্রে বেজে উঠছে—সম্মুখে! সম্মুখে! ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ—চিরনির্বাণ। ২০।৩।৫২

।। প্রভুর বেদনা ।।

প্রভু! তুমি ভক্তের জন্য কেঁদে আকুল, কিন্তু জীব তোমার জন্য কফোটা চোখের জল ফেলে। ভক্তেরা তোমার চিত্তে সদা জাগরূক, দিব্যদৃষ্টিতে যে সর্বদাই তুমি তাদের দেখতে পাও, হাজরা, হৃদে যা বলে বলুক, তোমার মন যে তাদের জন্য কেঁদে কেঁদে ওঠে, তুমি জান তাদের অদৃষ্ট, আদর্শ,—তুমি জান তাদের কি উপদেশ সাধন ভজন শেখাতে হবে—অলৌকিক সত্যের কোন্ অংশের তারা প্রত্যেকে অধিকারী। দিনের শেষে কুঠির ছাতে দাঁড়িয়ে তাদের চিন্তাই তোমার চিত্তে গুরুভারের মত নেমে আসে, বেদনায় তুমি উৎপীড়িত হও। সন্ধ্যার কাঁসর ঘণ্টার সহিত প্রাণ যে তোমার হাহাকার কোরে ওঠে, 'ওরে কে কোথায় আছিস আয়রে। আমি যে, তোদের ভালবাসি, তোদের বিরহে যে আমি মরি; তোরা কে কোথায় আছিস ছুটে ছুটে আয়।' ২১।৩।৫২

।। মহাকালী স্তুতি ।।

"তিরস্কুর্ব্বতোঽন্যামেবোপাসনাঞ্চেৎ
পরিত্যক্ত-ধর্ম্মাধ্বরস্যাপি জন্তোঃ।
ত্বদারাধনান্যস্তচিত্তস্য কিং মে
করিষ্যন্ত্যমী ধর্ম্মরাজস্য দূতাঃ॥
ন মন্যে হরিং নো বিধাতারমীশং
ন বহ্নিং ন চার্কং ন চেন্দ্রাদি দেবান্।
শিবোদীরিতানেকবাক্য প্রবন্ধে-
স্ত্বদর্চ্চাবিধানং বিশত্যম্ব মত্যাম্॥
নরা মাং বিনিন্দন্তু বিন্দন্তু নাম
ত্যজেদ্ বান্ধবোঃ জ্ঞাতয়োঃ সংত্যজন্তু।
যমীয়া ভটা নারকে পাতয়ন্তু
ত্বমেকা গতির্মে ত্বমেকা গতির্মে॥" ২২।৩।৫২

।। মহাবিদ্যা স্তুতি ।।

"নারায়ণীং বিষ্ণু-পূজ্যাং ব্রহ্মবিষ্ণুহরপ্রিয়াম্
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং নিত্যামনিত্যগুণবর্জিতাম্॥
সগুণাং নির্গুণাং ধ্যেয়ামর্চ্চিতাং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্।
বিদ্যাং সিদ্ধিপ্রদাং বিদ্যাং মহাবিদ্যাং মহেশ্বরীম্॥
মহেশভক্তাং মাহেশীং মহাবল প্রপূজিতাম্।
প্রণমামিজগদ্ধাত্রীং শুম্ভাসুর বিমর্দ্দিনীম্॥
প্রণমামি মহামায়াং দুর্গাং দুর্গতি নাশিনীম্।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং গৌরীং সর্ব্বার্থ-সাধিনীম্॥
শ্রীদুর্গাং ধনদামন্নপূর্ণাং পদ্মাং সুরেশ্বরীম্।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং চন্দ্রশেখরবল্লভাম্॥
নমস্তে চণ্ডিকে চণ্ডি চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনি।
নমস্তে কালিকে কাল মহাভয় বিনাশিনি॥

শিবে রক্ষ জগদ্ধাত্রি প্রসীদ হরবল্লভে।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং জগৎ পালনকারিণীম্ ॥
করালাং বিকটাং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।
হরার্চ্চিতাং হরারাধ্যাং নমামি হরভল্লভাম্ ॥ ২৩।৩।৫২

॥ তুমি ধন্য ॥

এই বিশ্ব, এই অপূর্ব রচনাকৌশল, এই অনন্ত সৃষ্টি, হে জগন্নাথ! তোমারই অত্যদ্ভুত জ্ঞান ও শিল্পের পরিচয়। ঐ সব তোমারই অপূর্ব জ্ঞান, আনন্দ ও সৌন্দর্যের এক অপরিসীম ভাণ্ডার। তোমার নির্মল আকাশ-বক্ষে দোলে সহস্র সহস্র নক্ষত্র মালা, তাতে চন্দ্র সূর্যের ইয়ত্তা নেই! ইয়ত্তা নেই! বিচিত্র পুষ্প সম্ভারে, বিচিত্র পক্ষী কল কণ্ঠে, বিচিত্র শ্যামল শস্য সম্পদে, বিচিত্র দৃশ্য-মাধুরীতে তোমার এই ধরিত্রী ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। হে মহান্ বিশ্বনাথ। অনন্ত কোটী ভুবনে, অনন্ত কোটী দেবগণ তোমার স্তুতি করে। তুমি ধন্য ধন্য হে! ২৪।৩।৫২

॥ অদ্বৈতানুভূতি ॥

যিনি সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, যাঁর শক্তি অচিন্তনীয়া, যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, যিনি সমুদয় বিশ্ব অবগত আছেন, যাঁর মূর্তি অনন্ত, যিনি মায়াপাশে বদ্ধ নন, যিনি আবার সুখ-সাগর-স্বরূপ, যিনি নির্মল জ্ঞানমূর্তি, সেই শ্রীবল্লভ বাসুদেবকে নমস্কার করি।

যাঁর অনুগ্রহে, আমিই বিষ্ণু এবং বিষ্ণুস্বরূপ আমাতেই সমুদয় বিশ্ব পরি-কল্পিত এই অভিজ্ঞান অনুভূত হয়েছে, যিনি নিত্য ও পরমাত্ম স্বরূপ, তাঁর চরণযুগলে সতত প্রণতঃ হই।

আমি আনন্দস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও কেবল শিবস্বরূপ—যা নিরানন্দ তা আমি নই, কারণ আমি নিশ্চল, অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ—সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-সাগর।—শ্রীশংকর ॥ ২৫।৩।৫২

॥ মায়া পঞ্চক ॥

"যা পূর্বে কখন ঘটেনি এরূপ বস্তুর নির্মাণে নিপুণতরা তুমি—হে মহামায়ে! নিরুপম, নিত্য, নিরবয়ব, অখণ্ড সমস্ত কল্পনাশূন্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে, জগৎ ঈশ্বর ও জীব ভেদ সৃষ্টি কর—তোমাকে নমস্কার!

"অঘটিত বস্তুর উৎপাদনে পটীয়সী তুমি; চতুষ্পদ পশ্বাদিতুল্য জনগণকে শত শত শ্রুতিবাক্য ও বেদান্ত দ্বারা শোধিত করলেও, হায়! হায়! সর্বদা কামকাঞ্চন দ্বারা তাদিগকে কলুষিত কর।—হে মহামাযে! তোমাকে নমস্কার!

"অঘটিত বস্তুর উৎপাদনে পটুতরা হে মহামায়ে! তুমি আনন্দ জ্ঞান ও অখণ্ড অববোধস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মাকে পঞ্চভূত নির্মিত সংসার সাগরে প্রেরণ কোরে কখনও ভাসাও কখনও ডোবাও, তোমাকে নমস্কার!

—শ্রীশংকর ॥ ২৬।৩।৫২

॥ বিষ্ণু-সহস্র-নামে ॥

"তমাল শ্যামল তনুং পীত কৌষেয় বাসসম্।
বর্ণমূর্ত্তিময়ং দেবং ধ্যায়েন্নারায়ণং বিভুম্ ॥
ওঁ শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগীভির্ধ্যানগম্যং
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয় হরং সর্ব্বলোকৈক নাথম্ ॥
ওঁ যস্য স্মরণ মাত্রেন জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
বিমুচ্যেত নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥
নমঃ সমস্ত ভূতানামাদি ভূতায় ভূভৃতে।
অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥
অনাদি নিধনং বিষ্ণুং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
লোকাধ্যক্ষং স্তবন্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাতিগো ভবেৎ ॥ ২৭।৩।৫২

॥ বিষ্ণু সহস্র নামে ॥

"ওঁ নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্র মূর্ত্তয়ে
সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে।
সহস্র নাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে
সহস্র কোটীযুগধারিণে নমঃ ॥
নমঃ কমলনাভায় নমস্তে জলশায়িনে।
নমস্তে কেশবানন্ত বাসুদেব নমস্ততে ॥
বাসনা বাসুদেবস্য বাসিতং ভুবনত্রয়ম্।
সর্ব্বভূত নিবাসিনং বাসুদেব নমস্ততে ॥" ইতি বিষ্ণু সহস্র নাম॥

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
পাপোঽহং পাপকর্ম্মোঽহং পাপাত্মা পাপসম্ভব।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপ হরোহরিঃ ॥" ইতি—

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় ॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২৮।৩।৫২

॥ শিব মহিম্ন ॥

হে নির্জন কানন প্রিয়! তুমি অতি নিকটস্থ, তোমাকে নমস্কার! তুমি অতি দূরস্থ, তোমাকে নমস্কার! হে মদনদহন! তুমি সূক্ষ্মতম, তুমি বৃহত্তম তোমাকে নমস্কার! হে ত্রিনয়ন! তুমি যুবতম, তোমাকে নমস্কার! তুমি প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্ববস্তর আধার, সর্বস্বরূপ তোমাকে নমস্কার!

তুমি বিশ্বসৃষ্টির জন্য রজগুণবহুল ব্রহ্মা, তোমাকে নমস্কার! তুমি বিশ্ব সংহারে তমোগুণ প্রবল রুদ্রমূর্তি, তোমাকে নমস্কার! তুমি লোকপাল সত্বগুণ-বহুল বিষ্ণুমূর্তি তোমাকে নমস্কার এবং তুমি অমৃতের নিমিত্ত ত্রিগুণাতীত মায়াবর্জ্জিত জ্যোতির্ময় শিবমূর্তি ধারণ কর।

ওঁ নমো শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর ॥ ২৯।৩।৫২

।। রামচন্দ্র-নারদ সংবাদে ।।

নারদ উবাচ ॥ ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং পুণ্যোঽহং পুরুষোত্তম ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতং সফলঞ্চ মে ॥
অদ্য মে সফলং জ্ঞানমদ্য মে সফলং তপঃ ।
অদ্য মে সফলং কর্ম্ম ত্বৎ পাদাম্ভোজদর্শনাৎ ॥
অদ্য মে সফলং সর্ব্বং তন্নাম স্মরণং তথা ।
ত্বৎ পাদাম্ভোরুহদ্বন্দ্বসদ্ভক্তিং দেহি রাঘব ॥"

শ্রীরাম উবাচ ॥ "মুনিবর্য্য মহাভাগ বরমিষ্টং দদামি তে ।
যৎ ত্বয়া চেপ্সিতং সর্ব্বং মনসা তদ্‌ভবিষ্যতি ॥"*

নারদ উবাচ ॥ "বরং ন যাচে রঘুনাথ যুষ্মৎ
পাদাব্জভক্তিঃ সততঃ মমাস্তু ।
ইদং প্রিয়ং নাথ বরং প্রযাচে
পুনঃ পুনস্ত্বামিদমেব যাচে ॥"*

প্রণাম । "ত্বমক্ষরং পরং জ্যোতিস্ত্বমেব পুরুষোত্তম ।
ত্বমেব তারকং ব্রহ্ম ত্বত্তোঽন্যন্নৈব কিঞ্চন ॥
শান্তং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
রাজীবলোচনং রামং প্রণমামি জগৎপতিম্ ॥"

ওঁ শ্রীজানকীবল্লভায় শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ।— [সনৎকুমার সংহিতায় শ্রীনারদোক্ত শ্রীরামচন্দ্রস্তবরাজ হইতে]। ৩০।৩।৫২

।। চতুর্যুগ তারক ব্রহ্মনাম ।।

ওঁ নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ ।
নারায়ণ পরামূর্ত্তির্নারায়ণ পরাগতিঃ ॥ সত্য ॥

ওঁ রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন ।
কৃষ্ণকেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥ ত্রেতা ॥

---

* শ্রীশ্রীঠাকুর চিহ্নিত স্থানগুলি ভক্তদের নিকট পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করতেন ।

ওঁ হরে মুরারে মধুকৈটভহারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণবিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ দ্বাপর ॥

ওঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ কলি ॥

ওঁ নমস্তে বাঙ্‌মনোঽতীত রূপায়ানন্ত শক্তয়ে।
আদিমধ্যান্তহীনায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সর্ব্বেষামাদি ভূতায় ভক্তানামার্ত্তিনাশিনে ॥ ৩১।৩।৫২

॥ লক্ষ্মীস্তুতি ॥

"নমঃ প্রদ্যুম্ন-জননি ! মাতস্তুভ্যং নমো নমঃ।
পরিপালয় মাং মাতঃ প্রণতং শরণাগতম্ ॥
শরণ্যে ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি কমলেকমলালয়ে।
ত্রাহি ত্রাহি মহালক্ষ্মি পরিত্রাণ পরায়ণে ॥
পাণ্ডিত্যং শোভতে নৈব ন শোভন্তি গুণা নরে।
শীলত্বং নৈব শোভতে মহালক্ষ্মি ত্বয়া বিনা ॥
তাবদ্‌ বিরাজতে রূপং তাবচ্ছীলং বিরাজতে।
তাবদ্‌গুণা নরানাঞ্চ যাবল্লক্ষ্মীঃ ন প্রসীদতি ॥"
"ত্বমেব জননী লক্ষ্মীঃ পিতা লক্ষ্মীস্ত্বমেবচ।
ভ্রাতা ত্বঞ্চ সখালক্ষ্মীর্বিদ্যালক্ষ্মীস্ত্বমেব চ ॥
ত্রাহি ত্রাহি মহালক্ষ্মি ত্রাহি ত্রাহি সুরেশ্বরি।
ত্রাহি ত্রাহি জগন্মাতর্দ্দারিদ্র্যাৎ ত্রাহি মাং নতম্ ॥
নমস্তুভ্যং জগদ্ধাত্রি নমস্তুভ্যং নমোনমঃ।
ধর্ম্মাধারে নমস্তুভ্যং নমঃ সৌভাগ্যদায়িনি ॥"—শ্রীঅগস্তি ॥
"মা তুমি আমার হৃদয়ে থাক।"—শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ ১।৪।৫২

॥ বিরহ ॥

যাবার হাওয়া ঐ যে উঠেচে............শ্রীরবীন্দ্রনাথ

—০—

"শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই।
আমি কি সুখে আর ঘরে রই॥
শ্যাম যদি মোর হোত মাথার চুল।
যতন কোরে বাঁধতাম বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল॥
(কেশব কেশ যতনে বাঁধতাম সই) (কেউ নকতে তো পারত না)
(শ্যাম কাল আর কেশ কাল) (কালোয় কালো মিশে যেতো গো)
শ্যাম যদি মোর বেসর হোত, নাসার মাঝে সদাই রোত
(অধর চাঁদ অধরে থাকত) (যা হবার নয় তাই মনে হয় গো)
(শ্যাম কেন আমার বেসর হবে সই !)
শ্যাম যদি মোর কঙ্কণ হোত, বাহু মাঝে সতত রইত
(কঙ্কণ নাড়া দিয়ে চলে যেতুম সই) (বাহু নাড়া দিয়ে)
(শ্যাম কঙ্কণ হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই) (রাজপথে) ॥" ২।৪।৫২

॥ আদ্যাকালী ঃঃ মহাকাল ॥

"ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্বেষাং তোষণং ভবেৎ॥
সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীত্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগতং সর্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া॥
মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়াসৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্ ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্॥
সদ্রূপং সর্বতো ব্যাপি সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈক রূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ববস্তুষু॥
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনন্তমবাঙ্মনসোগোচরম্॥

তস্তেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্॥
তবরূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহার সময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিষ্যতি॥
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥"

—ইতি মহানির্বাণে॥ ৩।৪।৫২

॥ আদ্যাকালী ঃ ঃ ব্রহ্ম ॥

"কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদিভূতত্বাৎ আদ্যাকালীতি গীয়তে॥
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে॥
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা॥"

—ইতি মহানির্বাণে॥

"ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নামোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপম।
ত্বমেকং জগৎ-কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্॥"

—ইতি মহানির্বাণে॥ ৪।৪।৫২

॥ ক্ষমাপ্রার্থনা ॥

"ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতি কথাঃ।

ন জানে মুদ্রাং তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥

মা! আমি মন্ত্র জানি না, যন্ত্র জানি না, স্তব জানি না, আহ্বান জানি না, মা! আমি ধ্যান জানি না, স্তুতিকথা জানি না, মুদ্রাবিধি জানি না, বিলাপ করতেও জানি না, কেবল জানি একমাত্র তোমার অনুসরণই ক্লেশহরণ করে।

"বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণ বিরহেণালসতয়া
বিধেয়াশক্যত্বাত্তব চরণয়োর্যা চ্যুতিরভূত।
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥

মা! আমি অর্চনার বিধি জানি না, আবার অর্থহীন, আলস্যহেতু কর্তব্যানুষ্ঠানেও অপারগ, সেইজন্য তোমার পাদপদ্মে যে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে, হে সকল-উদ্ধারিণি মঙ্গলময়ি জননি! আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর। কুপুত্র হতে পারে, কিন্তু কুমাতা তো কখন হয় না।

"ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি ন চ মে
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ
মৃডানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥

হে শশিমুখি! আমার মোক্ষ কামনা নেই, বিভবের বাঞ্ছাও নেই, সুখের কামনাও করি না, হে জননি! 'মৃডানী, রুদ্রাণী, শিব শিব ভবানী' তোমার এই সব নাম জপ করেই যেন আমার জন্ম অতিবাহিত হয়।

"আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং, করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ, ক্ষুধাতৃষ্ণার্ত্তা জননীং স্মরন্তি ॥"
—ইতি দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্, শ্রীশংকর ॥

হে করুণার্ণবেশ্বরি দুর্গে! আমি আপদরাশিতে মগ্ন হয়ে তোমাকে স্মরণ করছি, মা! আমি কোন শঠতা করছি না, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হলেই সন্তান জননীর স্মরণ করে। ৫।৪।৫২

।। জীবন-সংগীত ।।

"প্রভু আমার নয়নের আলো আমার মুক্তি ; আর কাকে ভয় করি বল ? তিনি যে আমার জীবনের শক্তি ! আর কাকে ভয় !

"যখন তুমি বলেছিলে, 'আমাকে দর্শন কর।' আমার হৃদয় তাতে প্রত্যুত্তর দেয়, 'হে প্রভু ! আমি স্বরূপ অনুসন্ধান করব'।

"তোমার স্বরূপ আমার নিকট হতে আর আবৃত রেখ না। তোমার ভৃত্যকে রাগ কোরে আর দূরে রেখ না ; তুমিই আমার একমাত্র সহায়। আমাকে ত্যাগ কোরো না, আমাকে যেন ভুলো না প্রভু ! হে ভগবান ! তুমি আমার একমাত্র মোক্ষ !

"হে প্রভু ! তোমার পন্থা আমাকে নির্দেশ কর, তোমার সরল পথে আমাকে পরিচালনা কর।

"আমি তো সকল ভরসা ছেড়ে দিয়েছিলুম, যদি না জীবন্ত লোকে তোমার শিবত্ব দর্শনের বিশ্বাস আমার না থাকতো।"—ডেভিড, ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ॥
৬।৪।৫২

।। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।।

"ব্রহ্ম হতে সমুদ্র গিরি সৃষ্টি হয়েছে, সমস্ত নদনদী তাঁতেই স্যন্দিত হচ্ছে, তাঁতেই সর্ব ঔষধী ও রসসমূহ বর্তমান, তিনিই জগতের অন্তরাত্মা রূপে অবস্থিত।"—(মুণ্ডক উঃ ২।১।৯)॥

"যো দেব অগ্নৌ যো অপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ঔষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈদেবায় নমো নমঃ ॥—শ্বেঃ উঃ ২।১৭ ॥

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণ দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতো মুখঃ ॥"—ঐ ৪।৩ ॥

"তুমি নীলবর্ণ ভ্রমর, সবুজ ও লালচক্ষু শুক, তুমি তড়িৎগর্ভ মেঘ, ঋতু ও সমুদ্র সকল, তুমি অনাদি বিভুরূপে বর্তমান, তোমা হতে এই বিশ্বভুবন উৎপন্ন হয়েছে।"—ঐ ৪।৪ ॥ ৭।৪।৫২

॥ পদবন্দনা ॥

"হে দেব! তোমার পদারবিন্দে নমস্কার করি, যে পাদপদ্ম—যারা তোমার শরণাগত—তাদের নিকট দুঃখরূপ তাপের উপশমকরী ছত্রী স্বরূপ। যার সাহায্যে ত্রিতাপদগ্ধ জীব ত্রিতাপকে দূরে নিক্ষেপ করে। এ সংসারে হে বিধাত! ভব! ঈশ্বর! জীব তাপত্রয়ে দগ্ধ হয়ে সুখের লেশমাত্রও পায় না, সেইজন্য আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সবিজ্ঞ তোমার পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তোমার মুখনাড় হতে ছন্দপক্ষী নির্গত হয়ে বিবিক্ত সন্ন্যাসীদের মনোরঞ্জন করে। তোমার পাদপদ্ম নিঃসৃত অঘমর্ষণবারি সরিদ্‌বরাগঙ্গা পদেপদে তীর্থ সৃষ্টি করেন। আমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হই।"

—ইতি বিষ্ণু ভাগবতে ॥ ৮।৪।৫২

॥ ক্ষমাপ্রার্থনা ॥

"মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননিজঠরগস্তাবদালব্ধদেহ-
-স্ত্বং কর্ত্রী কারয়ত্রী করণগুণময়ী কর্মহেতুস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থা জগদিদমখিলং ত্বামৃতে নাস্তিমাতঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিত রদনে কামরূপে করালে॥
"ত্বং ভূমি স্ত্বং জলোঘস্তমসি হুতবহো গন্ধবাহস্তমেব
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্বিকাহংকৃতিশ্চ
আত্মাপ্যেবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈবকিঞ্চিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিত রদনে কামরূপে করালে॥

—ইতি কাল্যাপরাধক্ষমাপণে, শ্রীশঙ্কর॥ ৯।৪।৫২

॥ প্রাতঃস্মরণ ॥

"প্রাতঃ স্মরামি রঘুনাথ মুখারবিন্দং
মন্দস্মিতং মধুরভাষি বিশাল-নেত্রম্।
কর্ণালম্বি-চক্রকুণ্ডলশোভিগণ্ডং
কর্ণান্তদীর্ঘনয়নং নয়নাভিরামম্॥"—ইতি শ্রীরাম-প্রাতঃস্মরণ॥

"শুদ্ধং সূক্ষ্মং পরং শান্তং তারকং ব্রহ্মরূপিণম্।
সর্বভূতাত্মভূতস্থং সর্বাধারং সনাতনম্॥
সর্বকারণকর্ত্তারং নিদানং প্রকৃতেঃ পরম্।
নিরাময়ং নিরাভাসং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্॥
নিত্যানন্দং নিরাকারমদ্বৈতং তমসঃ পরম্।
পরাৎ পরতরং তত্ত্বং সত্যানন্দং চিদাত্মকম্॥
"সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রামং সীতাসমন্বিতম্।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষমমেয়ং গুরুতৎপরম্॥
নমোঽস্তু বাসুদেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ।
নমোঽস্তু রামদেবায় জগদানন্দরূপিণে॥
নমোবেদান্ত-নিষ্ঠায় যোগিনে ব্রহ্মবাদিনে।
মায়া-মোহ-নিরাসায় প্রপন্নজনসেবিনে॥"

—ইতি সনৎকুমার সংহিতায়াম্॥ ১০।৪।৫২

॥ প্রভুর প্রার্থনা ॥

প্রভু মা জগদম্বার পায়ে ফুল দিয়ে ভক্তি প্রার্থনা করেছিলেন—'মা এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমাকে তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমাকে তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও মা তোমার ধর্ম, এই নাও মা তোমার অধর্ম, তোমার পাদপদ্মে আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, তোমার পাদপদ্মে আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও মা পাপ, এই নাও মা পুণ্য, তোমার পাদপদ্মে

আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।' আবার বলছেন, 'ধর্ম থাকলেই অধর্ম আছে; পাপ থাকলেই পুণ্য আছে, ভাল থাকলেই মন্দ আছে, জ্ঞান থাকলেই অজ্ঞান আছে, আলো থাকলেই অন্ধকার আছে'—কিন্তু মা দ্বন্দ্বের পার। ১১।৪।৫২

।। পারের উপায় ।।

"হে ভূমন্! ভগবান্! পরাত্মন্! যোগেশ্বর! ত্রিলোকে কে কোথায়, কি প্রকারে, কবে আপনার লীলা জানতে পারে? আপনিই আপনার যোগমায়াবলম্বনে মায়া বিস্তার কোরে ক্রীড়া করেন।

"সেই জন্য অসৎস্বরূপ, সপ্নাভ, প্রতিভাশূন্য, দুঃখবহুল এই অশেষ জগৎ,—নিত্য সুখজ্ঞানরূপী অনন্ত যে আপনি, সেই আপনাতে মায়াবশে উদ্ভূত হয় বোলে উহা সৎপদার্থের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

"হে জগন্নাথ! একমাত্র আপনিই পুরাতন পুরুষ, স্বয়ং জ্যোতিঃ, অনন্ত, আদ্য, নিত্য, অক্ষয়, অজ, অজস্র-সুখস্বরূপ, নিরঞ্জন, পূর্ণ, অদ্বয়, উপাধিমুক্ত অমৃত স্বরূপ।

"হে প্রভো! এইরূপ সকল আত্মার আত্মস্বরূপ আপনাকে যাঁরা প্রত্যগাত্ম স্বরূপে, যাঁরা গুরুরূপ সূর্য হতে লব্ধ-জ্ঞান উত্তম চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন, তাঁরাই এই মিথ্যা ভবাম্বুধি অনায়াসে পার হন।"—ইতি শ্রীমদ্ভাগবতি॥ ১২।৪।৫২

।। অতিমোক্ষ ।।

"জ্ঞানীরা আত্মাতে উদ্ভূত এই সংসারকে স্বরূপতঃ আত্মারূপে জানেন; তাঁরা জানেন অজ্ঞান দ্বারা সকল প্রপঞ্চ তোমাতে প্রতিভাত হয়, আবার জ্ঞান দ্বারাই উহা লীন হয়—যেমন রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান অজ্ঞানে এবং তার তিরোভাব জ্ঞানে দৃষ্ট হয়।

"হে ভগবান্! অজ্ঞানহেতু সংজ্ঞা যাদের, সেই ভববন্ধ ও ভবমোক্ষ দুটোই স্বরূপতঃ অব্যভিচারী জ্ঞান হতে ভিন্ন নয়; কারণ অখণ্ডানুভবস্বরূপ বিশুদ্ধ আত্মার বিচার করলে তাতে অজ্ঞান ও বন্ধ ভাব নেই—সেইরূপ জ্ঞান ও মোক্ষ নেই, যেমন সূর্যে দিবা ও রাত্রি নেই।

"হে প্রভো! আপনি আত্মা। আপনাকে পর মনে কোরে এবং পরকে আত্মা মনে কোরে বাহিরে যারা আপনার অন্বেষণ করে তাদের অজ্ঞতা কী চমৎকারিণী!"—ইতি বিষ্ণু ভাগবতি॥ ১৩।৪।৫২

॥ মহালক্ষ্মী স্তুতি ॥

মাগো! তুমি শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বরূপ; তুমি ক্রোধ হিংসাবর্জিতা বরদা শুভা, পরমার্থ ও দাস্য ভক্তিপ্রদা। মা তুমি ভিন্ন এ জগৎ ভস্মসদৃশ অসার, সর্বপ্রাণী জীবন্মৃত—এ বিশ্ব শবতুল্য। তুমি সন্তুষ্টা না থাকলে বন্ধুরাও কথা বলে না। তুমি যাদের প্রতি প্রসন্না তারাই সবান্ধব; ধর্মার্থকাম মোক্ষের তুমিই কারণ স্বরূপা। স্তনান্ধ শিশুর যেমন মা ছাড়া আর গতি নেই, সমস্ত বিশ্বেরও সেইরূপ তুমি ছাড়া আর গতি নেই। স্তন্যহীন শিশু কতদিন বাঁচে, হয়ত সেও দৈবযোগে বাঁচতে পারে, কিন্তু তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে জীব একদিনও জীবন ধারণ করতে পাবে না। অই প্রসন্নময়ি! আমার প্রতি প্রসন্না হও, তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকুক। তোমার দৈবী মায়া যেন আমাদের বিমুগ্ধ না করে। ১৪।৪।৫২

॥ গণপতি স্তোত্রম্ ॥

"অজং নির্বিকল্পং নিরাকারমেকং
চিরানন্দমানন্দমদ্বৈতপূর্ণম্।
পরং নিগুর্ণং নির্বিশেষং নিরীহং
পরব্রহ্মরূপং গণেশং ভজাম॥
গুণাতীতমানং চিদানন্দরূপং
চিদাভাসকং সর্বগং জ্ঞানগম্যম্।
মুনিধ্যেয়মাকাশরূপং পরেশং
পরব্রহ্মরূপং গণেশং ভজাম॥
জগৎ কারণং কারণজ্ঞানরূপং
সুরাদিং সুখাদিং গুণেশং গণেশম্।

জগদ্ব্যাপিনং বিশ্ববন্দ্যং সুরেশং
পরব্রহ্মরূপং গণেশং ভজাম ॥
রাজযোগতো ব্রহ্মরূপং শ্রুতিজ্ঞং
সদাকার্য্যসক্তং হৃদাঽচিন্ত্যরূপম্ ।
জগৎ কারণং সর্ববিদ্যানিদানং
পরব্রহ্মরূপং গণেশং নতাঃ স্ম ॥" (ঋষিকৃত) ॥ ১৫।৪।৫২

।। প্রভুর প্রার্থনা ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাড়োয়ারী ভক্তদের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন—"হে গোবিন্দ! তুমি আমার আত্মা, তুমি আমার প্রাণ! হে গোবিন্দ! তোমার জয় হোক! তোমার নামের জয় জয়াকার হোক! তুমি সচ্চিদানন্দ-ঘন! হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ। মন কৃষ্ণ! প্রাণ কৃষ্ণ! আত্মা কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ! জাতি কৃষ্ণ! কুল কৃষ্ণ! গোবিন্দ হে প্রাণ মম জীবনম্।" —বলতে বলতে সমাধিস্থ হলেন—

"ডুব ডুব রূপ সাগরে ডুবল আমার মন
তলাতল খুঁজলে পাতাল পাবিরে প্রেমরত্নধন।"

হে রামকৃষ্ণ! তুমি সত্যস্বরূপ! তুমি জ্ঞানস্বরূপ! তুমি আনন্দস্বরূপ! তুমি প্রেমস্বরূপ! তুমি মাধুর্যঘন! ১৬।৪।৫২

।। দেবীস্তুতি ।।

"ভবানি স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্ন বদনৈঃ
প্রজানামীশো ন ত্রিপুর-মথনঃ পঞ্চভিরপি।
ন ষড়ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ ॥
ঘৃতক্ষীরদ্রাক্ষামধুমধুরিমা কৈরপি পদৈ
র্বিশিষ্যানাখ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্র বিষয়ঃ।

তথাতে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ং
কথঙ্কারং ব্রূমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে ॥
মুখে তে তাম্বুলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা ।
স্ফুরৎ কাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী ।
ভজামস্ত্বাং গৌরীং নগপতিকিশোরীমবিরতাম্ ॥"
—ইতি লঘু আনন্দলহরী, শ্রীশংকর ॥ ১৭।৪।৫২

॥ গঙ্গাষ্টকম্ ॥

"অভিনববিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো
র্মদনমথনমৌলের্মালতী পুষ্পমালা ।
জয়তি জয় পতকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী
ক্ষপিত কলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ॥
"গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারি-চরণচ্যুতম্ ।
ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥
পাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি, দূরপ্রচারি গিরিরাজ গুহাবিদারি ।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজো বিহারি, গাঙ্গ্যং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥"
—শ্রীবাল্মীকি ॥ ১৮।৪।৫২

॥ শ্রীদুর্গাক্ষমাপণ স্তোত্র ॥

"শিশৌ নাসীন্ বাক্যং জননি তব মন্ত্রং প্রজপিতুং
কিশোরে বিদ্যায়াং বিষম বিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ ।
ইদানীং ভীতোঽহং মহিষগলঘণ্টাঘনরবাৎ
নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণম্ ॥
হরিঃ শেতে শেষে নমু কমলজো নাভিকমলে
সমাধৌ সংলীনঃ পুরমথনদেবঃ প্রতিদিনম্ ।

ভবাদ্ভীতো মাতঃ পদকমলযুগ্মং তব বিনা
নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণম্ ॥"

—শ্রীশঙ্কর ॥ ১৯।৪।৫২

॥ জগদ্ধাত্রী স্তুতি ॥

"আধার ভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রী নামোঽস্তুতে ॥
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তি-বিগ্রহে।
শাক্তাচার প্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥
জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপূজিতে।
জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥
পরমাণু স্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদি স্বরূপিণি।
স্থূলাতি স্থূলরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥
সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥
কালাদিরূপে কালেশে কালাকাল বিভেদিনি।
সর্বস্বরূপে সর্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥
তীর্থযজ্ঞ তপোদান যোগসারে জগন্ময়ি।
ত্বমেব সর্বং সর্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥
দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়াদ্রে দুঃখ-মোচিনি।
সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥
অগম্য ধামধামস্থে মহাযোগীশ হৃৎপুরে।
অমেয় ভাব কূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥

—ইতি জগদ্ধাত্রী কল্পে ॥ ২০।৪।৫২

।। বিরহ ।।

তোমারি নাম বলবো নানা ছলে।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ

—০—

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ

—০—

অব মথুরাপুর মাধব গেল, গোকুল মাণিক সখি কো হরি নেল।
(ওকে হরি নিল গো—প্রাণের হরি, ব্রজপুরী আঁধার করি,
হিয়ার মাণিক প্রাণ মন শূন্য করি—ওকে হরে নিল গো)
গোকুল উছলল করুণার রোল, নয়নের জলে হের বহয় হিল্লোল
(আজি উদ্বেলিল, যমুনাজল, ব্রজ গোপিনীর নয়ন জলে)
শূন্য ভেল মন্দির, শূন্য ভেল নগরী, শূন্য ভেল দশদিশ, শূন্য ভেল সগরী।
সব শূন্য হল, এক বিনে সব, এক ভানু কানু বিনে)
কৈছন যাওব যমুনাকী তীর, কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর
সহচরী সঙ্গে যাঁহা করল ফুল খেরি, কৈছন জীয়ব তাহি নেহারি,
(আমি বাঁচি কেমনে—হেরে যমুনা—কুঞ্জ হেরে—)।
যমুনা পুলিন বিহারী ছাড়ি, কুঞ্জ কাননচারী ছাড়ি, কুঞ্জ হেরে—)
ভনয়ে বিদ্যাপতি করি অবধান কৌতুকে ছাপি, তঁহি রহু কানা।
—শ্রীবিদ্যাপতি ॥ ২১।৪।৫২

।। দীনতা ও কৃচ্ছ্রতা ।।

হে গুরু! তোমারই ইচ্ছায় ভক্তের নিকটও দীনতা ও কৃচ্ছ্রতা এসে উপস্থিত হয়। তার জন্য তাকে অনেক সহ্য করতে হয়। মনে হয় যেন তুমি তাকে ভুলে গেছ, কিন্তু বাস্তবিক সে তো তোমাতেই বাস করছে। দুঃখ দারিদ্র্য সহনের দ্বারা সে পবিত্রতর হয়ে ওঠে, যেন শ্রীরামকৃষ্ণলোকে তোমার সভায় উপযুক্ত পার্ষদত্ব সে লাভ করে।

হে প্রভু! এ দুঃখ দারিদ্র্য দীনতা ও হীনতার মধ্যে তুমি ছাড়া ভক্তকে কে আর শান্তি দিতে পারে। হে স্বর্গীয় বৈদ্য! জীবাত্মার চিকিৎসার জন্য তোমার

অমৃত হস্ত সদা প্রসারিত। হে জ্ঞানদাতা গুরু! বিনয়াবনত চিত্তে আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২।৪।৫২

।। আশীর্বাদ ।।

হে প্রভু! আমাকে তোমার কথার অনুযায়ী চলার সামর্থ্য দাও। সংসারের কথায় যেন প্রলুব্ধ না হই, তোমার ইচ্ছা যেন আমার চিত্তকে সর্বদা সূর্যের আলোর ন্যায় আলোকিত করে। হে প্রভু! তোমার নিকট হতে যে জীবনের কল্যাণাশীর্বাদ আমার চিত্তে প্রবাহিত হচ্ছে, তার জন্য কতটা কৃতজ্ঞতা আমি তোমার নিকট প্রকাশ করি? কতবার তোমার জয় উচ্চারণ করি। তোমার কৃপাস্পর্শিতদের মধ্যে তো আমি দেখি নিজেকে সর্বনিকৃষ্ট। পুনঃপুনঃ তোমার দয়া ও ক্ষমা আমাকে লজ্জিত করে, পরন্তু আমার অসমর্থতায় তোমার ভালবাসা যেন আরও উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। ২৩।৪।৫২

।। ক্ষমাপ্রার্থনা ।।

"ব্রহ্মবিষ্ণুস্তথেশঃ পরিণমতি সদা ত্বৎপাদাম্ভোজযুগ্মং
ভাগ্যাভাবান্ন চাহং ভবজননি ভবৎপাদপদ্মং ভজামি।
নিত্যং লোভ-প্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকস্ত্বাং প্রযাচে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিত রদনে কামরূপে করালে॥
রাগদ্বেষ প্রমত্তঃ কলুষযুততনুঃ কামভোগপ্রলুব্ধঃ
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌলসঙ্গৈর্বিহীনঃ।
ক্বধ্যানং তে ক্ব চার্চ্চা ক্ব চ মনুজপনং নৈবকিঞ্চিৎ কৃতো মে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিত রদনে কামরূপে করালে॥"

—শ্রীশঙ্কর॥ ২৪।৪।৫২

।। গঙ্গাষ্টকম্ ।।

"ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লিমুল্লসয়ন্তী
স্বর্লোকাদপতন্তী কনক-গিরিগুহা গণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী।

ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচয়চমূর্ণির্ভরং ভৎ'সয়ন্তী
পাথোদধিং পূরয়ন্তী সুরনগরসরিৎ পাবনী নঃ পুনাতু ॥
আদাবাদিপিতামহস্য নিয়মব্যাপার পাত্রে জলং
পাশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্ ।
ভূয়ঃশম্ভুজটা বিভূষণ মুনির্জহ্নোর্মহর্ষেরিয়ং
কন্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥"

—শ্রীশঙ্কর ॥ ২৫।৪।৫২

॥ বুড়ীর ইচ্ছা ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার বলেছিলেন, 'মহামায়ার ইচ্ছা নয় যে সব জীব এখুনি মুক্ত হয়ে যায়! বুড়ীর ইচ্ছা খেলা চলতে থাক। তাই জীব সংসারে জড়িয়ে আছে।' মন! মনে রেখ, এ সংসারে কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না। এ সংসারে তুমি বৃথা ঘুরে মলে, মায়ার ফাঁদে পড়ে যেন দক্ষিণাকালীর নাম ভুলো না। দিন কতক লোকে তোমাকে সম্মান করবে, কিন্তু জেন তোমার ঐ দেহ লোকে ফেলে দেবে যখন কাল এসে সামনে দাঁড়াবে। সারা জীবন যাদের ভাল বেসেছ, তারাও তোমার শরীর অশুচি বলে আর ছোঁবে না, শ্মশানে দিয়ে 'হরি হরি' বলে চলে আসবে, অতএব হরি-নামই সত্য। ২৬।৪।৫২

॥ দেবীস্তোত্র ॥

"অথানন্দময়ীং সাক্ষাচ্ছব্দব্রহ্ম-স্বরূপিণীম্ ।
ঈড়ে সকল সম্পত্ত্যৈ জগৎকারণমম্বিকাম্ ॥
আদ্যামশেষ জননী মরবিন্দযোনে, র্বিষ্ণোঃ শিবস্য চ বপুঃ প্রতিপাদয়িত্রীম্ ।
সৃষ্টিস্থিতি ক্ষয়করীংজগতাং ত্রয়াণাং, স্তুত্বাগিরং বিমলয়াম্যহম্বিকে ত্বাম্ ॥
"পৃথ্ব্যা জলেন শিখিনা মরুতাম্বরেণ
হোত্রেন্দুনা দিনকরেণ চ মূর্ত্তিভাজঃ ।
দেবস্য মন্মথরিপোরপি শক্তিমত্তা-
হেতুস্ত্বমেব খলু পর্বতরাজ পুত্রি ॥"—

—ইতি শ্রীভুবনেশ্বরী স্তোত্রে ॥ ২৭।৪।৫২

।। কেন সংসারে এলে ? ।।

হে মন ! প্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা কর। তিনি নরকদোষাপহারী। তিনি মৃত্যু অপহারী। তাঁর ধ্যানে সংসার দুঃখ অপগত হয়। চক্ষের নিমেষে সংসার সমুদ্র পার হয়ে আনন্দধামের তীরে জীবন তরী ভেড়ে। মন ! ভেবেছ কি, কেন তুমি সংসারে এলে ? অসৎ কর্ম ও চিন্তার ফল কী ? এ সংসারে আর কতকাল যাতায়াত করবে ? নিজ চিত্তমল ধৌত কর। অনাদি অনন্ত হরির গভীর ধ্যানে নিজ চিত্ত মার্জিত কর। দিব্য শরীর লাভ কর ! ২৮।৪।৫২

।। প্রেম ।।

"পহেলেহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ॥
না সো রমণ, না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি ॥"—শ্রীচণ্ডীদাস

"চারি চক্ষুর মিলন হলো, আত্মাদ্বয়ে এলো রূপান্তর
এখন মনে নাই 'সে ছিল পুরুষ, আমি রমণী'
কি, 'আমি পুরুষ, সে ছিল রমণী' !
একটু শুধু স্মৃতি ভেসে আসে, অতীতে ছিল দুইজন
কিন্তু প্রেম আসি দুঁহারে করিল শুধু একম্ অদ্বিতীয়ম্ !
—(একটি পার্শী সুফী কবিতাবলম্বনে) ॥ ২৯।৪।৫২

।। যদি শান্তি চাও ।।

হে মন ! যদি শান্তি চাও তাঁর শরণ লও ; আর কোথায়ও সান্ত্বনা পাবে না। ঠাকুর আমাদের শান্তিময়, সেই জন্য চরম-শান্তি তাঁরই কাছে লভ্য। তিনি গরীবের পিতামাতা ও উৎপীড়িতের বন্ধু। তাঁর কথার অনুসরণ কোরে কিছুদিন অপেক্ষা কর, বুঝতে পারবে তিনি কী পুরস্কার দান করেন, তাঁর দান জাগতিক সকল দানকেই উপেক্ষা করে। নিরপেক্ষ ভাবে ব্যবহারিক জগতে কার্য কর, কিন্তু সর্বদা তাঁর সঙ্গই তোমার একমাত্র কাম্য হোক। কুণ্ঠিত

জগতের প্রাচুর্য এলেই বৈকুণ্ঠের প্রাচুর্য তিরোহিত হবে। জীবন ধারণের উপযোগী বস্তু সংগ্রহ কর, কিন্তু অনন্তকে আকাঙ্ক্ষা কর। হে অমৃতের পুত্র! অমৃতকে আকাঙ্ক্ষা কর, মৃত বস্তুতে তোমার প্রয়োজন কি? ৩০।৪।৫২

॥ অন্নপূর্ণাস্তুতি ॥

"কৈলাসাচল কন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঁকার বীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্ন-পূর্ণেশ্বরি॥
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতি।
মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ
বান্ধবাঃ শিব ভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥—শ্রীশংকর॥ ১।৫।৫২

॥ ক্ষীর-ভবানী ॥

ক্ষীর-ভবানী দর্শনের পর বিবেকানন্দের মনের ভাব কি অদ্ভুত বৈরাগ্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো—'মা তুমিই ইন্দ্রিয়, তুমিই যন্ত্রনা! তুমিই যন্ত্রনা দাও! কালী! কালী! ভয় করি না মা! আর ভিক্ষা চাই না মা'—"এবার ধরব চরণ লব জোরে"—'পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান চাই মা! মায়ের ভক্ত পাষাণের মত কঠিন, জগৎ চূর্ণ হয়ে যাক পায়ের তলায়, তাতেই বা ক্ষতি কি! মা আমার কথা শুনতেই হবে, আমাকে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী করতেই হবে! মন আর কেঁদে কি হবে, মনে রেখ মা সর্বশক্তিময়ী, তিনি একটা নুড়ি থেকে মহাপুরুষ সৃষ্টি করতে পারেন। তুমি কি চাও মা, চিরকালই এই সব পুতুল নিয়ে খেলা করি, চিরকালই কি তোমার সচ্চিদানন্দস্পর্শ থেকে দূরে রেখে দেবে!' "ছাড় ছাড় যদি বল মা তবু না ছাড়িব। রতন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব।" ২।৫।৫২

।। শ্রীরামচন্দ্র স্তুতি ।।

"রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥"

—ইতি শ্রীরামাষ্টোত্তর শত নামে॥

শ্রীরামচন্দ্র-চরণৌ মনসা স্মরামি
শ্রীরামচন্দ্র-চরণৌ বচসা গৃণামি।
শ্রীরামচন্দ্র-চরণৌ শিরসা নমামি
শ্রীরামচন্দ্র-চরণৌ শরণং প্রপদ্যে॥
মাতা রামো মৎ পিতা রামচন্দ্রঃ
স্বামী রামো মৎ সখো রামচন্দ্রঃ।
সর্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালু-
র্ণান্যং জানে নৈব জানে ন জানে॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠাম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শরণং প্রপদ্যে॥
আপদামপাহর্ত্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥
কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ়ং কবিতা শাখং বন্দে বাল্মীকি-কোকিলম্॥ ৩।৫।৫২

।। শ্রীরাম-স্তবরাজ ।।

"ত্রৈলোক্যনাথং সরসীরুহাক্ষং
দয়ানিধিং দ্বন্দ্ববিনাশহেতুম্।
মহাবলং বেদনিধিং সুরেশং
সনাতনং রামমহং ভজামি॥
বেদান্তবেদ্যং কবিমীশিতার-
মনাদিমধ্যান্তমচিন্ত্যমাদ্যম্।
অগোচরং নির্মলমেকরূপং
নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ॥

অশেষবেদাত্মকমাদিসংজ্ঞ-
মজং হরিং বিষ্ণুমনন্তমাত্তম্।
অপার সংবিৎ সুখমেকরূপং
পরাৎপরং রামমহং ভজামি॥
তত্ত্বস্বরূপং পুরুষং পুরাণং
স্বতেজসা পূরিত বিশ্বমেকম্।
রাজাধিরাজং রবিমণ্ডলস্থং
বিশ্বেশ্বরং রামমহং ভজামি॥"
—ইতি সনৎকুমার সংহিতায়াং শ্রীরামস্তবরাজঃ॥ ৪।৫।৫২

॥ বিরহ ॥

"নৈন লল চারত জীয়রা উদাসী
সবঁল বনমেঁ বাজে সঁবলকী বাঁসী।
রৈণ মেঁ সৈন মেঁ মোরা নৈনা না লাগৈ
পীতমকে শ্বাস আবে কুসুম সুবাসী॥"—মীরা
[নয়ন লালায়িত জীবন উদাসী
শ্যামল বনে বাজে শ্যামল বাঁশী
রজনী শয়নে নিদ নাহি নয়নে
প্রিয়তম শ্বাস আসে কুসুম সুবাসী॥] ৫।৫।৫২

॥ বিরহ ॥

"মহাঁরে জনম মরণকে সাথী
থাঁনে নহিঁ বিসরূঁ দিনরাতী।
তুম দেখ্যা বিন কল ন পড়ত হৈ
জানত মেরী ছাতী॥
উঁচী চঢ় চঢ় পংথ নিহারূঁ
রোয়ে রোয়ে আঁখিয়া রাতী॥"

[আমার জীবন মরণকে সাথী
তোমারে বিসরি যেন না থাকে দিনরাতি ।
তব দরশন বিনা অন্তরেতে শান্তি কোথা পাই
কী ব্যথা হৃদয় মোর জানে ;
উঠি উঠি পন্থ নেহারি গো
কেঁদে কেঁদে আঁখিতে নামিয়া এলো রাতি ॥]

"মীরাকে প্রভু পরম মনোহর
হরিচরণা চির রাতী ।
পল পল তেরা রূপ নিহারু
নিরখ নিরখ সুখ পাতী ॥"—মীরা ॥

[মীরার প্রভু পরম মনোহর, হরিপদ চির অনুরাগী
নিমেষে নিমেষে তব রূপ নেহারি, নিরখি নিরখি সুখ পাই ॥] ৬।৫।৫২

॥ পারমহংস্য বিজ্ঞানস্তুতি ॥

"শান্তৈরনন্যমতিভির্মধুরস্বভাবৈ-
রেকত্ব নিশ্চিতমলোভিরপেতমোহৈঃ ।
সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদস্বরূপং
শাস্ত্রেষু সম্যগনিশং বিমৃশন্তি ধন্যাঃ ॥

ধন্য পুরুষেরা প্রশান্ত ভাব, অনন্যমতি, মধুর প্রকৃতি, একত্ব নিশ্চিত, মোহশূন্য যোগীদের সহিত অরণ্যে শাস্ত্রানুশীলন পূর্বক বিজিত আত্মপদ হয়ে বিচরণ করেন ।

"অহিমিব জনযোগং সর্বদা বর্জযেদ্ যঃ
কুণপমিব সুনারীং তক্ত্যু কামো বিরাগী ।
বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্যমানো দুরন্তান্
জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি ॥

যাঁরা জন-সঙ্গ সাপের ন্যায় ত্যাগ করেছেন, যে বিরাগী শব শরীরের ন্যায় সুন্দরী রমণীকে দূরে পরিহার করেন, দুরন্ত বিষের ন্যায় যিনি বিষয় পরিত্যাগ করেছেন, সেই মুক্তিভাব প্রাপ্ত পরমহংসের জয় হোক ।

"সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমা
গাঙ্গ্যং বারি সমস্তবারি নিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
সর্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরব্রহ্মণি॥"

পরব্রহ্ম দর্শন হলে সমস্ত জগৎ নন্দন বন বলে বোধ হয়, সকল বৃক্ষই কল্পতরু, সকল জলই গঙ্গা বারি, সমস্ত ক্রিয়াই পুণ্য ক্রিয়া, প্রাকৃত ও সংস্কৃত সকল বাক্যই শ্রুতি শিরঃ বেদান্ত বাক্যবৎ, সমস্ত মেদিনী বারাণসী বলে বোধ হয়, সর্বাবস্থাই তাঁর ব্রহ্মবস্তু বিষয়ক বলে বোধ হয়।—ধন্যাষ্টকে, শ্রীশঙ্কর॥ ৭।৫।৫২

॥ মহাবাক্য ভাবনা ॥

অহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ।
চিদহং চিদহং চেতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
ব্রহ্মৈবাহং চিদেবাহং পরোবাহং ন সংশয়ঃ।
স্বয়মেব স্বয়ং হংসঃ স্বয়মেব স্বয়ং স্থিতঃ॥
স্বয়মেব স্বয়ং পশ্যেৎ স্বাত্মরাজ্যে সুখং বসেৎ।
স্বাত্মানন্দং স্বয়ং ভোক্ষ্যেৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
স্বয়মেবৈকবীরোঽগ্রে স্বয়মেব প্রভুঃ স্মৃতঃ।
স্বস্বরূপে স্বয়ং স্বপ্স্যেৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
ব্রহ্মভূত প্রশান্তাত্মা ব্রহ্মানন্দময়ঃ সুখী।
স্বচ্ছরূপো মহামৌনী বৈদেহী মুক্ত এবসঃ॥
আনন্দাত্মা প্রিয়ো হ্যাত্মা মোক্ষাত্মা বন্ধবর্জিতঃ।
বহ্মৈবাহং চিদেবাহমেবং বাপি ন চিন্তয়েৎ॥

—তেজবিন্দূপনিষদি॥ ৮।৫।৫২

॥ বৈশাখী পূর্ণিমা ॥

আজ শ্রীবুদ্ধ পূর্ণিমা। হে প্রভু আমার শুভ চেষ্টায় সাহায্য কর, তোমার সেবাকার্যে আমার হৃদয়ে বল দাও। আমি যেন সারাদিন সত্য পথে চলতে

পারি। পূর্ণিমার চাঁদ পৃথিবীকে আলো করে, বুদ্ধের জ্ঞানে জগৎ আলোকিত ও জীবন্ত। শ্রীবুদ্ধ প্রদীপের মত, নিজে জ্বলে জগৎকে আলোক প্রদান করেন। অনন্ত তাঁর স্নেহ, সেই জন্য বুদ্ধ-প্রদীপ কখন নির্বাপিত হয় না। শ্রীবুদ্ধ ধূপের মত, নিজে পুড়ে অপরকে গন্ধ দান করেন, ত্রিকাল তাঁর গন্ধে আমোদিত। সে বিমলকীর্তির শেষ নেই, তাই সে গন্ধও অনাদি ও অনন্ত। শ্রীবুদ্ধ সূর্যের মত, তাঁতে অন্ধকার নেই। পৃথিবী তাঁর বিপরীত মুখী হয় বলে, তার হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। সূর্যের আলো অক্ষিদেবতা সাপেক্ষ—শ্রীবুদ্ধ কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ। ৯।৫।৫২

।। আত্মসমর্পণ ।।

ঠাকুর! তোমাকে "বক্‌লমা" দেওয়ার অর্থ আমরা বুঝতে পারি না, কারণ আমাদের অহংকার অত্যন্ত বেশী। তবে ধীরেধীরে কৃপা কোরে যখন তুমি আমাদের অহংকারের মধ্যেও প্রবেশ কর, তখন মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই তোমায় বক্‌লমা দেয়, তখন তোমার যজনা করে, তোমার ভক্ত হয়, তোমাকে নমস্কার করে। তখন ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে, "তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।"

হে ঠাকুর! তুমি তোমার সন্তানের হৃদয়ব্যথা জান, তাদের ক্রন্দন তোমার কর্ণকে স্পর্শ করে, তাদের শুভেচ্ছা তুমি সর্বদা পূর্ণ কর, তোমার কৃপার ও ক্ষমার অবধি নেই। এই সৃষ্টিতে তোমার নামই জয়যুক্ত হয়ে আছে। ১০।৫।৫২

।। প্রার্থনা ।।

ঠাকুর! আমরা বাহ্য অসতের সহিত সংগ্রাম করি, লোকচক্ষে ভাল হবার জন্য, অথবা আবেষ্টনার ভয়ে; কিন্তু আমাদের অন্তর্নিহিত কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতার হাত হতে কবে মুক্ত হব। হে প্রভু! মনের হিংসা নাশ কর, মনের লোভ সংযত কর, মনের ঈর্ষা দমন কর, যেন আমরা বাহ্য কাম্য ও লোভনীয় বস্তুকে জয় করতে পারি, স্বাভাবিক রূপে। এ সব অনাদি সংস্কার-রূপে আমাদের হৃদয়ে চিরন্তনী হয়ে রয়েছে, তোমার সচ্চিদানন্দরূপ প্রতিভাত

হয়ে যেন এদের নিঃশক্তি করে, এরা নির্বীর্য হয়ে মিলিয়ে যায়। হে প্রভু! আমরা তোমার জয়গান করি। ১১।৫।৫২

॥ প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি ॥

"হে প্রেম! কহ সে তব শান্ত স্নিগ্ধ বাণী,
মায়া সৃষ্টি যাহার স্পন্দনে লয় পায়,
স্তরে স্তরে ছায়া স্বপ্ন আর
হের সব শূন্যেতে মিলায়।"—শ্রীবিবেকানন্দ ॥
(অনুবাদক স্বামী প্রজ্ঞানন্দ)

—০—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো ন কই
যাকে শিরে ময়ূর মুকুট মেরো পতি সই
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল হোই ॥
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোই,
অবতো বাত ফৈল গয়ী জানে সব কোই ॥
সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই।
ছোড়ি দেই কুল কি কাজ ক্যা করেগা কোই ॥
অঁসুঅন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম বীজ বোই।
মীরা প্রভু লগন লাগি, জো হোয় সো হোই ॥
—মীরাবাই ॥ ১২।৫।৫২

॥ "হবে জয়" ॥

হে মন। যত উর্ধ্বগামী হবে, গমন পথ তত খাড়াই, আর পায়ের নীচের খাদ তত গভীর বলে বোধ হবে, একবার পা পিছলুলে আর নিস্তার নেই। যত ওপরে উঠবে পরিশ্রম তত প্রবল। নিরুৎসাহ হয়ো না, সত্যের জন্য সংগ্রাম ভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায় না। "সাথে আছে ভগবান হবে জয়"—মিশরের মরুভূমি থেকে তিনিই অদৃশ্যে থেকে পথ দেখিয়ে 'দুগ্ধ ও মধুর রাজ্যে' ভক্তদের নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁতে বিশ্বাস দৃঢ় কর, ভয় পেয় না, ইন্দ্রিয় ভোগের প্রলোভন

বাক্যে মুগ্ধ হয়ো না, তাঁর প্রদর্শিত চিহ্ন ও বাণীর দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চল! "যে এখানে আসবে তার শেষ জন্ম"—এ কথা কখনও ব্যর্থ হবে না। যিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি ছাড়া আর কে আমাদের আনন্দ দিতে পারে! ১৩।৫।৫২

।। রূপ ও আদর্শ ।।

হে প্রভু! প্রস্তরে রূপ ও আদর্শ স্থাপন করেছিলুম—প্রস্তর নিরুত্তর। এখন যে আলোকে প্রস্তরে রূপ ফুটে ওঠে সেই দিব্যালোককে নমস্কার করি! যে ভাবাদর্শের আকর্ষণে হৃদয় প্রস্তরে আত্মদান করেছিল, সেই আনন্দস্বরূপ ভাবাদর্শকে নমস্কার করি।

আজ প্রস্তর চূর্ণ করেছি, তাই তোমার বিশুদ্ধরূপ আমার হৃদয় অধিকার করেছে, তাই আজ আমার ভাবাদর্শের বিমলস্পর্শ আমার হৃদয়কে আনন্দময় কোরে তুলেছে। যে তৃপ্তির সন্ধানে এতকাল ঘুরে বেড়িয়েছি, সেই অমৃত উৎসের সন্ধান আজ আমার অন্তস্তলে স্ফুরিত হয়েছে। হে আনন্দরূপ! তোমাকে সভক্তি নমস্কার। হে নির্ঝর! তুমি আমাতে অনন্ত অভিব্যক্তিরূপে চির-বর্তমান থাক।—সুফী জামীর॥ ১৪।৫।৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে প্রভু! হে প্রিয়তম! আমার চিত্তকে তুমি ভালবেসেছ, সেই জন্য তোমার স্নেহবক্ষে সে ছুটে যেতে চায়; সম্মুখে প্রবল দুঃখের বন্যাগত, চারিপাশে সংঘর্ষের ঝটিকা। তোমার স্নেহময় পক্ষপুটে আমাকে লুকিয়ে রাখ। জীবনের ঝড় অবসান হোক। হে পথনেতা! নিরাপদে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল—আমি তোমাতে আত্মসমর্পন করছি। আর তো আমার অবলম্বন কিছু নেই, সেইজন্য সর্ব ভার আমি তোমাতে চাপিয়ে দিয়েছি। তুমিই আমাকে ধরেছ, আমি তোমাকে কিরূপে ধরব? অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় তোমায় কে ধরতে পারে বল, তুমি নিজে ধরা না দিলে। প্রভু হে! তুমিই আমার আশ্রয়, তুমিই আমার শান্তি। ১৫।৫।৫২

।। মনন ।।

হে জীব ! তোমার অভ্যাস ও প্রকৃতি তোমাকে অতি গুরুতর অবস্থায় এনেছে। ভ্রান্তি তোমার হৃদয়রাজ্য অধিকার করেছে—সদসৎ বুঝবে কি করে ? কী ভীষণ কাল—মহামায়া ভ্রান্তিরূপে সকল মানব-মানবীকে আচ্ছন্ন করেছেন—ফল ধ্বংস, অনন্ত নিরয়। এ কাজের কর্তা হলো অবিচার, কর্মপদ্ধতি নিষ্ঠুরতা, শেষ হলো নিরর্থকতা।

জগতের উপায় কি নেই ? আছে, ভগবৎ কৃপাস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী। ভক্তি-নম্র চিত্তে তাঁর আশ্রয় নাও বিশ্রাম পাবে, তাঁর অনুসরণ কর শান্তি পাবে, শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর শক্তিলাভ করবে। তিনি তোমায় ভালবাসেন, তুমি তাঁর দিকে ফিরে তাকাও, সচ্চিদানন্দে জীবন আলোকিত হয়ে উঠুক। ১৬।৫।৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে ভগবান ! সাংসারিক মিথ্যা জাঁকজমক হতে রক্ষা কর, বস্তুর যা স্বরূপ, আমাদের তা দেখিয়ে দাও। অজ্ঞানের আবরণ আমাদের চক্ষু হতে অপসারণ কর, বস্তুর স্বরূপ আমরা যেন অবগত হই। অসত্যকে সত্যের মত আমাদের নিকট ধোরো না, অথবা সত্তার সৌন্দর্যের ওপর অসত্যের অবগুণ্ঠন টেনে দিও না। ব্যক্ত জগৎ দর্পণের মত স্বচ্ছ কর, যেন তোমার সৌন্দর্য তাতে প্রতিফলিত হয়, তাতে যেন এমন অবগুণ্ঠন টেনে দিও না, যেন তোমাকে আমাদের থেকে একেবারে পৃথক ও দূরীভূত করে। এ অসৎ অভিব্যক্তি আমাদের জ্ঞানের দ্বারা স্বরূপ প্রাপ্ত হোক, আমাদের অন্তর দৃষ্টি খুলুক, জগৎ যেন আমাদের জন্য অন্ধতা বা অজ্ঞান না নিয়ে আসে। তোমার সৌন্দর্য হতে বিচ্ছেদ বা মিলন আমাদের থেকেই নিঃসৃত হয়। অহং থেকে নিস্তার দাও, তোমার যথার্থ জ্ঞান লাভ করি।—সুফী লাওয়াইহি॥ ১৭।৫।৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে প্রভু! তোমার নিকটে আমরা বহুদেশ ও সমুদ্র অতিক্রম কোরে এসেছি। কত প্রান্তর, পর্বত অতিক্রম করেছি। কত প্রলোভন এসেছে, সকলকে প্রত্যাখ্যান করেছি; অবশেষে তোমার মিলন মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি।

হে প্রিয়! তোমার স্বরূপ হতে আমি দূরে থাকতে পারব না। স্বর্গ ও তার সৌন্দর্য সম্পদ আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি। প্রেমের প্রেরণায় আমার মস্তক তোমার দ্বার-প্রান্তে রেখেছি, কোন কিছু পাবার জন্য নয়। প্রভু হে! আর সব সহ্য করতে পারব, কেবল তোমার দুয়ার হতে আমায় দূরে রেখ না।

—সুফী বাহারিস্থান ॥ ১৮।৫।৫২

।। সরস্বতী স্তোত্র ।।

"হ্রীঁ হ্রীঁ হৃদ্যৈকবীজে শশিরুচিকমলকাননে ভ্রাজমানে
ভব্যে ভব্যানুকূলে কুমতিবনদবে বিশ্ব বন্দ্যাঙ্‌ঘ্রিপদ্মে।
পদ্মে পদ্মোপবিষ্টে প্রণতজনমনোমোদ সম্পাদয়ত্রি
প্রোৎফুল্লাজ্ঞানকূটে মুরহরদয়িতে দেবিসংসার সারে॥
ঐঁ ঐঁ ঐঁ ইষ্টমন্ত্রে কমলভবমুখাম্ভোজভূতিস্বরূপে
রূপারূপ প্রকাশে সকলগুণময়ে নির্গুণে নির্বিকারে।
ন স্থূলে নাপিসূক্ষ্মেঽপ্যবিদিতবিষয়ে নাপি বিজ্ঞাততত্ত্বে
বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবরনমিতে নিষ্কলে নিত্য শুদ্ধে॥
হ্রীঁ হ্রীঁ জাপতুষ্টে হিমরুচিমুকুটে বল্লকীব্যগ্র হস্তে
মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাম্।
বিদ্যে বেদান্ত গীতে শ্রুতি পরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তি মার্গে
মার্গাতীত-প্রভাবে ভব মম বরদা শারদে শুভ্রহারে॥"

—শ্রীব্রহ্মাকৃত ॥ ১৯।৫।৫২

॥ রামকৃষ্ণ ভজন ॥

"অরূপ সায়রে লীলা লহরী উঠিল মৃদুল করুণা বায়
আদি অন্তহীন অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানব কায়।"

—স্বামী প্রেমেশানন্দ।

—০—

হে গোবিন্দ রাখু শরণ অবতো জীবন হারে!
নীর পীবন হেতু গয়ো সিন্ধুকে কিনারে।
সিন্ধুবীচ বসত গ্রাহ চরণ ধরি পছারে॥
চার প্রহর যুধ ভয়ো লে গয়ো মাঝে ধারে
নাক কান ডুবানে লাগে কৃষ্ণকে পুকারে।
প্রভু কান শব্দে গই গরুড় পৌহুছি ধাই
গ্রাহকো মারি তো গজরাজকো উধারে॥
সুর কহে শ্যামসে, আশ হ্যায় তুমাহারে।
মেরি তোরা না ভয় হোই যমরাজকো দুবারে॥

—সুরদাস॥ ২০।৫।৫২

॥ মনন ॥

ওগো প্রাণপাখী! আর কতকাল বিশ্রামের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—এ লোক থেকে ও লোকে, এ দেহ থেকে ও দেহে! কবে তোমার সকল ভ্রমণের অভিজ্ঞান শেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ মাস্তলে আশ্রয় নেবে? পাখার বলের শেষ আছে, ঘুরে ঘুরে ক্রমেই যে দুর্বল হয়ে পড়ছো। সমুদ্রের তরঙ্গকুল সদা চঞ্চল, তাতে কি কোরে আশ্রয় নেবে? শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্তুল অটল অচল সুমেরুবৎ। তার পদতলে জীবনের সকল স্বাচ্ছন্দ্য পুঞ্জীভূত, ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়না শেষ হবে, জীবন সংগ্রামের অবসান হবে, শান্তিতে ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হতে পারবে, অপার আনন্দ লাভ করবে। ওঁশান্তিঃ। ২১।৫।৫২

।। খেলা মোর হলো শেষ ।।

"জন্ম হতে জন্মান্তরাবধি দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি
কভু দ্বার খুলিল না হায়।"—শ্রীবিবেকানন্দ ॥

(অনুবাদক—শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

—০—

মোরে দেহি দেবি দরশন।
আর দুখ দিও না দীনে দীনদয়াময়ী।
দনুজ দলনী দেবি, দেব আরাধ্য ধন ॥
জানি মা তব চরণ অপারের সুখ তরী
কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পাসরি;
তাই মা আকুল প্রাণে তোমার তরে নেহারি
লুকায়ে থেকো না কর দ্রুতপদে আগমন ॥
দীনতারিণি মম দিন আগত দেখি
দিনে রেতে তাই তোরে এত পরিত্রাহি ডাকি
জানি না জননি আর ক'দিন বা আছে বাকি
এই বেলা কর আসি দীনের দুঃখ মোচন ॥
সভয়ে ডাকি অভয়ে কর মা অভয় দান
ভব ভয় হোতে দীনরামে কর পরিত্রাণ
তুমি না করিলে দুঃখ কে করিবে অবসান
কুপুত্র হয় মা যদি কুমাতা নহে কখন ॥

—শ্রীদীনরাম ॥ ২২।৫।৫২

।। প্রণাম ।।

হে মাতর্গঙ্গে! তোমাকে নমস্কার! তোমার সুমধুর কলধ্বনি শ্রীরামকৃষ্ণ-চক্ষে কী শান্তিময় বিশ্রামই না এনে দিত। মা! কত কোরেই না তুমি সেই দেব-শিশুটীকে নিজ বক্ষপার্শ্বে পালন করেছ! হে জাহ্নবি! তোমাকে নমস্কার! তোমার আঁকা বাঁকা দুকূল ভাসান জোয়ার ভাঁটার অবিচ্ছিন্ন পটভূমিকায় সশিষ্য সেই মহামানবের চিত্র ফুটে উঠেছে। হে গঙ্গাতট নিবাসিনি দেবদেবি!

তোমাদের নমস্কার ! প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও গোধূলিকে চিহ্নিত কোরে তোমাদের ভোগারত্রিকের বাদ্য ধ্বনির মধুর কলরোল সে ধ্যেয়ানীর মৌন ভঙ্গ কোরে সঙ্গীত ও উপদেশামৃতে শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, বংশীকেও লজ্জিত করতো। হে সূর্য ! তোমাকে নমস্কার ! তোমার উদয়াস্ত সেই দিব্য জীবনী অরূপরূপ সংসর্গগন্ধে পুষ্পধূপকেও নিন্দিত কোরে পুণ্যময় হয়ে উঠতো। ২৩।৫।৫২

।। ধ্যান ।।

মধ্যাহ্নে দাউদাউ কোরে সূর্য আকাশে জ্বলে, কিন্তু শান্ত কুটির ছায়ায় ভাবমুগ্ধ ঐ আনন্দময় পুরুষকে নমস্কার করি। ভাগীরথীর প্রচণ্ড জল বিক্ষোভে মগ্ন ধ্যানীকে নমস্কার করি। মলয়ানীল স্পর্শিত গঙ্গাশীতল, স্নিগ্ধানন্দময় সমাধিত মহাপুরুষকে নমস্কার ! নমস্কার ! বহির আকাশে অনন্ত দীপাধার ঝলমল করে, কিন্তু যিনি স্বীয় সান্ধ্য কুটীর দীপ শিখায় তন্ময়, সেই পরমহংসের জয় হোক ! গঙ্গা তরঙ্গে মূর্চ্ছিত চন্দ্রালোকে ভক্ত-সংশয় নিরাশকারী ভগবানকে নমস্কার ! নমস্কার ! ধূপ, গোলাপ, রজনীগন্ধার গন্ধ ভারামোদিত সুন্দর দিব্য আকাশ বাতাসে 'আধানিক' নির্লজ্জ পাপের অসুস্থ চিন্তাকে যিনি নির্বাসিত করেছিলেন সেই পবিত্র পুরুষের ধ্যান করি। ২৪।৫।৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে প্রভু ! তুমি সূর্যের মত। ভাল মন্দ সকলের প্রতি তোমার করুণার আলোক পতিত হয়। হে সাক্ষিণ্‌ ! তুমি প্রদীপের মতো—শাস্ত্র পাঠ ও জাল তোমার আলোকেই হয়ে থাকে, অথচ তুমি নিরপেক্ষ। হে আনন্দময় ! তুমি চিনির পাহাড় ! শক্তির অনুপাতী সাধক তার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তোমার নিকট হতে মেটায়। হে সচ্চিদানন্দ সাগর ! তুমি অগাধ ! জীব পুত্তলিকা তোমাকে মাপতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব গলিয়ে ফেলে। হে প্রেমানন্দ বারিধি ! আমরা গভীর জলে মীনের মত তোমাতে সচ্ছন্দে বিহার করি। হে অনপেক্ষিত সত্তা ! তুমি রথী আমরা রথ, তুমি যন্ত্রী আমরা যন্ত্র, আমরা তোমারি তন্ত্রে চলি। হে প্রভু ! নৈবেদ্যের ন্যায় আমাদের প্রার্থনাকে গ্রহণ কর, তোমার অপার আনন্দ সিন্ধুতে এ বিন্দুকে মিশিয়ে নাও। ২৫।৫।৫২

॥ জীবন্মুক্তের গীতি ॥

"স্তিমিত হউক নেত্র, অন্তর মূর্চ্ছিত
বিফল বন্ধুত্ব—প্রেমে প্রতারণা হোক
...............তবু জানিও নিশ্চয়
......মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয়।"—শ্রীবিবেকানন্দ॥
(অনুবাদক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত)

—•—

আকাশবৎ কল্পবিদূরগোঽহ-
মাদিত্য বদ্ভাস্য বিলক্ষণোঽহম্।
আশ্চর্য্যবন্নিত্য বিনিশ্চলোঽহ-
মম্ভোধিবৎ পারবিবর্জিতোঽহম্॥
নারায়ণোঽহং নরকান্তকোঽহং
পুরকান্তকোঽহং পুরুষোঽহমীশঃ।
অখণ্ডবোধোঽহমশেষসাক্ষী
নিরীশ্বরোঽহং নিরহং চ নির্মমঃ॥
—কুণ্ডিকোপনিষৎ॥ ২৬।৫।৫২

॥ আহুতি ॥

"য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব
উপাসতে প্রশিষ্যং যস্য দেবাঃ।
যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্যমৃত্যুঃ
কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম॥ ২ ঋক্

যিনি চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন করেন, যিনি বলের বিধান করেন, সকল প্রাণী এমন কি দেবগণও যাঁর শাসন অনুসরণ করেন, অমৃতত্ব ও মৃত্যু উভয়ই যাঁর ছায়া স্বরূপ, সেই প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে আমরা হবিঃ প্রদান করি।

"যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্
দক্ষং দধানা জনয়ংতীর্যজ্ঞং।
যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥" ৮ ঋক্

যজ্ঞের (কার্যের) উৎপাদনের জন্য দক্ষের (প্রজাপতির) বিধারক প্রলয়-কালীন জলরাশিকে (মূলা প্রকৃতিকে) যিনি নিজ মহিমায় পর্যালোচনা করেছিলেন, যিনি দেবতাদের মধ্যে অদ্বিতীয়, সেই প্রজাপতিকে হবিঃ প্রদান করি।—ঋগ্বেদ ১০ম। ১২১ সূক্ত॥ ২৭।৫।৫২

॥ ব্রহ্মমহিমা ॥

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাংগুলম্॥ ১ ঋক্

বিরাট পুরুষ সহস্রশিরঃ, সহস্রচক্ষুঃ, সহস্র পদ। তিনি বিশ্বকে সর্বতোভাবে পরিবেষ্টন পূর্বক দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান (দশদিক) অতিক্রম কোরে অবস্থিত আছেন।

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২ ঋক্

দৃশ্যমান এই জগৎ সেই বিরাট পুরুষ—অতীত ও ভবিষ্যতও তিনি। তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর। যে হেতু জীবান্নের অর্থাৎ কর্মফল দেবার জন্য তিনি স্বীয় কারণ বা অব্যক্ত ভাব হতে কার্য ভাব বা ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়েছেন।

"এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" ৩ ঋক্॥
—ঋগ্বেদ ১০ম। ৯০ সূক্ত॥

এই জগৎ পুরুষের মহিমা। এ হতে তিনি শ্রেষ্ঠতর। সমস্ত ভূত তাঁর পাদ মাত্র। অবশিষ্ট ত্রিপাদ স্বপ্রকাশস্বরূপে অমৃত বা বিনাশ রহিত।

—ঋগ্বেদ ১০ম। ৯০ সূক্ত॥ ২৮।৫।৫২

॥ অবতরণ ॥

"তারা উজ্জ্বল পশিল ধরাতল
নিরমল গগন বিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল, বিভোর বাল সন্ন্যাসী॥

রবিকরকর্ষিত কুজ্ঝটিকা-ঘন
আবরে দিনকর কান্তি
মায়াবলম্বন কায়া প্রকটন, লীলাবরণ ভ্রান্তি ॥
গুরুপদধারণ, আত্মসমর্পণ
মহাহ্রদে নদ মহাসম্মিলন,
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান
দুরিত, অশান্তি বিধৌত মেদিনী
জনমনমার্জিত শান্তি প্রদান ;
সশিষ্য গুরুপদ হৃদে সাধে ধরি
গায় অকিঞ্চন গান, কৃপাকণা অভিলাষী ॥

—শ্রীগিরীশচন্দ্র ॥ ২৯।৫।৫২

॥ আবির্ভাব ॥

"দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো কোরে।
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটির ঘরে ॥
ভূতলে অতুল মণি কে এলিরে যাদুমণি।
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে ॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা।
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥
মরিমরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি।
হৃদয় সন্তাপ হারী, সাধ ধরি হৃদি পরে ॥

—শ্রীগিরীশচন্দ্র ॥ ৩০।৫।৫২

॥ "দুর বনে যা" ॥

"কাঠুরে তুই দুর বনে যা, দুর বনে যা এই বেলা।
কেঠো বনে কাল কাটালি ঘুচলো না তোর জঠর জ্বালা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন বোলে, মিলে ধন দূর বনে গেলে
(ও কাঠুরে)।
(ও তুই) এবার যা দূর বনে চলে, পাবি চন্দনের চ্যালা ॥
আরও যদি যাস এগিয়ে রজত খনি দেখবি গিয়ে
(ও কাঠুরে)।
(ওরে) তারও ধারে সোনা হীরে মণিমানিক রত্ন মেলা ॥
দেহের মাঝে আছে সে বন, যদি না পাস তার অন্বেষণ
(ও কাঠুরে)।
ধর ওরে রামকৃষ্ণ চরণ, সেবন যার করেন কমলা ॥

—শ্রীঅক্ষয় কুমার ॥ ৩১।৫।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

"কবে আমি বাহির হলাম তোমরি গান গেয়ে।"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥

—০—

তাই কালোরূপ ভালবাসি।
জগন্মনোমোহিনী মা এলোকেশী
কালোর গুণ ভাল জানে শুকশম্ভু দেবঋষি
যিনি দেবের দেব মহাদেব
কালোরূপ তাঁর হৃদয়বাসী ॥
কালবরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী
বাঁশী ত্যজে করে অসি ॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর
বিরাজে পূর্ণিমার শশী ॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে
কালরূপে মেশামিশি
ওরে একে পাঁচ পাঁচে এক
মন কোরো না দ্বেষাদ্বেষি ॥"

—শ্রীরামপ্রসাদ ॥ ১।৬।৫২

।। বামদেব সূক্ত ।।

"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং
কক্ষী বাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ং নৃঞ্জেঽহং
কবিরুশণা পশ্যতা মা॥ ২৬ ঋক্

বামদেব বলছেন, "আমিই মনু হয়েছিলাম, আমিই সূর্য, আমি দীর্ঘতমার পুত্র মেধাবী কক্ষীবান্। আমিই আর্জুনেয় কুৎসকে প্রশাধিত করি। আমিই কবি উশনা, হে বিশ্ববাসী! আমাকে দর্শন কর।"

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদ-
মহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
শতং মা পুর আয়সী ররক্ষ-
ন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্॥" ২৭ ঋক্।
—ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল। ৩ সূক্ত॥

"আমি গর্ভেই সকল দেবতার কথা জানি, শতশত লৌহময় অজ্ঞানপুর আমায় অধোলোকে রুদ্ধ কোরে রেখেছিল। আমি তা হতে ছিন্ন-জাল-শ্যেনের মত বেগে নির্গত হয়েছি।" ২।৬।৫২

।। আকাংক্ষা ।।

"জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই।
ছাড়তে গেলে ব্যথা বাজে।"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ॥

—০—

শ্যামাধন কি সবাই পায় রে
কালী ধন কি সবাই পায়
অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরও অসাধ্য সাধন ঐ মন মজান রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে ঐ শ্যামা যদি ফিরে চায়॥

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥

—শ্রীকমলাকান্ত॥ ৩।৬।৫২

॥ আকাংক্ষা ॥

"এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হলো অঙ্গ মম, ধন্য হলো অন্তর॥"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ

—o—

কে জানেরে কালী কেমন?
ষড় দর্শনে না পায় দরশন॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালী পদ্ম বনে হংস সনে হংসী রূপে করে রমণ॥
আত্মারামের, আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন॥

—শ্রীরামপ্রসাদ॥ ৪।৬।৫২

॥ ষোড়শী ঃ সৌন্দর্য-লহরী ॥

"সরস্বত্যাঃ সূক্তীরমৃতলহরী কোশলভিদঃ
পিবন্ত্যাঃ শর্বাণি! শ্রবণচুলুকাভ্যামবিরতম্।
চমৎকার শ্লাঘ্যচলিত শিরসঃ কুণ্ডলগণো
ঝনৎকারৈস্তারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব তে॥

হে শর্বাণি! যে গদ্যপদ্যময়ী রচনা সুধালহরীর স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য গর্বকে খর্ব করেছে, তাদৃশ বাগ্‌দেবী প্রোক্ত নূতন নূতন প্রবন্ধরাজি যখন তুমি কর্ণরূপ অঞ্জলি দ্বারা পান করতে থাক, তখন চমৎকারিত্ব হেতু প্রশংসাবাদ সহকারে তোমার শীর্ষ প্রদেশ সঞ্চালিত হতে থাকে। সেই সময় তোমার কর্ণকুণ্ডলস্থ

রত্নরাজি পরস্পর সংঘৃষ্ট হওয়াতে বোধ হয় যেন তারা ঝনৎকাররূপ উচ্চৈস্বরে তোমাকর্তৃক কৃত প্রশংসাবাদের অনুমোদন করছে।

"বিপঞ্চ্যা গায়ন্তী বিবিধমবদানং পশুপতে-
ত্বয়ারব্ধে বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ।
তদীয়ৈর্মাধুর্যৈরপলপিততন্ত্রী কলরবাং
নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্॥

হে দেবি! শ্রীমতী বাণী যখন বীণা সহকারে পশুপতির নানাবিধ সূক্তি কীর্তন করেন, তখন তুমি মস্তক সঞ্চালন পূর্বক 'সাধু' 'সাধু'—এইরূপ উক্তি কর, তখন তোমার কণ্ঠরবের মাধুর্যে বীণাস্বর পরাভূত হয়ে পড়ে। তাই দেখে বীণাপানি লজ্জায় নিজ বীণা কাঁচুলীর দ্বারা নিভৃতে আচ্ছাদন করেন।

—শ্রীশঙ্কর॥ ৫।৬।৫২

॥ ভবানী ভুজঙ্গ প্রযাত ॥

"গুরুস্ত্বং শিবস্ত্বং চ শক্তিস্ত্বমেব
ত্বমেবাসি মাতা পিতা চ ত্বমেব।
ত্বমেবাসি বিদ্যা ত্বমেবাসি বন্ধু-
র্গতির্মে মতির্দেবি সর্বং ত্বমেব॥
শরণ্যে বরেণ্যে সুকারুণ্য মূর্ত্তে
হিরণ্যোদরাদ্যৈরগম্যে সুপুণ্যে।
ভবারণ্য ভীতেশ্চ মাং পাহি ভদ্রে
নমস্তে নমস্তে নমস্তে ভবানি॥"
"ত্বমর্কস্ত্বমিন্দুস্ত্বমগ্নিস্ত্বমাপস্ত্বমাকাশ
ভূ-বায়বস্ত্বং মহত্তত্ত্বম্।
ত্বদন্যো ন কশ্চিৎ প্রপঞ্চেঽস্তি সর্বং
ত্বমানন্দসংবিৎ স্বরূপাং ভজেঽহম্॥
শ্রুতিনামগম্যে সুবেদাগমজ্ঞা মহিম্নো
ন জানন্তি পারং তবাম্ব
স্তুতিং কর্ত্তুমিচ্ছামি তে ত্বং ভবানি
ক্ষমস্বেদমত্র প্রমুগ্ধঃ কিলাহম্॥"—শ্রীশঙ্কর॥ ৬।৬।৫২

।। গণপতি স্তুতি ।।

"নমস্তে গণপতয়ে। ত্বমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি। ত্বমেব কেবলং কর্ত্তাসি। ত্বমেব কেবলং ধর্ত্তাসি। ত্বমেব কেবলং হর্তাসি। ত্বমেব সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মাসি। ত্বং সাক্ষাদাত্মাসি নিত্যম্। ঋচং বচ্মি। সত্যং বচ্মি। অবত্বং মাম্। অব বক্তারম্। অব শ্রোতারম্। অব দাতারম্। অব ধাতারম্। অবানূচানমব-শিষ্যম্। অব পশ্চাত্তাৎ। অব পুরস্তাৎ। অবচোত্তরাত্তাৎ। অব দক্ষিণা-ত্তাৎ। অব চোর্দ্ধাত্তাৎ। অবাধরাত্তাৎ। সর্বতো মাং পাহি পাহি সমন্তাৎ। ত্বং বাঙ্ময়স্ত্বং চিন্ময়ঃ। ত্বমানন্দময়স্ত্বং ব্রহ্মময়ঃ। ত্বং সচ্চিদানন্দাদ্বিতীয়োঽসি। ত্বং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বং জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানময়োঽসি। সর্বং জগদিদং তত্ত্বো জায়তে। সর্বং জগদিদং ত্বত্তস্তিষ্ঠতি। সর্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়মেষ্যতি॥

—ইতি গণপত্যুপনিষৎ॥ ৭।৬।৫২

।। নিদিধ্যাসন ।।

বিশ্ব যখন ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়ে আসে, দেশকাল ধীরে ধীরে লয় পায়, গভীর অজ্ঞানে সংস্কারের ছায়াগুলো অস্পষ্ট কঙ্কালের মত ঘুরে বেড়ায়, তখন থাকে কেবল, 'আমি', 'আমি', 'আমি'। হে উপাধি! তোমাকেও নমস্কার! "সে ধারাও বন্ধ হলো"—'আমি'ও থেমে এলো—কর্তা ও কর্মের আকৃতিগুলো গলে গেল, রইল কেবল মৃত্তিকা, উপাদান 'অস্তি' মাত্র—হে সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম! তোমাকে নমস্কার! 'আমি' তার সত্তাকে প্রাপ্ত হলো—সসীম ও অসীম হলো একাকার! হে বাক্যাতীত! হে মনাঽতীত! হে দ্বৈতাতীত! হে অদ্বৈতাতীত! তোমাকে নমস্কার! নমস্কার! নমস্কার! ৮।৬।৫২

।। কমলাপত্যষ্টকম্ ।।

"ভুজগতল্পগতং ঘনসুন্দরং
গরুড় বাহানমম্বুজ লোচনম্।
নলিন-চক্র-গদাকমব্যয়ং
ভজতরে মনুজাঃ কমলাপতিম্॥

অলিকুলাসিত-কোমল-কুন্তলং
বিমল-পীত-দুকূল মনোহরম্ ।
জলধিজাশ্রিত বাম কলেবরং
ভজতরে মনুজাঃ কমলাপতিম্ ॥

কিমু জপৈশ্চ তপোভিরুচ্চাধ্বরৈ-
রপি কিমুত্তমতীর্থ-নিষেবণৈঃ ।
কিমুত শাস্ত্র কদম্ব বিলোকনৈ
র্ভজতরে মনুজাঃ কমলাপতিম্ ॥

মনুজদেহমিমং ভুবি দুর্লভং
সমধিগম্য সুরৈরপি বাঞ্ছিতম্ ।
বিষয় লম্পটতামপহায় বৈ
ভজতরে মনুজাঃ কমলাপতিম্ ॥

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ॥ ৯।৬।৫২

॥ ধর্মকায় ॥

"জগতের দশদিকে যে আছ যেথায় !
যে কোন জীব !
দেখ সসম্ভ্রমে সর্বদেব ও মানব প্রধান
সেই ধর্মকায় সুনির্মল অকলঙ্ক শশী ।
যথা এক চিত্ত বোধে বহু চিন্তা বিকশিত হয়
তথা এক তথাগত ধর্মকায় হতে
কোটী কোটী বুদ্ধ সূর্য হয়েছে উদিত গরীমায় !

"বোধিতে নাহিক দ্বৈত জ্ঞান
অহংএর নাহি লেশ তথা
শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং মহাধর্মকায়
সর্বত্র বিরাজে বিভু স্বয়ং প্রভায় !

"আদিসত্য যাহা তাহা অনন্ত অব্যাহত আকাশ
তাহে শোভে ব্যক্ত ইন্দ্রজাল সম আকৃতি বিকার
নিরুপম ধর্মরত্ন অফুরন্ত যেথা
বুদ্ধের অতীন্দ্রিয়রূপ জানিও নিশ্চয়।"

—মহাবৈপুল্যাবতংশক সূত্তাবলম্বনে॥ ১০।৬।৫২

॥ রামকৃষ্ণ ঃ ঃ শ্রীচৈতন্য ॥

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ॥

—০—

(ঐ যে ঐ) সুরধুনী তীরে ওকে হরি বলে নেচে যায়।
যায়রে কাঁচা-সোনার বরণ, চাঁদের কিরণ মাখা তায়।
শিরে চূড়া শিখিপাখা রাধা নাম সর্বাঙ্গে লেখা
(ও তাঁর) নয়ন বাঁকা, ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা নূপুর রাঙা পায়॥
একি নয় দেখছি যারে বিমল যমুনার তীরে
(সে তো) এমনি কোরে বাঁশী ধরে মজায়িত গোপীকায়॥
বিশ্বরূপ কহে ফুকারি (তাঁরে) চিনি চিনি মনে করি,
বরণ দেখে চিনতে নারি, স্বভাবে পাই পরিচয়॥

—শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী॥ ১১।৬।৫২

॥ নির্ভয় ॥

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ॥

—•—

"জীব সাজ সমরে; রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তি রথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান-তূণ রসনা-ধনুকে দিয়ে প্রেম-গুণ
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান কোরে॥

আর এক যুক্তি রণে, চাই না রথ রথী, শত্রু নাশে জীব হয়ে সুসঙ্গতি।
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগরথীর তীরে॥"

—শ্রীদাশরথী॥ ১২।৬।৫২

॥ আত্মলিঙ্গোপাসনা ॥

"আরাধয়ামি মণিসন্নিভ আত্মলিঙ্গং
মায়াপুরী হৃদয়পঙ্কজ-সন্নিবিষ্টম্।
শ্রদ্ধানদী বিমলচিত্ত জলাভিষেকৈঃ
নিত্যং সমাধিকুসুমৈরপুনর্ভবায়॥

অপুনর্ভব অর্থাৎ পুনর্জন্ম নিবারণের জন্য মায়াপুরী হৃদয়পঙ্কজে সন্নিবিষ্ট মণিসন্নিভ আত্মলিঙ্গকে শ্রদ্ধানদী হতে আনিত বিমলচিত্তরূপ জলাভিষেক এবং সমাধিকুসুমসকল দ্বারা আরাধনা করি।

ঈশ্বরো গুরুরাত্মেতি ভেদত্রয় বিবর্জিতৈঃ।
বিল্বপত্রৈরদ্বিতীয়ৈরাত্মলিঙ্গং যজেচ্ছিবম্॥

ঈশ্বর-গুরু-আত্মা—ভেদত্রয় বিবর্জিত অদ্বিতীয় বিল্বপত্রের দ্বারা শিবরূপ আত্মলিঙ্গের পূজা করি।

বিশ্ববন্দ্যোঽহমেবাস্মি নাস্তিবন্দ্যোমদন্যতঃ।
ইত্যালোচনমেবাত্র স্বাত্মলিঙ্গস্য বন্দনম্॥"

আমিই বিশ্ববন্দ্য, আমি ছাড়া আর বন্দনীয় কে আছে। এই আলোচনাই স্বাত্মলিঙ্গের বন্দনা। ১৩।৬।৫২

॥ মনন ॥

যে শিশুর হৃদয়ে তোমার প্রেমের বাতি জ্বলে তা অফুরন্ত। শিশু কেন?—শিশু না হলে মা কিরূপ তা কি কোরে জানবে। শিশু ছাড়া অন্যের কাছে মায়ের প্রয়োজনও নেই। তাই জ্ঞানী পরমহংস শিশু। মায়ের প্রেম-শিখা সেই স্বচ্ছ শিশুর ভেতর প্রকাশ পায় বলে তার প্রতি এত লোকের টান। যেখানেই বাতিটী রাখ, আর অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে ভক্ত-পতঙ্গ।

ওরে মনোহংস ! তিনি যে তোমার অতি সন্নিকটতম, প্রিয়তম। তাঁর আলোকে জগৎ বিচিত্র রঙে রোঙে আছে, তাঁরই আলোকে চোখ দেখে। তিনি আমার ভেতর আছেন বলে সুখ ও দুঃখ। তিনি চলে গেলে হে প্রিয় দেহ ! তোমার সুখ দুঃখ, তোমার মূল্যই বা কোথায় ? গোলাপ ও ময়ূরে যে তাঁরই কারিগরি। তিনি প্রতি পাত্রে পূর্ণ হয়ে আছেন। যে পাত্র পাও, সেই পাত্রেই সেই প্রেমই পান কর। ১৪।৬।৫২

।। মনন ।।

"মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে।
গুরুদত্ত মন্ত্র কর দিবা নিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান।
তুমি নগর ফের মনে করো প্রদক্ষিণ শ্যামা মাকে॥
যত শুন কর্ণপুটে সবই মার মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
আনন্দে রামপ্রসাদ রটে মা বিরাজেন সর্ব ঘটে।
আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে॥"

—শ্রীরামপ্রসাদ॥ ১৫।৬।৫২

।। ধ্যানস্তুতি ।।

ভুবনমোহিণী মা ভুবনকে রাখলে ভুলিযে। অয়স্কান্ত মণি ! লোহার মত টান আমাকে তোমার দিকে। স্পর্শমণি ! আমাকে স্বর্ণ কর। জ্ঞান-গঙ্গে ! তোমার স্রোতে ভেসে চলেছি সচ্চিদানন্দ সাগরে। পৃথিবীর বর্ণ পড়ি সূর্যের আলোকে, মাগো ! অখিলের ছত্রধারা বিকশিত হয় তোমার বোধির দ্যুতিতে। মা ! পাত্র আমি ; তুমি পূর্ণ কর আমাকে। পাত্রে পাত্রে তোমারই রসসৌন্দর্য উচ্ছ্বসিত। আমি যে তোমার বেণু, নানা সুর ছন্দে বাজাও তুমি মোরে ; কত স্তুতি ভরে ওঠে তব চম্পক অঙ্গুলি স্পর্শে, সে নিবেদিতা নিবেদিত হয় সত্যং শিব সুন্দরে। হে জয়ধ্বনি মন্ত্রমাত ! তোমারই জয়গর্ব প্রকটিত অনন্তকোটি সূর্যে সূর্যে, লোকে লোকে ! ১৬।৬।৫২

॥ সফলতা ॥

"একটী শীতের ভায়লেটের প্রতি" —শ্রীবিবেকানন্দ ॥

"তোমার ধরিত্রী শয্যা হোক তুহিনিকা
শীতল শিশির হাওয়া উত্তরীয় হলেই বা আজ !··"
(লেখকের অনুবাদ হইতে)

—•—

আজ রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানুনু
দশদিক ভেল নিরদ্বন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানুনু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহু সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বান হউ
মলয় পবন বহুঁ মন্দা ॥
আজু মঝু যবহুঁ পিয়া সঙ্গ হোয়ল,
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপভাগী নহ,
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা ॥—শ্রীবিদ্যাপতি ॥

১৭।৬।৫২

॥ মর্মকথা ॥

শ্রীঠাকুরের অন্তরের প্রার্থনা ছিল যে, একটি আত্মাকেও সাহায্য করবার জন্য যদি তাঁকে জন্মজন্ম আসতে হয়, হোক না তা অতি নীচ জন্ম, তবু তাতে তাঁর কষ্ট নেই। তিনি একটা মানুষকেও ত্রাণ করবার জন্য অমন বিশ হাজার

দেহ ত্যাগ করতে রাজি। একটা মানুষকে সাহায্য করতে পারা, তাকে তার দুঃখের হাত হতে অব্যাহতি দেবার জন্য, একি কম গৌরবের কথা! যখন ভাবের আতিশয্যে ভক্তদের সহিত আলাপ করতে পারতেন না, তখন মার কাছে প্রার্থনা কোরে বলতেন, 'মা! আমায় সমাধি সুখের হাত থেকে রেহাই দাও! মা! আমায় স্বাভাবিক ভাবে থাকতে দাও, তাতে আমি তোমার কাজ আরও বেশী করতে পারব।' অসুখ বলে কাউকেও কাছে আসতে না দিলে, কত দুঃখ কোরে বলতেন, 'আজ আর কেউ তো এল না, আজ তো আমি আব কারুর কাজে লাগলুম না, একি কম কষ্ট গা!' ১৮।৬।৫২

।। প্রার্থনা ।।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥" —শ্রীধর ॥

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥"
—বিঃ ভাগবত ॥ ১২।১৩।১

"কবিং পুরাণমনুশাসিতারমনোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
—ভগবদ্গীতা ৮।৯॥ ১৯।৬।৫২

।। রামকৃষ্ণ ।।

"আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
....
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ॥"
—শ্রীবিবেকানন্দ (বীরবাণী) ॥

—•—

"স্থিমিত-চিৎ-সিন্ধুং ভিত্বা প্রকটীকৃত চিদ্‌ঘন শ্রীমূর্ত্তির-
ধর্মাভ্যুত্থান-প্রশমনার্থং ধৃতনির্মলকোমলগাত্র সুকান্তিঃ।
পূর্ণপরাৎ পরতর ক্ষমস্ব মামতিদীনমনাথমানন্দসুধাম্বুধে
কোটি-কল্পার্জিত পাপানি ভিত্বা
দেহি দয়াঘন মে পাদাব্জ দাস্যম্॥"

স্তিমিত চিৎ সিন্ধু ভেদী প্রকটীকৃত চিদঘন শ্রীমূর্তি, অধর্মের অভ্যুত্থান প্রশমনের জন্য তুমি নির্মল কোমল গাত্র সুকান্তি ধারণ কোরেছ। হে পূর্ণ-পরাৎপরতর! হে আনন্দ সুধাম্বুধি! অতি দীন অনাথ আমাকে ক্ষমা কর। কোটীকল্পার্জিত আমার পাপ সকল নষ্ট কোরে, হে দয়াবান! আমাকে তোমার পাদপদ্মে দাস্য দাও।

[লেখকের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতী স্তুতি-মাধুকরী হইতে]॥ ২০।৬।৫২

॥ রামকৃষ্ণ ॥

"নরদেব দেব জয় জয় নরদেব
শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং
দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং
নরদেব দেব জয়জয় নরদেব॥"

—শ্রীবিবেকানন্দ (বীরবাণী)॥

—০—

"পুরাণং কুমারং সত্যং শিবসুন্দরং
অহং ব্রহ্মাস্মি বাচ্যার্থলক্ষ্যমদ্বিতীয়ম্।
গঙ্গাতট ভারিতগন্ধসাধন দিব্য ধূপঃ
সদা গৃহ্নামি হৃদিকন্দরে মম পূর্ণরূপম্॥"

পুরাণ, নিন্দিত-মার (জিতকাম), সত্যস্বরূপ, শিব-সুন্দর, অহং ব্রহ্মাস্মি মহাবাক্যের যিনি লক্ষ্যার্থ, অদ্বিতীয় পূর্ণরূপ, গঙ্গাতটে সাধন যশঃ গন্ধে ভরিত যিনি দিব্য ধূপস্বরূপ, আমার হৃদয়কন্দরে সদা তাঁকে গ্রহণ করি।

[লেখকের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতী স্তুতিমাধুকরী হইতে]॥ ২১।৬।৫২

॥ মনন ॥

অরণ্যের সুন্দর পুষ্প, বিচিত্র রং মাথা নেড়ে দুলছে, এ ওর গায় ঢলে পড়ছে, বায়ুর সঙ্গে খেলা করছে। আকাশে সুন্দর পাখী, পাখার কত বাহার, গানের কী লহরী—অরণ্যের প্রতি কোণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এরা কাল ছিল কত আমার সান্ত্বনার সাথী, আজ তারা নেই, গেল কোথা? আমার খেলার সাথী আমার সুখ দুঃখের ভাগী, আমার আনন্দের ও বিশ্রামের সঙ্গী—তারা চলে গেছে—গেল কোথায়? আমার ধাত্রী, স্নেহময়ী মা! যাদের চিন্তাকে অধিকার করেছিলুম আমি একাই, তারাও চলে গেছে—গেল কোথায়? সবই তো চলে গেছে, চলে যাচ্ছে, চলে যাবে—যায় কোথায়?—এই প্রশ্নটাই হলো ধর্মজাগরণের লক্ষণ! ২২।৬।৫২

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ স্তুতি ॥

হে প্রভু! তোমার পরিপূর্ণ আনন্দ সত্তা যে কী, তার কে পরিমাপ করবে? ঘন বরষার বাতাস যেমন কদম্বের হেনার গন্ধে মসগুল হয়ে ওঠে, শরতের বাতাস যেমন শেফালির গন্ধে ভরপুর, তেমনি তোমার কথার অমৃত বাতাসে তোমার সচ্চিদানন্দ সত্তা আমরা প্রাণ ভরে আঘ্রাণ করি। তোমার প্রতি অঙ্গভঙ্গী, ইঙ্গিত, ভাব ও সমাধি আমাদের তৃষ্ণার্তমন ও চক্ষু অনন্ত তৃপ্তির সহিত পান করে। তাই তো আমাদের কাছে আমাদের বন্ধুরা এলে তার গন্ধ তারা আমাদের মুখে পায়। হে আত্মভোলা নিরপেক্ষ! তুমি কি এ আনন্দের ভাগী আমাদের জ্ঞানপূর্বক কর, না এ তোমার চিরন্তন স্বভাব? ফুল কি কোন যত্ন কোরে সুবাস বিলায় অপরের তৃপ্তির জন্য? ২৩।৭।৫২

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ স্তুতি ॥

বাউলের দল নাচলে গাইলে, চলে গেল—কেউ শুনলে, কেউ শুনলে না, কেউ দাঁড়িয়ে হয়ত একবার দেখলে, তাতে হে বাউল! হে উদাসী! তোমার কি এসে গেল? তোমার জয় হোক! তুমি অযাচিত অজস্র প্রেম বিতরণ করলে, কেউ পেয়েও উপেক্ষা করলো, কারণ তারা তার মূল্য জানেনা, তাতে

হে উদাসী! তোমার কি এলো গেল? তোমার জয় হোক! কেউ সে রত্ন-দান মুঠো মুঠো কোরে ভরে নিল নিজের চির অভাবগ্রস্ত আধ্যাত্মিক ঝুলিটীতে—তুমি তাতেই খুসী। হে উদাসী! তোমার জয় হোক! কেউ দেখলে তোমায় এক উন্মাদ পাগল—তুমি হাস তাতে, হে নির্বিকার! তোমার জয় হোক! কেউ তোমায় দেখে সচ্চিদানন্দের জীবন্ত বিগ্রহ—এ উপসাগরের সহিত মহাসমুদ্রের বরাবর সংযোগ, তারা সেই অমৃত সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ! তোমার জয় হোক! ২৪।৬।৫২

॥ নিদিধ্যাসন ॥

হে চিত্ত! মনুষ্য প্রকৃতির দেবত্ব সম্বন্ধে কখন ভুলো না। প্রত্যেক সত্তার মধ্যেই সেই আনন্দময় বিভুই বর্তমান। আমরাই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম, যাঁর কথা বেদে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হয়েছে, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। অনন্ত অপার সচ্চিদানন্দ সাগর, ঊর্ধ্ব অধঃ পরিপূর্ণ! অখণ্ড! কিন্তু আবার মায়ায় খণ্ডিত হয়েছে, অনন্তকোটী বুদ্ধ-খৃষ্টে!

হে চিত্ত! নির্ভীকভাবে বল, 'আমিই সেই মহাসমুদ্র! আমারই তরঙ্গে ভেসে ওঠে অনন্তকোটী জগৎ, অনন্তকোটী মহামানব! আমার গম্ভীর গর্জনে গর্জনে ওঠে, "সোঽহম্ সোঽহম্"।' ২৫।৬।৫২

॥ মহাকালী স্তুতি ॥

মা গো! তোমার অনন্ত হৃদয় ও সংসার বিধ্বংসী নৃত্যশীল পদতল আমি হৃদয়ে ধারণ করি। তোমার ভয়ঙ্কর মুখ আমায় দর্শন করিও না। তোমার দক্ষিণামূর্তিতে আমাদের দর্শন দাও। হে শিবনর্তকি! তোমার নৃত্য ভঙ্গীর পলকে পলকে ওঠে সৃষ্টির মাধুর্য, আবার প্রতি অট্টহাসির রুদ্র হিল্লোলে যায় সে সব মিশে, সমুদ্রে বীচি-তরঙ্গ-ফেন-বুদ্বুদের মত। মা এ তোমার তাৎপর্য-হীন খেলার পরিশ্রম নয়, তোমার এ স্বাভাবিক লীলার তাৎপর্য জীব মোক্ষে। এতে তোমার কৃচ্ছ্রতার পরিশ্রম নেই, আছে প্রেমের মাধুর্য—যা তোমার স্বাভাবিক প্রকাশ। হে সচ্চিদানন্দময়ি! তোমার জয় হোক! ২৬।৬।৫২

॥ শ্রীশঙ্করের নির্বিকল্প ॥

"মন বুদ্ধি অহংকার নহি চিত্ত আমি
নাহি মোর শ্রোত্র জিহ্বা ঘ্রাণ নেত্র আদি
নহি আমি আকাশ বাতাস তেজঃ জল বা পৃথিবী
বৈরাগ্য নাহিক মোর, নাহি মোর আসক্তি বা আশা,
পাপ নাহি, পুণ্য নাহি, সুখ দুঃখ নাহিক আমার,
নিরপেক্ষ সত্তা সদা চিদানন্দাপার !"

—০—

॥ নিস্পন্দ তিমির ॥

"না জেনেই কোথা চলিয়াছি
প্রবেশিনু নিস্তব্ধ অপার
বাস করে নাহি যথা আপেক্ষিক জ্ঞান
যাহা সদা সর্বজ্ঞান পারে
দৃশ্যালোক নাহি যথা, আছে মাত্র
অকারণ বস্তু-তন্ত্র ফল।"

—(Suso's Dark' Silence অবলম্বনে) ॥ ২৭।৬।৫২

॥ মধুরাষ্টক ॥

"অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্ ।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্ ।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতিরখিলং মধুরম্ ॥

বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ
পাণির্মধুরঃ পাদৌমধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতে রখিলংমধুরম্॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥

—শ্রীবল্লভাচার্য॥ ২৮।৬।৫২

॥ অহংগ্রহোপাসনা ॥

হে মন! নিজেকে কখন পরাভূত মনে করো না। সর্বদা তোমার শির উচ্চ রাখ। কারণ তুমি যে ঈশ্বরের বাহক। সেই সর্বশক্তিমানের উপযুক্ত বাহক হও; তুমিই শ্রীভগবানের বাহক সাক্ষাৎ গরুত্মান্ বেদ, তার জন্য নিজেকে গর্বিত মনে কর। তোমার অবস্থিতি সেই সত্যং শিব সুন্দরের আসন চতুষ্পাৎ ধর্মরূপী বৃষভ, মনঃ বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত,—তুমি পাপী হবে কি করে, তুমি যে মহতো মহীয়ান। তোমার খাদ্য বেদান্ত, যা মানুষকে বলবান, বীর্যবান ও ওজঃসম্পন্ন করে। তুমি কখনও দুর্বল নও, তবে তুমি যদি স্বেচ্ছায় দুর্বল সাজো, তা হলে আলাদা কথা। সর্বাস্তিত্বের প্রমাণ যে তোমার জ্ঞানালোক, সর্ববিধানের প্রতিষ্ঠাতা তোমারই ধর্মালোক। ২৯।৬।৫২

॥ জননী জন্মভূমি ॥

দুর্গাদি প্রতিমা যদি ব্রহ্ম প্রতীক হয়—তবে এই ভারতবর্ষ কী? এক মহৎ বিরাট মাতৃ প্রতীক! যাকে আশ্রয় কোরে অনন্ত কোটী প্রাণী জীবনধারণ করছে; তার মাটীর বিচিত্র ধর্ম, বিচিত্র রূপ, বিচিত্র জীবনী শক্তি—এই বিরাট শরীরের প্রতি ভোক্তা ও ভোগ্য যেন শ্রীরামানুজের ব্রহ্মের জীব ও জগৎ। এই অনন্ত কোটী প্রাণীর ইচ্ছার পরিচালক এক ঈশ্বর এই বিরাট শরীরে ব্যাপ্ত —যার অভিব্যক্তি আমরা দেখি যুগ যুগান্তরের ত্যাগী মহাপুরুষগণে, অবতারে।

।। সুখ-স্বপ্ন ।।

"জগতে ঘটুক যা হোক একটা ভাল বা মন্দ
তা মাধুর্য দেখাক তার সর্বাবরণ খুলি
অথবা দুঃখের সমুদ্র উঠুক ফুলে, দুলি দুলি"—শ্রীবিবেকানন্দ ॥
[লেখককৃত স্বামিজীর "দাউ ব্লেসেড্ ড্রিম" নামক কবিতার অনুবাদ হইতে]

।। মোহন ।।

"লটকি লটকি চলত মোহন আবে।
আবে মোহন অধরে মুরলী মধুর মধুর বাজে।
চঞ্চল কুন্ডল চপল দোলনী মোর মকুট চন্দ্র কলনী
মন্দ হসনী জিয়াকী রশনী মোহন মূরতি রাজে ॥
ভ্রূকুটি কুটিল কংজ নয়ন, অধর অরুণ মধুর বয়ন
গতি গয়ন্দ চারু তিলক ভাল,পর বিরাজে ॥
লছমন দাস শ্যামরূপ নখশিখ শোভা অনুপ
রসিক ভূপ বদন নিরখি কোটি মদন লাজে ॥"
—শ্রীলছমন দাস ॥ ১।৭।৫২

।। আপাগ্নি-স্তুতি ।।

"জলের মধ্যে অমৃত রয়েছে, জলেরই মধ্যে আছে ঔষধ, অতএব জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের প্রশংসার জন্য দেবস্বরূপ ঋত্বিকগণ তৎপর হও।

"আমি মন্ত্রদ্রষ্টা। সোম আমাকে জানিয়েছেন জলের মধ্যেই সর্বৌষধী বর্তমান—জলের মধ্যেই সুখকর জীবাগ্নিও বর্তমান। তাই জল বিশ্ব-ভেষজী।

"হে জলদেবতা! আমার দেহ রোগনাশী ঔষধে পূর্ণ কর। আমরা যেন নীরোগ শরীরে চিরদিন সূর্যদেবকে দর্শন করি।

"হে জলসমূহ! আমাতে সজ্ঞাত পাপ, জ্ঞানপূর্বক দ্রোহ, সাধুর প্রতি শাপ বাক্য, অনৃতকথা, তোমাদের প্রবাহ দ্বারা দূর কর।

"অন্ত জলের মধ্যে প্রবিষ্ট, রসের সহিত সঙ্গত আমি ; অতএব হে অগ্নি ! আমাকে তেজের দ্বারা সংজোষিত কর।"

—ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল। ২৩ সূক্ত। ১৯-২৩ ঋক্‌॥ ২।৭।৫২

॥ অষ্টমূর্তি নমস্কার ॥

ওঁ সর্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ।

ওঁ রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ।

ওঁ ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ।

ওঁ সোমায় চন্দ্র মূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ।

ওঁ বাসুদেবায় ঋগু মূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ শঙ্কর্ষণায় সাম মূর্ত্তয়ে নমঃ।

ওঁ প্রদ্যুম্নায় যজুঃ মূর্ত্তযে নমঃ। ওঁ অনিরুদ্ধায় অথর্ব মূর্ত্তয়ে নমঃ।

ওঁ নারায়ণায় কর্ত্তে নমঃ। ওঁ গদাধরায় হর্ত্রে নমঃ।

ওঁ সত্যায় ধাত্রে নমঃ। ওঁ রামকৃষ্ণায় বিধাত্রে নমঃ॥ ৩।৭।৫২

॥ ভাগবতী নামমালা ॥

ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমন্।
বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনম্॥
বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্।
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্॥
গোবিন্দং অচ্যুতম্ কৃষ্ণমনন্তমপরাজিতম্।
অধোক্ষজং জগন্নাথং সর্গস্থিত্যন্তকারণম্॥
অনাদি নিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্র গদাধরম্॥
পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালা বিভূষিতম্।
প্রণমামি সদা দেবং বাসুদেবং জগৎপতিম্॥ ৪।৭।৫২

।। যোগিভক্ত কর ।।

হে প্রভু! আমাকে তোমার যোগিভক্ত কর। আমি যেন সর্বভূতের অদ্বেষ্টা হই। মৈত্রী ও করুণা যেন আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমি যেন ভোগে মমতাহীন, কর্মে নিরহংকার, সুখ দুঃখে অবিচলিত এবং ক্ষমাশীল হই। আমি যেন তোমার দয়ায় সন্তুষ্ট থাকি, পরমার্থ লাভে যত্নশীল হই, সত্যে দৃঢ় নিশ্চয় হই, তোমাতে মন প্রাণ সমর্পণ করতে পারি। লোকে যেন আমা হতে উদ্বেগ প্রাপ্ত না হয়, লোকেও যেন আমাকে উদ্বেজিত না করে। আমি যেন হর্ষে মুগ্ধ না হই, পরশ্রী দর্শনে কাতর না হই, ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হই। আমি যেন কোন বিশিষ্ট বিলাস ব্যসন বা ব্যক্তিকে অপেক্ষা না করি। হে প্রভু! তোমার কৃপায় যেন আমি গতব্যথা হই। ৫।৭।৫২

।। স্বামিজীর প্রার্থনা ।।

'যাই মা যাই, তোমার স্নেহ বক্ষে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ছি, তুমি যেখানেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই ভেসে যাব—সেই নিস্তব্ধ, অপরিচিত অদ্ভুত জগতে। এবার আসছি দর্শকের মত, কর্মীর মত নয়। ওহো: কী সুন্দর নিস্তব্ধতা! আমার মনে হচ্ছে যেন আমার চিন্তাগুলি কোন দূরান্তের গভীরতম দেশ থেকে ভেসে আসছে। যেন অতি সুদূরের অস্পষ্ট কানে কানে কথা বলা—ওঃ কী শান্তিই না সর্বত্র বিরাজ করছে! অতি মধুর, নিরাময় শান্তি!—এই মুহূর্তগুলি যেন ঘুমিয়ে পড়ার আগের কয়েকটী মুহূর্ত—সব যেন ছায়া, সব যেন নির্ভয, সব যেন অনাসক্তি, উত্তেজনার চিহ্ন কোন কিছু নেই। যাই প্রভু যাই।' ৬।৭।৫২

।। কালীকৃষ্ণ ।।

"কই গো কুটিলে কুটিল কালা এ যে দেখি কালী কপালিনী।
যতনে রাধিকা পূজেন কালিকা, তবে তারে কেন বলিস কলঙ্কিনী॥
কই গো মিলি যত ব্রজবালা কই গো গলে দোলে বনমালা,
আজানুলম্বিত শোভে বনমালা, খেলা করে লয়ে যতেক যোগিনী॥

কই গো কুটিলে শিরে শিখি চূড়া, কই গো কটিতটে পীত ধড়া ;
মোহন মুকুট মস্তকেতে বেড়া, দাঁড়ায়ে রয়েছে হয়ে উলঙ্গিনী ॥
কই গো অলকা আবৃত বদন, কই গো ঈষৎ বঙ্কিম নয়ন
আকর্ণ পূরিত আরক্ত লোচন, সিন্দুরবিন্দু ইন্দু নিভাননী ॥
কই গো করেতে কুলনাশা বাঁশী, কই গো অধরে মৃদুমন্দ হাসি
বাম করে শোভে সুশাণিত অসি, লোলজিহ্বা ঘোর নিনাদিনী ॥
কই গো হৃদয়ে ভৃগুপদ আঁকা, কই গো ত্রিভঙ্গ ত্রিভঙ্গতে বাঁকা,
বক্ষে পয়োধর স্বচক্ষে যায় দেখা, দেখ দেখি বাঁকা কোথাও দেখিনি ॥
তুইরে বাঘিনী ননদিনী বলে, বৃথা বাদ রাধার রটালি গোকুলে,
যা হবার তা হবে, আয় সবে মিলে, জবাবিল্বদলে পূজি পা দুখানি ॥"

—০—

"আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও ॥…"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥ ৭।৭।৫২

॥ যোগনিদ্রা ॥

"নিবর্ত্তয়ন্তীং নিখিলেন্দ্রিয়াণি
প্রবর্ত্তয়ন্তী পরমাত্মযোগম্।
সংবিন্ময়ীং তাং সহজামবস্থাং
কদা গমিষ্যামি গতান্যভাবঃ ॥

যে অবস্থা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হতে নিবৃত্ত করে এবং পরমাত্মাতে যোগ প্রতিষ্ঠিত করে, আমি অন্যভাবকে পরিত্যাগ কোরে কবে সেই সম্বিৎময়ী সহজাবস্থা প্রাপ্ত হব ?

"প্রত্যগ্‌ বিমর্শাতিশয়েন পুংসাং
প্রাচীন সঙ্গেষু পলায়িতেষু।
প্রাদুর্ভবেৎ কাচিদ্‌জাড্য-নিদ্রা
প্রপঞ্চ চিন্তাং পরিবর্জয়ন্তী ॥"

—যোগতারাবলী, শ্রীশংকর ॥

প্রত্যাগাত্মাতে চিত্ত সমাধান বশতঃ পুরুষগণের পূর্বকৃত বিষয়সংগ চলে গেলে সংসার চিন্তা নাশিনী।কোন এক অপূর্ব জড়তাহীন নিদ্রা আবির্ভূত হয়। (ক্রমশঃ)॥ ৮।৭।৫২

॥ যোগনিদ্রা ॥

"বিচ্ছিন্ন সংকল্প বিকল্প মূলে
নিঃশেষ নির্মূলিত কর্মজালে।
নিরন্তরাভ্যাস নিতান্ত-ভদ্রা
সা জৃম্ভতে যোগিনি যোগনিদ্রা॥

সংকল্প ও বিকল্পের মূল যে অবিদ্যা, তা বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়ে, নিঃশেষিত ভাবে কর্মসমূহ নির্মূলিত হলে, সতত অভ্যাসবশতঃ অতীব মঙ্গলদায়িনী যোগনিদ্রা যোগীতে আবির্ভূতা হন।

"বিশ্রান্তিমাসাদ্য তুরীয়তল্পে
বিশ্বাদ্যবস্থা ত্রিতয়ো পরিষ্টে।
সংবিন্ময়ী কামপি সর্ব্বকালং
নিদ্রাং সখে! নির্বিশ নির্বিকল্পাম্॥"

—যোগতারাবলী, শ্রীশঙ্কর॥

হে সখে! বিশ্বাদি (জাগ্রতাদি) তিনটী অবস্থার ওপরে তুরীয় ব্রহ্মশয্যায় বিশ্রামলাভ কোরে, সর্বদা জ্ঞানময়ী, নির্বিকল্পা কোন এক অপূর্ব নিদ্রাতে প্রবেশ কর। ৯।৭।৫২

॥ আত্মপ্রকাশ ॥

"চিদমৃতসুখরাশৌ চিত্ত ফেনং বিলীনং
ক্ষয়মধিগত এব বৃত্তিচঞ্চত্তরঙ্গঃ।
স্তিমিতসুখসমুদ্রো নির্বিচেষ্টঃ সুপূর্ণঃ
কথমিহ মম দুঃখং সর্বদৈকোঽহমস্মি॥

চিদমৃত সুখরাশিতে চিত্তরূপফেন বিলয় প্রাপ্ত হয়েছে। চিত্তবৃত্তিরূপ চঞ্চল তরঙ্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে। নিশ্চলসুখরূপ সমুদ্র নিষ্ক্রিয় ও পরিপূর্ণ রয়েছে। আমি সর্বদা একরূপে অবস্থিত, এ সংসারে আমার দুঃখ কিরূপে সম্ভব?

'আনন্দরূপোঽহমখণ্ডবোধঃ
পরাৎ পরোঽহং ঘনচিৎ প্রকাশঃ।
মেঘা যথা ব্যোম ন চ স্পর্শন্তি
সংসার দুঃখানি ন মাং স্পৃশন্তি॥"

— স্বাত্মপ্রকাশিকা, শ্রীশঙ্কর॥

আমি আনন্দ ও অখণ্ডবোধরূপ, আমি পরাৎপর, চিদ্‌ঘন প্রকাশ। মেঘ যেমন আকাশ স্পর্শ করে না, সেইরূপ সংসার দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে না। ১০।৭।৫২

॥ প্রৌঢ়ানুভূতি ॥

"সৌরালোকবশাৎ প্রতীতমখিলং পশ্যন্ন তস্মিন্ জনঃ!
সন্দিগ্ধোঽস্ত্যত এব কেবল-শিবঃ কোঽপি প্রকাশোঽস্ম্যহম্॥৭

যে সূর্যালোকে অখিল জগৎকে দেখা যায় তাকে কে সন্দেহ করে? সেইরূপ স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ কেবল শিব যে আমি, সেই আমাতে কার সন্দেহ হবে?

"নিত্যস্ফূর্তিময়োঽস্মি নির্মলসদাকাশোঽস্মি শান্তোঽস্ম্যহম্
নিত্যানন্দময়োঽস্মি নির্গত মহামোহান্ধ কারোঽস্ম্যহম্।
বিজ্ঞাতং পরমার্থতত্ত্বমখিলং নৈজং নিরস্তা শুভং
মুক্তপ্রাপ্যমপাস্তভেদকলনাকৈবল্য সংজ্ঞোঽস্ম্যহম্॥" ৮

আমি নিত্য প্রকাশময়, নির্মল সদাকাশ, শান্ত নিত্য আনন্দময়, আমা হতে মহামোহ অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে, মুক্তগণের প্রাপ্য নিরস্ত-অশুভ নিজ পরমার্থ অখিলতত্ত্ব আমি বিজ্ঞাত, যাবতীয় ভেদ প্রত্যয় বিহীন আমি কৈবল্য-সংজ্ঞ।

—শ্রীশঙ্কর॥ ১১।৭।৫২

॥ চিরসঙ্গ ॥

হে প্রভু! অসৎ সঙ্গের অপ্রিয়-সংযোগ দুঃসহ, আবার সৎসঙ্গের প্রিয়-সংযোগের বিচ্ছেদও দুঃসহ। হে প্রিয়! তোমার বংশীধ্বনি চিরদিন আমার প্রাণে বাজুক, আমি তার সঙ্গ করি, আর বিচ্ছেদ দিও না প্রভু! চাই আমি নির্জন—"যা নিশা সর্বভূতানাং", আমি চাই তাতে জেগে থাকতে। জগতের

ভালবাসার বস্তু অনেক, কারণ তাদের ব্যভিচারী ভক্তি ; কিন্তু প্রভু হে ! ভক্তদের অব্যভিচারী ভক্তি তুমি দিয়েছ, তাই তুমিই তাদের একমাত্র ভালবাসার পাত্র—বেদের তুমিই পরমপ্রেমাস্পদ আত্মা। তুমি কেমন তা জানি না, তোমারশক্তিই বা কী, গুণই বা কত, কে তার পরিমাপ করে। আমরা কেবল জানি তুমি পরম প্রেমাস্পদ আমার আত্মা ; আত্মার চাইতে আর কি ভালবাসার বস্তু থাকতে পারে ? ১২।৭।৫২

॥ বিজ্ঞাননৌকা ॥

"নিষেধে কৃতে নেতি নেতীতি বাক্যৈঃ
সমাধিস্থিতানাং যদাভাতি পূর্ণম্।
অবস্থা ত্রয়াতীতমেকং তুরীয়ম্
পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥

নেতি নেতি বাক্যের দ্বারা নিষেধ করলে, সমাধিস্থিতের যা পূর্ণ বলে বোধ হয়, সেই অবস্থাত্রয়াতীত এক তুরীয় পরং ব্রহ্ম নিত্য, তাই আমি।

"যদানন্দ লেশৈঃ সমানন্দি বিশ্বং
যদাভাতি সত্ত্বে তদাভাতি সর্বম্।
যদালোকনে রূপমন্য সমস্তং
পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥"—শ্রীশঙ্কর ॥

যাঁর আনন্দকণা দ্বারা বিশ্ব আনন্দ যুক্ত, যাঁর সত্তায় সত্তাযুক্ত হলে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত, যাঁর দর্শন হলে অন্যরূপ সম্যক্ অস্ত প্রাপ্ত হয়, আমি সেই নিত্য, তাই পরব্রহ্মস্বরূপ। ১৩।৭।৫২

॥ বিজ্ঞাননৌকা ॥

"অনন্তং বিভুং সর্বযোনিং নিরীহং
শিবং সঙ্গহীনং যদোঙ্কারগম্যম্।
নিরাকারমত্যুজ্জ্বলং মৃত্যুহীনং
পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥

যা অনন্ত, বিভু, নির্বিকল্প ও ব্যাপার বিহীন, শিব, সঙ্গ-রহিত, ওঁকার প্রাপ্য, আকারশূন্য, অতি উজ্জ্বল, মরণ রহিত, আমি সেই নিত্য পরব্রহ্মস্বরূপ।

"যদানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নঃ পুমান্ স্যাদ্
অবিদ্যাবিলাসঃ সমস্ত প্রপঞ্চঃ।
তদা ন স্ফুরত্যদ্ভুতং যন্নিমিত্তং
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি॥"—শ্রীশংকর॥

যখন পুরুষ আনন্দ মহাসমুদ্রে মগ্ন হয়, তখন অবিদ্যা বিলাস এ সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ আর স্ফূর্তি পায় না, যা অত্যাশ্চর্য ও জগতের কারণ, আমি সেই নিত্য পরব্রহ্মস্বরূপ। ১৪।৭।৫২

॥ "প্রয়াণ কালে" ॥

"আমার মন যদি যায় ভুলে,
তবে বলির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণ মূলে॥
এ দেহ আপনার নয় রে সদা রিপুর সঙ্গে চলে।
তবে আনরে ভোলা জপের মালা, (দেহ) ভাসাই গঙ্গাজলে॥
ভয় পেয়ে রাজা রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে।
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি থাট কি আছে কপালে॥"
—মহারাজ রামকৃষ্ণ॥

—০—

"মেঘ বলেছে 'যাব যাব', রাত বলেছে 'যাই'।
সাগর বলে 'কূল মিলেছে, আমি ত আর নাই'॥…"
—শ্রীরবীন্দ্রনাথ॥ ১৫।৭।৫২

॥ শরণাগতি ॥

আর চলে না, চলে না, চলে না মা তোমা বিনা দিন চলে না।
তোমা বিনা যত আপনার জন, হিত কথা কেউ বলে না॥
এ জীবন তরু শুষ্ক হয় মাগো, তোমা বিনা ফল ফলে না;
আমার পাষাণ সমান কঠিন হৃদয়, তব স্পর্শ বিনা গলে না।

তব কৃপা বিনে হৃদয় অরণ্যে প্রেমের আগুন জ্বলে না ;
(আমার) অসুর সমান রিপু বলবান, মোর কথা সে যে শোনে না।
তুমি না হলে প্রসন্ন, এক মুষ্টি অন্ন, এ সংসার মাঝে মেলে না ;
আমার জীবন সম্বল, তব কৃপা বল বিনা, গতি মুক্তি হবে না ॥

—০—

"জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি।
জয় পরমা নির্বৃতি হে নমি নমি ॥......"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥ ১৬।৭।৫২

॥ অদ্বৈতানুভূতি ॥

"বিম্বং বিনা যথানীরে প্রতিবিম্বো ভবেৎ কথম্।
বিনাত্মানং তথা বুদ্ধৌ চিদাভাসো ভবেৎ কথম্ ॥"

যেমন বিম্ব (সূর্য) ছাড়া জলে প্রতিবিম্ব হয় না, সেইরূপ আত্মা ছাড়া বুদ্ধিতে চিদাভাস সম্ভব নয়।

"প্রতিবিম্বচলত্বাদ্যা যথা বিম্বস্য কর্হিচিৎ।
ন ভবেয়ুস্তথাঽভাসকর্তৃত্বাদ্যাস্ত নাত্মনঃ ॥"

যেমন প্রতিবিম্বের চঞ্চলতা বিম্বে সঞ্চারিত হয় না, সেইরূপ চিদাভাসের কর্তৃত্বাদি আত্মায় সংক্রান্ত হয় না।

"জলে শৈত্যাদিকং যদ্বৎ জলভানুং ন সংস্পৃশেৎ।
বুদ্ধেঃ কামাদিকং তদ্বচ্চিদাভাসং ন সংস্পৃশেৎ ॥"—শ্রীশংকর ॥

জলের শীতলতা, উষ্ণতা প্রভৃতি যেমন জলভানুকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ বুদ্ধির ধর্মও চিদাভাসকে স্পর্শ করে না। ১৭।৭।৫২

॥ তুমি স্বয়ং কথা বল ॥

হে প্রভু! তুমি স্বয়ং কথা বল, তোমার দাস তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত। আমাকে শক্তি দাও যেন আমি তোমার বাক্য অনুধাবন ও পালন কোরতে পারি। অপরের মাধ্যমে কথা আমি সব সময় বুঝি না, তুমি সাক্ষাৎ কথা বল, তোমার স্পষ্ট-বাণী আমার চিত্তের অন্ধকার আলোকিত করুক। অপরের কথায়, সদুপদেশেও স্বার্থ থাকে, তারা আমার চিত্তের অন্তস্তল জানে না, তারা

আমার ভেতরের সত্য মিথ্যা জানে না, তুমি অন্তর্যামী, তুমি আমার অন্তরের সব কথা জান। তাদের কাছে আমার পরিচয় হয়, কিন্তু অর্থজ্ঞান তুমি ছাড়া আর কেউ করাতে পারে না। তারা গাছে জল দেয়, কিন্তু ফলদাতা তুমি। তুমিই বৃক্ষের অন্তর্নিহিত শক্তি, তুমিই বুদ্ধির পরিচালক। ১৮।৭।৫২

।। প্রকাশ ।।

"দেখনা সমর আলো করেরে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী ॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিনী ॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু ঘন তনু ঘেরে কুমুদ-বন্ধু
অমিয়-সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু মলিন এ কোন মোহিনী ;
একি অসম্ভব ভব পরাভব পদতলে শব সদৃশ নীরব
কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে এ গজগামিনী ॥"

—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী ॥

—॰—

"যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল অন্তর।
তবে দয়া কোরো হে, দয়া করো হে, দয়া কোরো ঈশ্বর। ..."

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥ ১৯।৭।৫২

।। সদানন্দময়ী ।।

"সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিণী,
তুমি আপনি নাচ আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি।
আদি ভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশী ভালী
(ওমা) ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি,
তুমি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি মা, যেমনি বলাও তেমনি বলি ॥
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে চলে মা করতালি
এবার সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম দুটো খেলি ॥"—শ্রীকমলাকান্ত ॥

"নমি নমি চরণে   নমি কলুষ হরণে।
সুধা রস নির্ঝর হে! নমি নমি চরণে॥......" —শ্রীরবীন্দ্রনাথ॥

২০।৭।৫২

॥ প্রৌঢ়ানুভূতি ॥

"ময্যেব প্রলয়ং প্রয়াতি নিরধিষ্ঠানায় তস্মৈ সদা।
সত্যানন্দ চিদাত্মকায় বিপুল প্রজ্ঞায় মহ্যং নমঃ॥

আমাতে সমস্ত প্রলয় প্রাপ্ত হচ্ছে, সেই নিরধিষ্ঠান সদা সত্যানন্দ চিদাত্মক বিপুল প্রজ্ঞ আমাকে নমস্কার।

"সত্তাচিৎ সুখরূপমস্তি সততং নাহং চ ন ত্বং মৃষা।
নেদং বাপি জগৎ প্রদৃষ্টমখিলং নাস্তীতি জানীহি ভোঁ॥— শ্রীশঙ্কর॥

সতত সত্তা চিৎ সুখরূপ আমি। আমাতে 'আমি' বা 'তুমি' নেই। এই দৃশ্যমান জগৎ নেই, এ নিশ্চয় যেন। ২১।৭।৫২

॥ "আবাদ" ॥

"মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার পাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতারে, চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ কোরে, ভক্তিবারি সেঁচে দেনা।
একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না॥"

—শ্রীরামপ্রসাদ॥ ২২।৭।৫২

।। মহামায়া ।।

"এমনি মহামায়ার মায়া, রেখেছে কি কুহক কোরে।
ব্রহ্মাবিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥
বিলকরে ঘুণী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে॥
গুটী পোকায় গুটী করে সে তো পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী আপনার জালে আপনি মরে॥"

—রাজা নবচন্দ্র॥

—•—

"সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।····· "—শ্রীরবীন্দ্রনাথ॥

২৩।৭।৫২

।। মহাধ্যান ।।

"যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগীবর
অনন্ত তুষারে যেন অনন্ত শেখর॥
প্রলয় নীরব মাঝে একাকী পুরুষ রাজে॥
ভয়ে অগ্নি ভস্ম মাঝে ঢাকে কলেবর॥
শিশু শশী নাহি আর অন্ধকার নিরাকার।
এক, নাহি দুই আর, প্রকৃতি নিথর॥
কাল বদ্ধ বর্তমানে ব্যোমকেশ ব্যোম পানে
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে পূর্ণ মহেশ্বর॥"

—শ্রীগিরীশচন্দ্র॥ ২৪।৭।৫২

।।প্রভুর প্রার্থনা ।।

শ্রীশ্রীঠাকুর মার কাছে প্রার্থনা করছেন—ওমা, মাগো, ওমা ব্রহ্মময়ি! তুমি ওঁকার রূপা। মা লোকে কত কথাই তোমার সম্বন্ধে বলে, কিন্তু আমি তার কিছুই বুঝি না মা। মা আমি যে কিছুই জানি না—আমি জানি কেবল তোমার পাদপদ্ম, আমি তাতেই শরণ নিইছি মা। আমার কেবল এই প্রার্থনা, যেন তোমার পাদপদ্মে নির্মলা অবিচলা অহৈতুকী ভক্তি থাকে। তুমি আমার

রক্ষাকর্ত্রী, আমি তোমার নিকট শরণাগতি ভিক্ষা করি মা, আমি তোমার অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি, মা আর যেন তুমি আমায় তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ কোরো না। তুমি আমার রক্ষাকর্ত্রী, আমি তোমার শরণাগত। ২৫।৫।৫২

॥ "আশ্চর্য কালো" ॥

"ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরেকাল পদে মহাকাল
তার কেন কালো রূপ হলো॥

কালরূপ অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য কাল।
যায় হৃদ্ মাঝারে ধ্যান করিলে হৃদয় পদ্ম হয়রে আলো॥
নামে কালীরূপে কালী কাল হতেও অধিক কালো।
ও রূপ যে দেখেছে সেই মজছে অন্যরূপ লাগে না ভালো॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
যাঁরে না দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো॥

—শ্রীরামপ্রসাদ॥ ২৬।৭।৫২

॥ স্বামিজীর প্রার্থনা ॥

যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর। জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর। নাম যশঃ নশ্বর। বন্ধুত্ব ও প্রেমও অচিরস্থায়ী। একমাত্র সত্যই শাশ্বত। হে সত্য স্বরূপ! তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা। হে সন্ন্যাসিন! তুমি নির্ভয়ে দোকানদারী ত্যাগ কোরে শত্রু মিত্র ভেদ না রেখে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠ থাক। এই মুহূর্তে আমি ইহামূত্র-ফলভোগবিরাগী, ইহলোক ও পরলোকের যাবতীয় অসার কল্পিত সুখ আমার পরিত্যক্ত। হে সত্যস্বরূপ! একমাত্র তুমিই আমার পথ প্রদর্শক ধ্রুবতারা। আমার ধনের কামনা নেই, নাম যশের কামনা নেই, ভোগের কামনা নেই—এ সকল তো আজ আমার কাছে তৃণবৎ তুচ্ছ। কী ভাবে ও সকল উপার্জন করতে হয় তাও তো আমি জানি না, শেখবার ইচ্ছাও মনে ওঠে না—ধন্য প্রভু! ধন্য

তোমার কৃপা! আমি ভীত নই। ভয়কে আমাদের শাস্ত্রে পাপ বলে। আমি সন্ন্যাসী, আমি নিরালম্ব, আমি বিবিক্ত অরণ্যবিহারী। ২৭।৭।৫২

।। স্বামিজীর উপাসনা ।।

যিনি তোমার অন্তরে ও বাহিরে, যিনি সব হাত দিয়ে কাজ করেন ও সব পায়ে চলেন, তুমি যাঁর একাঙ্গ, তাঁরই উপাসনা কর, আর সব প্রতিমা ফেল ভেঙে। যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট সর্বরূপী, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞেয় সত্য ও সর্বব্যাপীর উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ফেল ভেঙে। যাঁতে পূর্ব বা পর জন্ম নেই, উৎপত্তি বা বিনাশ নেই, গমনাগমন নেই, যাঁতে অবস্থিতি হেতু আমরা অখণ্ড অবিভাজ্য এবং ভবিষ্যতেও সত্য, তাঁরই উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ফেল ভেঙে। হে অবোধ! যে সকল জীবন্ত নারাযণে ও তাঁর অনন্ত প্রতিবিম্বে জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই তাঁকে ছেড়ে তোমরা কাল্পনিক ছায়ার পেছুনে ছুটছ। সেই প্রত্যক্ষ দেবতারই উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা ফেল ভেঙে। ২৮।৭।৫২

।। স্বামিজীর প্রার্থনা ।।

ভক্তি স্রোতে ভেসে চল, সর্বান্তঃকরণে ভেসে চল, নিজের বোলে আর কিছু রেখ না ;. হয়ত কিছু দেরী হবে, কিন্তু আখেরে সচ্চিদানন্দ সাগরে পৌঁছবে। হে প্রভু! আমি চিরদিনই তোমার। এই দেহে যা কিছু প্রকাশ পায়, তা তোমারই ইচ্ছা। এর ভেতর আর 'আমি' বা 'আমার' বলে কিছু নেই—সবই 'তুমি' বা 'তোমার'। হে প্রিয়! আমার কোন সংগতি নেই যে দেবো, আমার বুদ্ধি নেই যে জ্ঞানোপার্জন করবো ; মনের বল নেই যে যোগাভ্যাস করবো, হে মধুরতম! আমি আমার দেহ ও মন তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করছি। তোমার ও আমার মধ্যে কোন বাধা বা আবরণ আমি মানবো না, ধরা না দাও তবুও তোমার দিকেই ছুটব। কুকুরের মত মাংসের অনুসন্ধান না কোরে সচ্চিদানন্দের অনুসন্ধানই তো শ্রেয়ঃ। ২৯।৭।৫২

।। স্বামিজীর প্রার্থনা ।।

ভালবেসে কি হবে? এ নির্বোধের প্রশ্ন আর কোরো না। পৃথিবীকে নিজের অনুকূল ভাবে চলতে দাও। তুমি ভালবাস, আর কিছু চেও না, ভালবাস আর সব মতবাদ ভুলে যাও। মাগো! "তব প্রেমসুরা পানে কর মাতোয়ারা"—প্রেমপাত্র নিঃশেষ করে পাগল হও। "হে প্রভু! আমি যে চিরকালই তোমার।" হে মোর মন! যদি প্রেম যমুনায় ডুবতে এলে তবে তীরে দাঁড়িয়ে কেন? জগৎ ভুলে এই প্রেম সলিলে মিশে যাও।

বিড়ালী ছানাটাকে দুধ দিচ্ছে—জেন জগন্মাতার প্রেম; তাকে মা জগদম্বার প্রতীক বলে নমস্কার কর। এ কথা আমার অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস কর। জপ কর, 'আমি তোমার'। আমরা ঈশ্বরকে যে সর্বত্র দেখতে পাই, অনুসন্ধান করতে বা তর্ক করতে যাব কেন? প্রভু আমাদের মৃত্যু হতে জীবন্ত করুন, হে প্রভু! আমরা যেন অন্ধকারে আলোক স্তম্ভ হই। আমরা যেন জড়ের প্রাণ স্বরূপ, কর্মের প্রেম স্বরূপ হই। তোমরা প্রভুকে ভালবাস, কারণ তিনি যে তোমাদের ভালবেসেছেন। ৩০।৭।৫২

।। স্বামিজীর প্রার্থনা ।।

মা সংসার সমুদ্রে বুঝি আমার তরী ডোবে। ভ্রান্তির ঘূর্ণী, আসক্তির ঝড় ক্রমেই যে বাড়ছে মা, তাতে আবার আমার দাঁড়ি পাঁচজন বোকা এবং মাঝিটা হলো দুর্বল। এদিকে আবার আমার ধৈর্যের পাল [illegible]র বুঝি আমার তরী ডোবে। মা রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

মা! তোমার করুণার আলো পাপী বা পুণ্যবানকে অপেক্ষা করে না, চিরকালই বইছে। তোমার করুণায় প্রেমিক ও হত্যাকারী উভয়েই বেঁচে আছে। মায়ের করুণাতে সবই সিক্ত হয়ে আছে, "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"। প্রকাশ্যের দ্বারা কি প্রকাশিকা কলুষিত হয়, না তাদের অপেক্ষা রাখে? সচ্চিদানন্দময়ী চির পবিত্রা, চির অপরিবর্তনীয়া। মা! তুমি সকলের সত্তারূপে বর্তমান—"নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ"। শিশু স্তন্য পান

করে, মধুকর মধু পান করে; মা তা'দের তুমিই পান করাও। মা তুমিই দুগ্ধ! তুমিই মধু! তুমিই মাতা! তুমিই পুষ্প! ৩১।৭।৫২

।। স্মরণ ।।

"প্রভু! তুমি চন্দন মোর, আমি যে অঙ্গবারি
হে শ্রীবাস! অঙ্গের বসন করেছি তোমারে
আর ত খুলিতে নারি!
তুমি যে ঘনমেঘ! আমি যে চাতকী
শুধু 'জীবন' 'জীবন' বলে ডাকি!
হে অমৃত ইন্দু! মম নয়ন চকোরী মুগ্ধ সতত
চেয়ে থাকে দিবা রাতি।
প্রভুজী! তুমি যে স্বচ্ছ গভীর নীলাকাশ
সেথা দোলে, দোলে কৌস্তুভ—
আমারি প্রেমেরই বাতি॥
প্রিয় হে! তুমি মোর নয়ন অশ্রু মতিয়া।
আমি হই তার মালা
পরশে পরশে রস উদ্‌গার
নব নব সুধা ঢালা॥"

—শ্রীরুহিদাসের প্রাচীন কবিতা অবলম্বনে॥ ১।৮।৫২

।। মনন ।।

"খৃষ্ট না জন্মালে জগৎ উৎসন্ন হয়ে যেত"—এ কথা কি কোরে স্বীকার করি বলো? হে আত্মন্! হে সচ্চিদানন্দ! তুমি সর্বব্যাপী, আমার অন্তরে তোমাকে নমস্কার করি। বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ তো তোমারই অভিব্যক্তি এই জগৎ রক্ষার জন্য। তুমিই বিবেকানন্দকে শিক্ষা দিলে, "আমি তোকে রক্ষা করব, না তুই আমায় রক্ষা করবি?" সেই জগন্মাতৃস্বরূপা পরমাত্মাকে নমস্কার! জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের জল নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকাশ সচ্চিদানন্দে নয়,

সচ্চিদানন্দের প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণে। তবে সচ্চিদানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ নামটী আমার বড় ভাল লাগে। অর্জুন দেখলেন সেই সচ্চিদানন্দ কল্পতরুতে থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে রয়েছে। ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে আকাশের বহুদূর দেখা যায়—সব আকাশ দেখা যায় না, তাই পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব—নূতন নূতন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান। ২।৮।৫২

।। সমর্পণ ।।

"মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জনু ন ছোড়বি মোয়॥
গণাইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার॥
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগবাহির নহি মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহুঁ তুয়া পর সঙ্গ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভব সিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥—শ্রীবিদ্যাপতি॥ ৩।৮।৫২

।। নির্বাণমঞ্জরী ।।

"নহিক দেবতা আমি মনুষ্য বা গন্ধর্ব পিশাচ
নহি স্ত্রী পুরুষ আমি অথবা ক্লীব বা জড়,
আমি হই শিবরূপ প্রকৃষ্ট প্রকাশ॥

বাল যুবা বৃদ্ধ নই, নাহি মোর বর্ণ বা আশ্রম।
গৃহী বা সন্ন্যাসী নহি, শূদ্র বা ব্রাহ্মণ
জগজন্ম নাশ হেতু শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥
অমেয় অমায়া আমি, দর্শনের যোগ্য নহি কভু।
স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জেন ভ্রান্ত্যপাধি মোর
আমি সদা অতীন্দ্রিয় হই, শিবোঽহম্, সদানন্দ বিভু॥
মন্তা নই, গন্তা নই, বক্তা নই আমি
নহি বার্তা, ভোক্তাথবা নহি মুক্তাশ্রম।
মনোবৃত্তিভেদ মোহে ভ্রান্তিজাল ভাসে
সর্ববৃত্তি দীপরূপ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥
লোক-যাত্রা প্রবাহাদি কোথা মোর আছে?
বন্ধ-বুদ্ধি নাহি মোর মুক্তি কোথা রবে?
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হলো, সর্ববৃত্তিহীন
আমি শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥"—শ্রীশঙ্কর॥ ৪।৮।৫২

।। সামীপ্য ।।

বাইবেল বলছেন, "হে প্রভু! যত তোমার দিকে অগ্রসর হব, তত তোমার নিকটস্থ হব।" বেদান্ত বলছেন, "যত আমার আত্মার নিকটস্থ হব, তত আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হব।" কারণ তুমি যে আমার আত্মা, পরম প্রেমাস্পদ! মনে হয় আদর্শ যেন বহু দূরে প্রকৃতির পরপারে আমাদের আকর্ষণ করছে, ক্রমে নিজেকে ও তাঁকে হীনতর না কোরে, আমরা সেইদিকে অগ্রসর হচ্ছি। ক্রমে দেখি তুমি স্বর্গের দেবতা, তুমিই আবার দৃশ্য প্রকৃতির দেবতা। আবার দেখি প্রকৃতিই তুমি; তুমিই আমার দেহ-মন্দির; শেষে দেখি একি! এ যে মন্দিরও তুমি!—দেখি তুমি দেহ, তুমি মন, তুমি আত্মা, তুমি দৃশ্য, তুমি দ্রষ্টা, তুমি স্বর্গের সিংহাসনে, তুমিই আমার হৃদি কমলাসনে। ঋষিরা, দেবতারা তোমাকে কতকাল ধরে অনুসন্ধান কোরে শেষে অতি নিকটতম প্রিয়তমরূপে নিজ হৃদয়েই পেয়েছেন। তোমার বাণী ভুল কোরে বাহিরে শুনেছি প্রভু! কিন্তু তোমার অনাদি প্রীতিময়ী বাণী স্ফুরিত হচ্ছে সদাই আমার অন্তরে। ৫।৮।৫২

॥ স্বাত্মপ্রকাশিকা ॥

"রজ্জুপরি সর্পভ্রান্তি ভাসে, সত্তা তার রজ্জু ভিন্ন নয়।
এ সংসার 'রজ্জুসর্প' সম, সত্য তার ব্রহ্মরূপে রয় ॥
ইক্ষুরসে সদা ব্যাপ্ত শর্করা যেমন। তথা—
আশ্চর্যরূপেতে ব্রহ্ম ব্যাপ্ত চরাচর ॥
মরুভূমে দৃষ্ট জল যথা মরুমাত্র হয়।
সমগ্র ভুবনত্রয় সুবিচারে চিন্মাত্রই রয় ॥
ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত প্রাণী ও জগৎ।
সর্ব জড়জীব হয় আমাতে কল্পিত ॥
সাগরে অঙ্কিত যথা বুদ্বুদ্ তরঙ্গ।
নামরূপ যাহা কিছু সর্ব বিকারিত ॥
সিন্ধু হায়! চাহে কি কভু তরঙ্গত্ব ধ্রুব?
হে মহানন্দ! মহানাত্মা!—
বিষয়ানন্দ বাঞ্ছা তব একি সুসঙ্গত?"—শ্রীশঙ্কর ॥ ৬।৮।৫২

॥ গোলাপ* ॥

"হে প্রিয় মম! তব বিহনেতে
গোলাপ কভু না ফোটে মালঞ্চেতে † যেন।
যদি বা নিতান্তই ফোটে, কেহ যেন ঘ্রাণ নাহি লয়!
তোমা বিনা যদি হৃদে সুখ প্রীতি ভাসে
রক্ত মোক্ষনেতে যেন মৃত্যু মোর আসে।
* * *
"জীবনের বিহ্বলতা তোমা লাগি আসে
দেখি যবে অসহায়, তোমারি বিরহে প্রিয় জেন!
জারাথুস্ট্রী, খৃষ্টান বা মহম্মদীয় হই
(তাতে কিবা এসে যায়)
যা কিছু হই না মোরা, তা'ত তোমারি তরেতে সব প্রিয়!

[* গোলাপ—প্রেমাসক্তি। † মালঞ্চ—চত্ত্ব]

—মোরা সদা তাহাতেই তৃপ্ত হয়ে রই।
হে প্রেম! হৃদয়বিহারী তুমি, সাক্ষী নিরন্তর
প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাহা কিছু
তুমি তাহা সব জান মোর।
জানি নাক কোথা হতে এ বেদনা আসে
কিন্তু জানি সদা ঔষধীটী এর তোমা কাছে আছে॥"

—বাবা তাহির। (পারসীক সুফী উদ্যান হতে অনূদিত)॥

৭।৮।৫২

॥ শান্তিপাঠ ॥

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

অদৃশ্য যা কিছু পূর্ণ, দৃশ্য যা কিছু পূর্ণ। পূর্ণ হতেই পূর্ণের উৎপত্তি। পূর্ণ হতে পূর্ণ গ্রহণ করলে পূর্ণই বর্তমান থাকে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। (শুক্ল-যজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ)॥

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥"

হে দেবগণ! আমরা কর্ণের দ্বারা কল্যাণময় বাক্য শ্রবণ করি। যজ্ঞকর্মে সমর্থ হয়ে নেত্রের দ্বারা শুভ দর্শন করি। স্থির অঙ্গ এবং শরীর দ্বারা স্তুতিশীল আমরা দেবোপাসনার জন্য যেন হিতকর আয়ুঃ ভোগ করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ—ত্রিবিধ তাপের শান্তি হোক। (অথর্ববেদীয় শান্তিপাঠ)॥ ৮।৮।৫২

॥ প্রকৃতি পুরুষ ॥

"শিব সঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা
সুধা পানে ঢলঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না।
বিপরীত রতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা
উভয়ে পাগল পারা লজ্জা ভয় আর মানে না॥"

—০—

"সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচ নটরাজ হে······"

—শ্রীনজরুল॥ ৯।৮।৫২

॥ তুমি ॥

হে প্রভু! তুমি আমার সর্বস্ব, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, নয়ন মণি; এ ত্রিভুবনে তুমি ছাড়া 'আমার' বলবার আর কেউ নেই। তুমি আমার শান্তি, আমার আনন্দ, আমার আশা ও ভরসা। তুমি আমার আশ্রয়, ঐশ্বর্য ও গৌরব। তুমি আমার জ্ঞান ও শক্তি। তুমি আমার গৃহ, বিশ্রাম, আরাম, প্রিয় বন্ধু; তুমি আমার নিকট হতেও নিকটতম। তুমি আমার বর্তমান, তুমি আমার ত্রিকাল, আমার স্বর্গ ও মোক্ষ। তুমি আমার শাস্ত্র, বিধি, নিষেধ, গুরু; তুমি আমার নিঃসীম আনন্দ-সমুদ্র; তুমি আমার উপায় ও উদ্দেশ্য। হে প্রভু! হে শান্তি দাতা! ১০।৮।৫২

॥ ষোড়শী ঃ সৌন্দর্যলহরী ॥

"গিরামাহুর্দ্দেবীং দ্রুহিণগৃহিনীমাগমবিদো
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনযাম্।
তুরীযা কাপি ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা
মহামাযা বিশ্বং ভ্রাময়সি পরংব্রহ্মমহিষি!
নিধে নিত্যস্মেরে নিরবধিগুণে নীতিনিপুণে!
নিরাঘাটজ্ঞানে নিগমপরিচিত্তৈকনিলয়ে।
নিয়ত্যানির্মুক্তে নিখিলনিগমান্তস্তুতপদে!
নিরাতঙ্কে নিত্যে! নিগময় মমাপিস্তুতিমিমাম্॥"—শ্রীশঙ্কর॥

হে পরমব্রহ্ম মহিষি! আগমবিদ্ জ্ঞানীরা ব্রহ্মার পত্নীকে বাগ্‌দেবী ক্রিয়াশক্তি বলেন, তাঁরা হরি পত্নীকে পদ্মা (জ্ঞানশক্তি) বলেন; এবং অদ্রি-তনয়াকে হরসহচরী (ইচ্ছাশক্তি) বলেন; কিন্তু হে মহামায়ে! এই ত্রিশক্তির অতীত ত্রিগুণাতীতা চতুর্থী (চিতি শক্তি) তুমি কে? দুরধিগমা, নিঃসীম-মহিমা মহামায়া তুমি, এই বিশ্বকে ভ্রামিত করছ। হে বিশ্ব আধারভূতে! নিত্য হাস্যমুখি! অসীম গুণশালিনি! নীতি নিপুণে! অপরিমিত জ্ঞানময়ি! বেদান্তবেত্তা-চিত্তনিবাসিনি! নিয়তিনির্মুক্তে! নিখিল-বেদান্ত-স্তুতপদে! হে নির্ভয়ে! আমার এই স্তবকে বেদবৎ প্রামাণ্য কোরে দাও। ১১।৮।৫২

॥ "কোঠার ভেতর চোর কুঠরী" ॥

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে ॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সারে।
ওরে কোঠার ভেতর চোর কুঠরী, ভোর হলে সে লুকাবেরে ॥
ষড় দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্র সারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গব হাঁড়ি, বোঝ্ না রে মন ঠারে ঠোরে ॥

—শ্রীরামপ্রসাদ ॥

—০—

"ভুবনেশ্বর হে,
মোচন কর বন্ধন সব মোচন কর হে···"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥ ১২।৮।৫২

॥ সৌন্দর্য লহরী ॥

"অবিদ্যানামন্তস্তিমিরমিহিরোদ্দীপনগরী"—যে অহংকাররূপ গাঢ় তিমিররাশি বিদ্যমান থাকে, মা! তুমি তথায় জ্ঞানরূপ মিহিরের উদয় কোরে, দ্বাদশাদিত্য স্থানভূত নগরীস্বরূপ হয়ে আছ। "জড়ানাং চৈতন্যস্তবকমকরন্দ শ্রুতিশিরা"—জড়ব্যক্তিগণের চৈতন্যরূপ নানা জাতীয় পুষ্পগুচ্ছ হতে যে মকরন্দ ক্ষরণ হয, মা তুমি তার শিরাস্বরূপা।" "দরিদ্রাণাং চিন্তামণিগুণনিকা"—মা, তুমি দরিদ্রদের কামফলপ্রদ চিন্তামণিগুণস্বরূপা। "জন্মজলধৌ নিমগ্নানাং দংষ্ট্রামুররিপুবরাহস্য ভবতি"—যারা সংসার জলধিতে মগ্ন, তাদের উদ্ধারের জন্য মা! তুমি বরাহরূপী শ্রীহরির দংষ্ট্রা স্বরূপিনী ॥—শ্রীশংকর ॥ ১৩।৮।৫২

॥ আরতি ॥

গগনময় থালে রবিচন্দ্র দীপক বনে
তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে ॥
ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে
সকল বন রাই ফুলন্ত জ্যোতি রে ॥
ক্যায়সে আরতি হোবে ভব খণ্ডন তেরি আরতি।
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥

*　　*　　*

হরিচরণ কমল মকরন্দ লোভিত মন
অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা
কৃপাজল দেও নানক-সারঙ্গী কো
হো যাযে তেবে নাম বাসা ॥—গুরু নানক ॥

—০—

"গাই গীত শুনাতে তোমায
ভালমন্দ নাহি গণি
নাহি গণি লোকনিন্দা যশঃ কথা ॥…"

—শ্রীবিবেকানন্দ ॥ ১৪।৮।৫২

॥ "কিন্নাম রোদিষি" ॥

"কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ ॥

হে সখে! তুমি কাঁদছ। তোমাতেই তো সব শক্তি রয়েছে। হে ভগবান্! তোমার ঐশ্বর্যশালী স্বরূপ প্রকাশ কর। এই ত্রিভুবন সমস্তই তোমার পাদমূলে। জড়ের কোন ক্ষমতা নেই, আত্মাই প্রভাব সম্পন্ন।

"ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যন্ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।

প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যম্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণ দাসা বয়ম্ ॥”

—শ্রীবিবেকানন্দ ॥

দেহকেই যারা আত্মা বলে জানে, তারা কাতরে সকরুণ ভাবে বলে, আমরা ক্ষীণ ও দীন। একেই বলে নাস্তিক্য বুদ্ধি। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত তখন আমরা নির্ভয় ও বীর—এই হলো আস্তিক্য বুদ্ধি। আমরা রামকৃষ্ণ দাস। (পত্রানুবাদ)॥ ১৫।৮।৫২

॥ অমরত্বের আহ্বান ॥

“পীত্বা পীত্বা পরমমৃতং বীত সংসাররাগাঃ
হিত্বা হিত্বা সকল কলহ প্রাপিনীং স্বার্থসিদ্ধিম্।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা গুরুবরপদং সর্বকল্যাণরূপং
নত্বা নত্বা সকল ভুবনং পাতুমামন্ত্রয়াম্ ॥

সংসারাসক্তিশূন্য হয়ে সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ কোরে পরমামৃত পান করতে করতে সর্বকল্যাণস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান কোরে, সমস্ত পৃথিবীকে প্রণামপূর্বক সকলকে ঐ অমৃত পানে আহ্বান করছি।

“প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহর ব্রহ্মাদিদেবৈর্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাং
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎ পূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ ॥”—শ্রীবিবেকানন্দ ॥

অনাদি-নিধন বেদসমুদ্র মন্থন কোরে যা পাওয়া গেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যাতে বলাধান করেছেন, যা পার্থিব নারায়ণ অবতারগণের প্রাণসার দিয়ে পূর্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অমৃতের পাত্রস্বরূপ দেহ ধারণ করেছেন। ১৬।৮।৫২

॥ ঔৎসুক্য ॥

(পঞ্চম, রাগানুগা ভক্তি—প্রণয়—দ্বিতীয় স্তর)

“আজিই যদি! এই রাতেতে!—
একটীবার একটীবার পাইগো আমি—

হৃদি রক্তদলের শান্তিমাখা পরশখানি—

তা হলে তো—

করুণার ঐ শিশিরঝরা পরশ সুধা

পায় যদি মোর হৃদ্ গোলাপে

আজই যদি ! এই রাতেতে !—

আমার ধ্যানের মাঝে ঘুমিয়ে আছে জগৎখানি—

তুমি কোথা কোন গুহাতে লুকিয়ে থাক

কাহার ধ্যানে, হে মোর যোগী ?

একটীবার পাইগো আমি—

আ—জি যদি !—তা হলে তো

আমার এই জীবনমরু—

পুড়ছে সদাই বাসনার ঐ বহ্নি ধারায়—

আমার এই জীবনমরু শীতল হোত

তোমার ঐ প্রেম দরিয়ার জোয়ার লাগি !"

—(পারসীক সুফী উত্থান হতে) ॥ ১৭।৮।৫২

।। কালী নামের গণ্ডি ।।

কালী নামের গণ্ডি দিয়ে আছিরে দাঁড়ায়ে

শোনরে শমন তোরে কই, আমি তো আটাশে নই

তোর কথা.কেন রব সয়ে।

এ তো ছেলের হাতের মোয়া নয় যে খাবে ভোগা দিয়ে ॥

কটু কবি সাজা পাবি, মাকে দিব কোয়ে

সে যে কৃতান্ত দলনী শ্যামা, বড় ক্ষ্যাপা মেয়ে ॥

শ্রীরামপ্রসাদে কয় শ্যামা গুণ গেয়ে

আমি ডঙ্কা মেরে চলে যাব, তোর চোখে ধুলি দিয়ে ॥

—শ্রীরামপ্রসাদ ॥

"তড়িৎ গতিতে চলে যাও, হে অমৃতপুত্র গুণধাম
নক্ষত্র বিছান পথ দিয়ে, চিন্তা বাধা যেথা অবসান ॥…"
—শ্রীবিবেকানন্দ ॥ ১৮।৮।৫২

[স্বামিজীর Requiescat in Peaceএর লেখক কৃত অনুবাদ হইতে]

॥ বিষ্ণু, দ্যৌ ও পৃথিবী সূক্ত ॥

"হে বিষ্ণু! তুমি মাত্রার অতীত। তুমি অবতারাদি রূপে শরীরে বর্দ্ধমান হলে তোমার মহিমা কেহ অনুব্যাপ্ত করতে পারে না। পৃথিবী হতে আরম্ভ কোরে উভয় লোক আমরা জানি। কিন্তু হে দেব! তুমিই কেবল পরম লোক অবগত আছ। ১ ঋক্

"হে দেব বিষ্ণু! যারা জন্মিযাছে ও যারা জন্মাবে, কেউ তোমার মহিমার অপর পার দেখতে পায় না। দর্শনীয় বৃহৎ নাক্ (স্বর্গ) তুমিই উর্দ্ধে ধারণ করেছ। তুমি পৃথিবীর পূর্বদিক ধারণ করেছ। ২ ঋক্

"হে দ্যৌঃ ও পৃথিবি! তোমার স্তুতিকারী মানুষকে দান করবার ইচ্ছাযুক্ত হযে অন্নবতী, ধেনুমতী ও সুন্দর যব বিশিষ্টা হযেছ। হে বিষ্ণু! এই দ্যৌঃ ও পৃথিবীকে তুমি বিবিধ প্রকারে ধারণ করছ। তোমার সর্বত্রস্থিত ময়ূখ দ্বারা এই পৃথিবীকে ধারণ কোরে আছ।" ৩ ঋক্ ॥ ঋঃ বেঃ। ৭ ম। ৯৯ সূ॥ ১৯।৮।৫২

॥ উপনিষৎ ॥

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষযোহ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥ ৬ মন্ত্র

সত্যের জয় হয়, মিথ্যার নয। সত্যের দ্বারা দেবযান মার্গ বিস্তৃত হয়, যার দ্বারা আপ্তকাম ঋষিরা ঐ পদ প্রাপ্ত হন, সেখানে সেই সত্যের পরম নিধান বর্ত্তমান।

"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥" ৭ মন্ত্র।

—মণ্ডুক উঃ ৩।১

তিনি মহান্ দিব্য এবং অচিন্ত্যরূপ। তিনি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতররূপে ভাসমান, তিনি দূর হতে দূরে এবং এই শরীরের অতি নিকটতম। তিনি চেতন প্রাণীর মধ্যে শরীরে বুদ্ধিরূপ গুহায় লুকিয়ে আছেন। ২০।৮।৫২

॥ মনীষা পঞ্চকে চাণ্ডাল প্রশ্ন ॥

"অন্নময়াদন্নময়মথবা চৈতন্যমেব চৈতন্যাৎ,
দ্বিজবর! দূরীকর্তুং বাঞ্ছসি কিং ব্রূহি গচ্ছ গচ্ছেতি!

চণ্ডাল ছদ্মবেশী বিশ্বনাথ ও জগদম্বা আচার্যপাদ শ্রীশঙ্করকে বল্লেন, "হে দ্বিজবর! 'দূর হ', 'দূর হ' কাকে বলছ,—অন্নময় কোষ থেকে অন্নময়কে অথবা চৈতন্য হতে চৈতন্যকে দূর করবার ইচ্ছা করছ!

"কিং গঙ্গাম্বুনি বিম্বিতেঽম্বরমনৌ চণ্ডালবাটীপয়ঃ-
পূরে চান্তরমস্তি কাঞ্চনঘটীমৃৎকুম্ভয়োর্বাম্বরে
প্রত্যগ্বস্তুনি নিস্তরঙ্গ সহজানন্দাববোধাম্বুধৌ
বিপ্রোঽয়ং শ্বপচোঽয়মিত্যপি মহান্ কোঽয়ং বিভেদ ভ্রমঃ ॥"

—শ্রীশঙ্কর ॥

গঙ্গাজলে কিম্বা চণ্ডাল ভবনস্থিত জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত সূর্যের কি কোনরূপ পার্থক্য আছে? নিশ্চল স্বাভাবিক আনন্দজ্ঞান সমুদ্ররূপ প্রত্যগ্বস্তুতে এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, এই ব্যক্তি চণ্ডাল—এইরূপ গুরুতর ভেদ করছ কেন? ২১।৮।৫২

॥ হস্তামলক ॥

পথিপার্শ্বস্থ হস্তামলককে দেখে শ্রীশংকর জিজ্ঞাসা করেন, 'হে শিশু! তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাবে?' হস্তামলক উত্তর দিলেন—

"মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথকত্বেন নৈবাস্তি জাতু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ
স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৫

মুখের আভাস যা দর্পণে দৃশ্যমান হয়, তা যেমন কখন মুখ হতে পৃথগ্‌ ভূত নয়, সেইরূপ বুদ্ধি দর্পণে প্রতিবিম্বিত যে জীব, সেই নিত্য উপলব্ধি স্বরূপ 'অহমাত্মা'।

"যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্‌।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ
স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৬

যেমন দর্পণের অভাবে মুখাভাসের হানি হলে একমাত্র মুখই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ বুদ্ধির বিয়োগে নিরাভাসক যিনি থাকেন, আমি সেই নিত্য উপলব্ধি স্বরূপ 'অহমাত্মা'।

"য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ
স নিত্যোপব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা ॥" ৮—শ্রীশঙ্কর

যিনি এক এবং স্বভাবতঃ শুদ্ধ চিত্তরূপে বিভাত, যিনি প্রকাশস্বরূপ হয়েও নানা বুদ্ধিতে বহুরূপে প্রতিভাত হন, যেমন শরাবস্থ জলে সূর্য প্রতিবিম্ব বহু প্রতীত হলেও যেমন সূর্য এক, সেইরূপ আমিই সেই নিত্য উপলব্ধি স্বরূপ 'অহমাত্মা'। ২২।৮।৫২

।। অষ্টাবক্র ।।

"শূন্যা দৃষ্টির্বৃথা চেষ্টা বিকলানীন্দ্রিয়াণি চ।
ন স্পৃহা ন বিরক্তির্বা ক্ষীণসংসারসাগরে ॥৯

হয়েছে নির্বাণ প্রায় যাহার সংসার
নয়নের শূন্যদৃষ্টি পরিচয় তার ;

কায়চেষ্টা নাহি ধরে, গেছে ফলোদ্দেশ
বালোন্মত্ত-মূকবৎ ব্যবহার শেষ ;
ইন্দ্রিয় থাকিতে যেন সকলি বিকল
আসক্তি বিরক্তি দুই গেছে রসাতল।

"ন জাগর্ত্তি ন নিদ্রাতি নোন্মীলতি ন মীলতি।
অহো পরদশা কাপি বর্ত্ততে মুক্ত চেতসঃ ॥ ১০

তত্ত্বজ্ঞ জাগ্রত নন বদ্ধজীব প্রায়
বাহ্যবস্তু দেখিবারে দৃষ্টি নাহি ধায়
নিদ্রিতও নন তিনি আঁখি না মুদিত
মুক্তাত্মার পরা দশা না হয় বর্ণিত ॥

—(সূত-সংহিতাবলম্বনে ১৭।৯,১০)॥ ২৩।৮।৫২

॥ কাদম্বিনী রূপে ॥

দিবা নিশি ভাবরে মন, অন্তরে করালবদনা।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্‌বসনা ॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জাননা।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দ রসে মগনা ॥
আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়ে কেন ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখ না ॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পূরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্বাণে কি গুণ বল না ॥

—শ্রীরামপ্রসাদ ॥

—০—

"জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।..."—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥ ২৪।৮।৫২

॥ কল্পতরু ॥

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটারে, তত্ত্বকথা শুধাইবি॥
প্রথম ভার্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
তাদের দুই সতীনে পীরিত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥
ধর্মাধর্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
অহংকার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহগর্তে টেনে নেয়, ধৈর্য খোঁটা ধরে রবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি॥

—শ্রীরামপ্রসাদ॥

—০—

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়
ও তোর পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয়!······"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ॥ ২৫।৮।৫২

॥ বিশ্বরূপ ॥

"অসংখ্য তোমার বাহু অসংখ্য উদর
অসংখ্য নয়ন তব ওহে বিশ্বেশ্বর!
চারিদিকে হেরি তব অন্তহীন রূপ
আদি মধ্য অন্ত নাহি ওহে বিশ্বরূপ!
অগ্নি সূর্য চতুর্দিকে হলে প্রজ্বলিত
তাদের যেরূপ দ্যুতি হয় প্রকাশিত
সেইরূপ দ্যুতিমান তোমারে নেহারি
তাহে দুনিরীক্ষ্য যে হয়েছ শ্রীহরি!
তাহে দেখি একি তব অপ্রমেয় রূপ
কে করে নিশ্চয় 'তুমি হও এইরূপ!'

তা হলেও আজি কিন্তু তব কৃপা বলে
কিরীট শোভিত আর কৌমুদকী করে
চক্রপাণিরূপে চতুর্দিকে বর্তমান
তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখি বিস্ময়মান !"

—শ্রীগীতা ১১শ অধ্যায়ে ॥ ২৬।৮।৫২

॥ বিশ্বরূপ ॥

"তুমি পরমাক্ষর পরম বেদনীয়,
তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়,
তুমি অব্যয় শাশ্বত ধর্মের রক্ষক,
সনাতন পুরুষ হও তুমিই হে দেব !
এই মোর দৃঢ় মতি জানিও নিশ্চয় ।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি না দেখি তোমার
আদি মধ্য অন্তহীন সুবীর্য অপার
অনন্ত বাহুর ছটা শশী সূর্য চক্ষে দীপ্ত রয় ।
তব মুখে একি হেরি দীপ্ত হুতাশন
স্বতেজেতে সন্তাপিছ এ বিশ্ব ভুবন !
হে মহাত্মন্ ! দ্যোঃ ও পৃথিবী মধ্যে সকল অন্তর
তোমাদ্বারা ব্যপ্ত হয়ে আছে নিরন্তর
দেখি তব এই উগ্র কী অদ্ভুত রূপ
প্রব্যথিত লোকত্রয়, ব্যাপ্ত সর্বদিক ।"

—শ্রীগীতা ১১শ অধ্যায় ॥ ২৭।৮।৫২

॥ পথহারা ॥

"ঐ মহান্ আকাশ ধরা দেয়, তোমারই মহত্ত্ব সুমহান্
এ ধরিত্রী স্নেহ ধৈর্য তব, তারকিত বিচিত্র আকাশ
তোমারি গৌরবে জ্যোতির্ময় !
আত্মা মোর ছিন্ন জ্ঞান রশ্মি রেখা !
খসে পড়া পুষ্পসম প্রেম !

বিদায় নিয়েছে ঐ মাতৃবক্ষ হতে দুরন্ত শিশুর মত
ক্ষণেকের তরে।
বাসনার বহ্নিমালা জ্বলে ধিকি ধিকি,
উল্কাসম তোমা হতে ক্রমে
দূর হতে দূরান্তে মিলায়!
বৃত্ত পথে কোথা বল যাবে পথ হারা!
ফিরি তাই আসে পুনঃ জ্যোতির্গর্ভ মাঝে :
শ্বাসে, বোধে, বেদনায় তোমাতেই নিবাসী সদা আমি।
জগতের যবনিকা লুকাইয়া রাখে যাহা তোমা
আজি পঞ্চ স্বচ্ছরূপ তারা, ধরিয়াছে পঞ্চ দ্বারে মোর।
অর্দ্ধদিক্ চক্রবালে অরুণিমা মাখা দিবা নামে
গিরিশৃঙ্গ বিকীর্ণিত উষার মুকুতা বোন দিয়ে
এ যে হেরি দিব্য আঁখিপাত! সুদিব্য আবাস হতে তব
মুক্ত বাতায়ন দিয়ে, চির দিবা ঝরে অবিরাম!"
—(লামার্টাইন্ অবলম্বনে) ॥ ২৮।৮।৫২

॥ আদ্যাশক্তি ॥

"দীন তারিণী দুরিতহারিণী সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণ ধারিণী।
সৃজন পালন সংহারকারিণী সগুণা নিগু´ণা সর্বস্বরূপিণী ॥
ত্বং হি কালী তারা পরমা প্রকৃতি
ত্বং হি মীন কূর্ম বরাহ প্রভৃতি।
ত্বং হি স্থল জল অনল অনিল
ত্বং হি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী ॥
সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়
তন্নতন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়।
বৈশেষিক বেদান্ত ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত
তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারে নি ॥"—মহারাজ শিবচন্দ্র ॥

(ক্রমশঃ) ২৯।৮।৫২

॥ আদ্যাশক্তি ॥

"নিরূপাধি আদি অন্ত রহিত
করিতে সাধক জনার হিত।
গণেশাদি পঞ্চরূপে কালবঞ্চ
ভব ভয় হরা ত্রিকালবর্তিনী ॥
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার
নিরাকার উপাসকে নিরাকার।
কেহ কেহ কয় ব্রহ্মজ্যোতির্ময়
সেই তুমি নগ তনয়া জননী ;
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়,
সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়।
তৎপরে তুরীয়া অনির্বচনীয়া
সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিণী ॥"

—মহারাজ শিবচন্দ্র ॥ ৩০।৮।৫২

॥ ব্রহ্ম ॥

"তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথা ক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রযায়ন্তে
তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ ১

সেই ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ। যেমন অত্যন্ত প্রদীপ্ত অগ্নি হতে তারই স্বরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, হে সোম্য! সেই প্রকার অক্ষর ব্রহ্ম হতে বিবিধ ভাব প্রকট হয়ে তাঁতেই লয় পায়।

"দিব্যো হ্মূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥"২

(মুণ্ডকোপনিষদি ২।২) ॥

সেই অক্ষর ব্রহ্ম দিব্য, অমূর্ত, পুরুষ, বাহিরে ও অন্তরে ব্যাপ্ত, অজ, অপ্রাণ, অমনঃ শুভ্র অক্ষর-প্রকৃতি হতেও উৎকৃষ্ট। ৩১।৮।৫২

॥ অক্ষর পুরুষ ॥

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩

এই অক্ষর পুরুষ হতে প্রাণ উৎপন্ন হয় এবং ঐ থেকে মন, সমগ্র ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ জল এবং সারা সংসার ধারণকারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে।

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥" ৪

—(মুণ্ডক উপনিষৎ ২।১) ॥

দ্যুলোক যাঁর মস্তক, চন্দ্রমা সূর্য যাঁর নেত্র, দিক্ সকল কর্ণ, প্রসিদ্ধ বেদ যাঁর বাণী, বায়ু প্রাণ, সারা বিশ্ব যাঁর হৃদয়, যাঁর চরণে পৃথিবী, সেই দেবতা—সকল ভূতের অন্তরাত্মা। ১।৯।৫২

॥ কুণ্ডলিনী স্তুতি ॥

একবার জাগো মা কুলকুণ্ডলিনি।
(তুমি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী (মা) তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী)
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার পদ্ম বাসিণী।
ত্রিকোণে জলে কৃশানু তাপিত হইল তনু
ওমা মূলাধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভু-শিব-বেষ্টিনি।
গচ্ছ সুষুম্নারই পথ স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত
ওমা মণিপুরা-অনাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণি ॥
শিরসি সহস্র দলে পরম শিবেতে মিলে
মাগো ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দ-দায়িণি ॥

—•—

"পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পুরুষোত্তম পরমানন্দ
নন্দকে নন্দন আনন্দকন্দ যশোদানন্দ শ্রীগোবিন্দ।..."

—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর॥ ২।৯।৫২

॥ বেদ স্তুতি (টীকা) ॥

"দম্ভ ন্যাস ছলে লোককে বঞ্চনা করেছি, ভৌগেক চিন্তাতুর, অহর্নিশি সম্মোহ প্রাপ্ত, মঠাদি নির্মাণ ব্যাপারে ধনসংগ্রহ-পরিশ্রম-হেতু অবশ, অতএব অজ্ঞ, অতএব তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কোরে সন্ন্যাস নিয়েছি এবং সন্ন্যাস ত্যাগ কোরে ভোগের জন্য আকুল, অজ্ঞজনের দ্বারা সম্মানহেতু মদ প্রাপ্ত। অতএব হে দীননাথ! দয়া নিধান! পরমানন্দ! প্রভো! পাহি মাং॥

"হে মাধব! তোমার জ্ঞান বা তোমার শ্রবণ বর্ণনজা ভক্তি—আমাকে দাও, যার দ্বারা আমি কখন বিধি শাস্ত্রের কিঙ্কর হব না।

"হে অনন্ত! দ্যু পতিরা তোমার অন্ত পায় না। তুমি নিজেও তোমার অন্ত পাও না। শ্রুতিশির বেদান্তও তোমার অন্ত পায় না, তারা কেবল 'নমঃ' 'জয় জয়' বলে তাদের স্তব সমাপ্ত করে এবং আমিও তাঁদের পদানুসরণ করছি।"

—শ্রীধর ৩।৯।৫২

॥ কাব্য সুন্দরী ॥

হে মহামায়ে! জগতের সর্ব বিভৎসতা ও সর্ব সৌন্দর্যের খনি হলে তুমি। ধন্য রামকৃষ্ণ, দেখলেন তুমিই বারন্দায় বসে আলবোলা টানছ, আবার কুললক্ষ্মী পরমা সতী গঙ্গা স্নানে যাচ্ছ। মা তুমিই দুঃখ দাত্রী, তুমিই দুঃখ মোচন-কারিণী। তুমিই দুঃখ ভোগ করাও, দুঃখ মোচনের জন্য 'প্রার্থনা করাও; তুমিই সিদ্ধান্তাকারা, তুমিই সন্দেহরূপা। কবির ভেতর দিয়ে তুমিই তোমার স্তব রচনা কর, নাস্তিকের ভেতর দিয়ে তুমিই তোমার নিন্দা করাও, সমালোচনা করাও। হে পরমা কাব্য সুন্দরি! প্রতি ব্যক্তিই তোমার অচিন্ত্যা, অনন্তা কল্পনা শক্তির এক একটী অভিব্যক্তি। তুমিই ব্রহ্মলোকের মাধুর্য ও পবিত্রতা, তুমিই পুতিগন্ধময় প্রাণপঙ্ক, তুমিই তাতে জীবন পদ্মরূপে অভিব্যক্তা। ভাল ও মন্দ বোধ তুমিই করাও, আবার উভয়ের হাত থেকে মাগো তুমিই নিস্তার দাও। ৪।৯।৫২

॥ দীনবন্ধু রামকৃষ্ণ ॥

হে উপনিষদ্ বিগ্রহ! তোমাকে নমস্কার। হে সমবেত উপনিষদের বাণী-রূপ জীবন! তোমাকে নমস্কার। হে সর্বমনীষী ও ঋষি মণ্ডলের চিন্তাধারার সুসংগত প্রকাশ! তোমাকে নমস্কার। তোমার মস্তিষ্কে শ্রীশংকর, তোমার হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য, তোমার সঙ্ঘনীতি ও বৈরাগ্যে শ্রীবুদ্ধ, তোমার কর্মে ও শাসনে ভগবান বাসুদেব, তোমার সত্য রক্ষায় ও গার্হস্থ্যে শ্রীরামচন্দ্র, তোমার জীব-দুঃখ-গ্রহণরূপ আত্মবলিদানে খৃষ্ট, তোমার সামাজিক উদারতায় মহম্মদ বর্তমান। হে ধর্মস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার! নমস্কার! নমস্কার! তোমাকে ভূয়ো ভূয়ঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।করি। হে অকামহত! অকাঞ্চনস্পৃষ্ট! অনহংকার! সর্ব দুঃখীর দরদী, দীনবন্ধু! হে দুর্বলের বল, নির্যাতিতের রক্ষক! হে দেবাসুর রাক্ষস মানব দর্পহারি! হে শরণাগত পরিপালক শ্রীরামকৃষ্ণ! তোমাকে অনন্তকাল ধরে নমস্কার করি, তোমাকে অনন্ত চক্ষে দর্শন করি। ৫।৯।৫২

॥ তিনিই সত্য তিনিই তাই ॥

"যিনি প্রথম জাত-(হিরণ্যগর্ভ)-কে জানেন, যিনি তপঃ প্রসূত, ক্ষিতিরও কারণ জলের পূর্বে সৃষ্ট, পঞ্চতন্মাত্র যাঁর আশ্রিত, যিনি হৃদয় গুহায় বাস করেন, যিনি তাঁকে জেনেছেন, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য, তিনিই তাই।

"যিনি অদিতি-(ভোক্তা)-কে জানেন, যিনি সর্ব দেবতার প্রাণ, যিনি প্রাণরূপে জাত, যিনি পঞ্চতন্মাত্র সমবায়ী, যিনি প্রতি জীব হৃদয়ে প্রবেশ কোরে বাস করেন—তিনিই ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই সত্য, তিনিই তাই।

"যে জ্ঞানাগ্নি গুরু ও শিষ্যরূপ দুখানি অরণি কাষ্ঠে সুগুপ্ত। মাতা যে ভাবে গর্ভ রক্ষা করেন, সেই ভাবে যাঁর উপাসনা করা হয়। জাগ্রতেরা যাঁকে লক্ষ্য কোরে দিবা নিশি স্তুতিরূপ আহুতি প্রদান করেন, তিনিই সত্য, তিনিই তাই।"

—(কঠোপনিষৎ)॥ ৬।৯।৫২

॥ তিনিই সত্য তিনিই তাই ॥

"মহৎরূপী সূর্য কোথা হতে উদিত হন? কোথায়ই বা অস্ত যান? যিনি চক্ষুরাদি সকল দেবতার আশ্রয়, যাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না—তিনিই সত্য, তিনিই তাই। ৯

"যিনি এখানে (হৃদয়ে), তিনিই ওখানে (দ্যুলোকে)। সেখানেও যিনি, এখানেও তিনি। যারা ভেদদর্শী, তারা দেহাভিমান হেতু পুনঃ পুনঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ১০

"বিশুদ্ধ মনে ব্রহ্ম দর্শন হয়, তখন তাঁতে বহুর অনুভব হয় না। যারা ভেদদর্শী তারা মৃত্যু হতে মৃত্যুতে গমন করে। তিনিই সত্য, তিনিই তাই। ১১

"যে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ হৃদয়ে বাস করেন, তিনিই অতীত এঁবং ভবিষ্যতের প্রভু। তাঁকে জানলে আর তাঁকে গোপন রাখা যায় না। তিনিই সত্য, তিনিই ব্রহ্ম।" ১২

—(কঠ উঃ ২।১।৯—১২) ॥ ৭।৯।৫২

॥ অরণ্যের শান্ত মুনি ॥

"অজ্ঞানী শিশুরা কিচির মিচির করে—'জীবনের উদ্দেশ্য আমাদের সিদ্ধ হয়েছে'। কারণ এই কর্মীরা তাদের আসক্তি হেতু বুঝতে পারে না সত্য কি? যখন তাদের পুণ্যফল ক্ষয় হয়, তখন তারা পুনরায় ত্রিতাপ-পীড়িত হয়ে স্বর্গ-ভ্রষ্ট হয়।

"মূর্খেরা ইষ্টাপূর্ত কর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে, এর ওপর কোন উচ্চ চিন্তা তারা করতে পারে না। স্বর্গে সৎকর্মের ফল স্বরূপে অত্যন্ত সুখ ভোগ কোরে আবার এই মনুষ্যেরা ততোধিক নিম্ন লোকে প্রবেশ করে।

"কিন্তু শান্ত মুনিরা অরণ্যে ভিক্ষান্ন দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে তপস্যা করেন এবং হিরণ্যগর্ভের উপাসনার দ্বারা, নির্ধূত পাপ হয়ে সূর্যমণ্ডল ভেদ পূর্বক সেই অমৃত অব্যয় পুরুষকে প্রাপ্ত হন।" —(মুণ্ডক উঃ ১।২।৯—১১) ॥ ৮।৯।৫২

।। অন্তরাত্মা ।।

"সত্যকে প্রকাশ করছি। এক বিশাল অগ্নি হতে যেমন অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে আবার তাতেই মিশে যায়, সেইরূপ হে সখে! নানা জীব সেই অক্ষর ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন হয়ে, আবার তাঁতেই ফিরে যায়।

"সেই অরূপ পুরুষই স্বয়ং জ্যোতিঃ, অস্পৃষ্ট এবং অন্তরে বাহিরে বর্তমান। তিনি প্রাণ-মন-হীন বিশুদ্ধ চৈতন্য এবং শ্রেষ্ঠ অবিনাশী হিরণ্যগর্ভ হতেও শ্রেষ্ঠ।

"তাঁ হতেই প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি,জল এবং ক্ষিতি উৎপন্ন হয়েছে, যিনি সকলের আশ্রয়।

"স্বর্গ তাঁর মস্তক, চন্দ্র সূর্য তাঁর চক্ষু, দিক্ সকল তাঁর কর্ণ, বেদ তাঁর বাক্য, বায়ু তাঁর নিশ্বাস, বিশ্ব তাঁর হৃদয়, পৃথিবী তাঁর পাদপীঠ—তিনিই সকলের অন্তরাত্মা।"

—(মুণ্ডক উঃ ২।১।১—৪)॥ ৯।৯।৫২

।। সাধন রহস্য ।।

"ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কুলে ॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝেরে মন শক্তিরূপা মুক্তা ফলে
তুমি ভক্তি কোরে কুড়িয়ে পাবে শিবযুক্তি মতন চাইলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই ফেরে।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে লও ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥
রতন-মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে মিলবে রতন থরে থরে ॥"

—শ্রীরামপ্রসাদ ॥ ১০।৯।৫২

।। ভুবনমোহিনী ।।

কে রে কামিনী নব দামিনী রূপের ছটায় বিজলী খেলায়।
দনুজ দলনী, অসুর নাশিনী, ভুবন মোহিনী কে এলি ধরায় ॥

দুটি পদতলে, অলি দলেদলে মধু লোভ ছলে ঘুরিয়া বেড়ায় ;
সার ধন বলি, নিল হৃদে তুলি, ভোলা ভাবে তুলি লুটিছে পায় ॥
কোটি সূর্য উজ্জল নয়না ভীমা ভৈরবী কাল বরনা,
অট্টহাসিনী গজগামিনী করালবদনী অম্বিকে,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ দায়িকে।
মুক্তকেশী কেশরাশি ঢাকা তমালের পাশে যেন চাঁদ রেখা
মেঘে বিদ্যুতে যেন মিশে থাকা, ষড় রিপুদলে দলিছে পায়।
(মায়ের) ক্ষীণ কোটি হেরি, বুঝিবা কেশরী, লাজ পাশরি কাননে ধায়,
কদলীর তরু জিনিয়া উরু দরদর ধারে রুধির বয়।
সুর পালিনী মদমর্দিনী রণরঙ্গিণী নেচে বেড়ায়।
করম ডোর নাশ গো মোর গরভ যাতনা দিও না আমায় ॥

—০—

"প্রভু আমার, প্রিয় আমায়, পরম ধন হে
চির পথের সঙ্গী আমার চির জীবন হে ॥..."

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥ ১১।৯।৫২

॥ দিব্য অতিথি ॥

হে প্রভু! তুমি অবতীর্ণ ব্রহ্ম। তুমি সচ্চিদানন্দ সাগরে এক বিরাট তরঙ্গ। তুমি অনন্ত নিঃসীম হয়েও সীমার মধ্যে ক্রীড়া করছ। এ অসীমে সসীমের ক্রীড়া অতি জটিল। হে দিব্য-অতিথি! তুমি আবার সাধু-সন্তদের মধ্যেও আতিথ্য স্বীকার কর। হে স্বর্গীয় আনন্দ! তুমি পুষ্পের মধ্যে মধুর ন্যায় আমাদের চিত্তে আবির্ভূত হও। আমরা তোমাকে পান কোরে মধুময় হয়ে যাই। "ওঁ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সেই একই—অবতার; যেমন গঙ্গাই তার ঢেউ। কেবল তুমি যুগে যুগে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন জীব-প্রয়োজনে আবির্ভূত হও। তুমিই জীবের জীবন পথে আলোক স্তম্ভ, ধ্রুবতারা, আমরা কেবল তোমার দিকেই নজর রেখে অগ্রসর হই। ১২।৯।৫২

॥ অভয় ॥

"পোহাল দুঃখ রজনী ;
গেছে 'আমি' 'আমি' ঘোর কুস্বপন ;
নাহি আর ভ্রম—জীবন মরণ ;
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী ॥
বরা ভয় করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতান, গাও জয় জয় ;
বাজাও দুন্দুভি শমন বিজয়
মার নামে পূর্ণ অবনী ॥
কহিছে জননী, কেঁদোনা, রামকৃষ্ণপদ দেখনা।
নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা ;
(হের) মম পাশে করুণার দুটী আঁখি ভাসে।
ভুবন তারণ গুণমণি।"—শ্রীগিরিশচন্দ্র ॥ ১৩।৯।৫২

॥ "কেনেষিতম্ ?" ॥ ॥ "নেদম্" ॥

"কার ইচ্ছায় মন বিষয়ে ধাবিত হয়, মুখ্য প্রাণ তার কর্তব্য সম্পাদন করে ? কার ইচ্ছায় মানুষ কথা বলে ? সেই দেবতা কে ?—যিনি চক্ষু ও কর্ণকে পরিচালিত করেন ?

"যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। ইন্দ্রিয় হতে আত্মাকে বিভক্ত কোরে সংসার পরিত্যাগী জ্ঞানীরা ঐ অমৃতকে লাভ করেন।

"তাঁকে চক্ষু দেখতে পায় না, বাক্য বর্ণনা করতে পারে না, মন চিন্তা করতে পারে না। আমরা তাঁকে জানি না। কেউ তাঁকে কি ভাবে শিক্ষা দেবেন তাও তো জানি না। ইঁনি জ্ঞেয় হতে ভিন্ন, তিনি অজ্ঞানের পার—আমরা পূর্বাচার্যদের নিকট হতে শুনেছি।

"ইন্দ্রিয় যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, ইন্দ্রিয়েরা যাঁর দ্বারা প্রকাশিত, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জানবে। দৃশ্য যা কিছু ব্রহ্ম নয়।"

—(কেন উপনিষৎ ১।১—৯) ॥ ১৪।৯।৫২

॥ "জ্যোতির জ্যোতিঃ" ॥

"হৃদয়ের গ্রন্থি ভেঙে যায়, সর্ব সংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম আর ফল দান করে না, যখন তিনি অনুভূত হন—যিনি উচ্চ ও নীচে সমান।

"নিষ্কলঙ্ক অখণ্ড ব্রহ্ম স্বচ্ছ হিরণ্ময় কোষে প্রকাশিত। তিনি শুদ্ধ জ্যোতিরও জ্যোতিঃ। যাঁরা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানেন, তাঁরা এঁকেই অনুভব করেন।"

"সূর্যালোক নাহি পশে যেথা
নাহি পশে চন্দ্র-তারালোক
নাহিক বিদ্যুৎছটা আরণির কথা কিবা কব ?
তাঁহার ভাসাতে সর্ব জগৎ ভাসিত
তাঁহার আলোকে বিশ্ব হয় জ্যোতির্ময়।
সম্মুখেতে ব্রহ্ম মৃত্যুহীন, পশ্চাতেও তিনি
দক্ষিণ ও সব্য ভাগে একই ব্রহ্ম রন
ওতপ্রেত ব্রহ্ম দেখি উর্ধ্ব অধঃ লোক
এ বিশাল বিশ্বছবি ব্রহ্মমূর্তিময়॥"

—(মুণ্ডক উপনিষৎ, ২।২।৮—১১)॥ ১৫।৯।৫২

॥ "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" ॥

প্রিয় আত্মা অণু হতে অণু, মহৎ হতে মহান্, সর্ব প্রাণীর হৃদয়গুহায় লুক্কায়িত। বাসনামুক্ত পুরুষ অন্তঃকরণের নিস্তব্ধতায় আত্মার মহিমা দর্শন করে এবং দুঃখ-বিমুক্তি লাভ করে।

"বিশ্রাম কালেও ভ্রমণ করেন, শয়নেও সর্বত্র যাঁর গতি—আমি ছাড়া আর এই আনন্দ জ্যোতিঃকে কে জানবে ; তিনি কখন আনন্দে, কখন বিষাদে ভাসেন।

"জ্ঞানীরা ক্ষণভঙ্গুর-দেহ-নিবাসী, অশরীর, বৃহৎ, সর্বব্যাপী আত্মাকে জ্ঞাত হয়ে আর শোক করেন না।

"কেবল বেদ অধ্যয়ন দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, কেবল বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তির দ্বারাও নয়।

"তিনি তাকেই বরণ করেন, যে আত্মাকে বরণ করেছে। এইরূপ ভক্তের নিকটই আত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন।" —(কঠ উপনিষৎ ১।২।২০—২৩)॥

১৬।৯।৫২

।। বাৎসল্য ।।

"এক দুই তিন কোরে প্রতিদিন
গণিতেছি দিন উমা আসিবার।
সে যে দণ্ডে শতবার করে ঘর দ্বারা
কিছুতেই চিত্তে শান্তি নাহি পায়॥
পুরোহিত পায় প্রণমি সুধায়
কন্তে মাস কবে বল গো আমায়
আসিলে সে কন্তে প্রাণের সে কন্তে
উমা জগদম্বে আসবে গো আমার॥
(সে যে) শেফালিকা পাশে কাতরে জিজ্ঞাসে
কত আর বিলম্ব কুসুম বিকাশে
ফুটলে তোমার ফুল উমা মোর আসে
নাশে পুরবাসীর মনের আঁধার॥
দুবেলা কাঁদিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসে
কবে যাবে উমা আনিতে কৈলাসে
যাব বল্লে অমনি আঁখি নীরে ভাসে
বলে প্রাণে ধৈর্য মানে না যে আর॥"

—শ্রীদাশরথি রায়॥ ১৭।৯।৫২

।। কালরাত্রি ঃ ধুমাবতী ।।

"প্রাতর্যা স্যাৎ কুমারী কুসুমকলিকয়া
জাপমালাং জপন্তি
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকসিত বদনা
চারুনেত্রা নিশায়াম্।
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিত কুচযুগা
মুণ্ডমালা বহন্তী।
সা দেবী দেব দেবী ত্রিভুবন জননী
কালিকা পাতু যুষ্মান্॥

বদ্ধা খট্টাঙ্গ কোটৌ কপিলবরজটামণ্ডলং
যা পয়োধৌ
কৃত্বা দৈত্যোত্তমাঙ্গৈঃ স্রজমুরসি
শিরঃ শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
পূর্ণং রক্তৈর্মুরাণাং যমমহিষমহাশৃঙ্গমাদায়পাণৌ
পায়াদ্‌বো বন্দ্যমানঃ প্রলয়মুদিতয়া ভৈরবঃ কালরাত্র্যা ॥"

—উর্দ্ধাম্নায় ॥ ১৮।৯।৫২

॥ শ্রীকাল্যপরাধক্ষমাপণ ॥

"জানামি ত্বাং ন চাহং ভব ভয় শমনীং সর্বসিদ্ধি প্রদাত্রীং
নিত্যানন্দোদয়েশাং নিগমফলময়ীং নিত্যশীলোদয়াঢ্যাম্‌
মিথ্যা কার্য্যোভিলাষৈরনুদিনমভিতঃ পীড়িত দুঃখসঙ্ঘৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিত রদনে কামরূপে করালে ॥
কালাভ্র শ্যামলাঙ্গী বিগলিত চিকুরা খড়্গমুণ্ডাভিরামা
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণপকুলশিরোমালিনী দীর্ঘ-নেত্রা।
সংসারস্যৈকসারা মনসি ন চ ভাবিতা ভাবনাভিঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিত রদনে কামরূপে করালে ॥"—শ্রীশঙ্কর ॥

১৯।৯।৫২

॥ তারা ॥

"মাতর্নীলসরস্বতি প্রণমতাং সৌভাগ্য-সম্পৎ প্রদে
প্রত্যালীঢ়-পদস্থিতে শিবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে।
ফুল্লেন্দীবর-লোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে
খড়্গঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে ॥
বাচামীশ্বরি ভক্তকল্পলতিকে সার্বজ্ঞসিদ্ধিপ্রদে
গদ্যপ্রাকৃতপদ্যজাত রচনা সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদে।
নীলেন্দীবর লোচনত্রয়যুতে কারুণ্যবারাংনিধে
সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চ ত্বমস্মাদৃশাম্‌।"

—নীলতন্ত্র ॥ ২০।৯।৫২

॥ ষোড়শী ঃ ত্রিপুর-সুন্দরী ॥

"সর্বজ্ঞতাং সদসি বাক্‌পটুতাং প্রসূতে
দেবি তদঙ্‌ঘ্রি সরসীরুহয়োঃ প্রণামঃ।
কিঞ্চ স্ফুরন্মুকুটমুজ্জ্বলমাতপত্রং
দ্বে চামরে চ মহতীং বসুধা দদাতি॥
কল্পদ্রুমৈরভিমতপ্রতিপাদনেষু
কারুণ্যবারিধিভিরম্ব ভবৎ কটাক্ষৈঃ।
আলোকয় ত্রিপুরসুন্দরি মামনাথং
ত্বয্যেব ভক্তি-ভরিতং ত্বয়িবদ্ধ দৃষ্টিম্॥
হস্তেতরেষ্বপি নিধায় মনাংসি চান্যে
ভক্তিং বহন্তি কিল মাপরদৈবতেষু।
ত্বামেব দেবি মনসাহমনুস্মরামি
ত্বামেব নৌমি শরণং জননি ত্বমেব॥"

—তন্ত্রসার॥ ২১।৯।৫২

॥ ভুবনেশ্বরী ॥

"অথানন্দময়ীং সাক্ষাচ্ছব্দব্রহ্মস্বরূপিনীম্।
ঈড়ে সকল সম্পত্তৈ জগৎকারণমম্বিকাম্॥
আদ্যামশেষজননীমরবিন্দযোনে-
র্বিষ্ণোঃ শিবস্য চ বপুঃ প্রতিপাদয়িত্রীম্।
সৃষ্টি-স্থিতি-ক্ষয়-করীং জগতাং ত্রয়াণাং
স্তুত্বা গিরং বিমলয়াম্যহমম্বিকে ত্বাম্॥
পৃথ্ব্যা জলেন শিখিনা মরুতাম্বরেণ
হোত্রেন্দুনা দিনকরেন চ মূর্তিভাজঃ।
দেবস্য মন্মথরিপোরপি শক্তিমত্তা-
হেতুস্ত্বমেব খলু পর্বতরাজপুত্রি॥"—তন্ত্রসার॥ ২২।৯।৫২

।। ভৈরবী ।।

"চন্দ্রাবতংস কলিতাং শরদিন্দু-শুভ্রাং
পঞ্চাশদক্ষরময়ীং হৃদিভাবয়ন্তি।
ত্বাং পুস্তকং জপবটীমমৃতাঢ্যকুম্ভং
ব্যাখ্যাঞ্চ হস্তকমলৈর্দধতীং ত্রিনেত্রাম্ ॥
"শব্দার্থ ভাবিভুবনং সৃজতীন্দুরূপা
যা তদ্‌বিভর্ত্তি ত্রিপুরেঽর্কতনুঃ স্বশক্ত্যা।
বহ্ন্যাত্মিকা হরতি তৎ সকলং যুগন্তে
তাং সারদাং মনসি জাতু ন বিস্মরামি ॥
নারায়নীতি নরকার্ণব তারিণীতি
গৌরীতি খেদ-শমনীতি সরস্বতীতি।
জ্ঞানপ্রদেতি নয়নত্রয় ভূষিতেতি
ত্বামদ্রিরাজতনয়ে বহুধা ভজন্তি ॥"

—তন্ত্রসার ॥ ২৩।৯।৫২

।। ছিন্নমস্তা ।।

"নাভৌ শুদ্ধ সরোজবক্ত্র বিলসদ্ বন্ধূকপুষ্পারুণং
ভাস্বদ্ ভাস্কর মণ্ডলং তদুদরে তদ্‌যোনি চক্রং মহৎ।
তন্মধ্যে বিপরীত মৈথুনরত প্রদ্যুম্ন তৎকামিনী—
পৃষ্ঠস্থাং তরুণার্ককোটি বিলসত্তেজঃ স্বরূপাং শিবাম্ ॥
বামে ছিন্ন শিরোধরাং তদিতরে পাণৌ মহাকর্ত্তৃকাং
প্রত্যালীঢ়পদাং দিগন্তবসনামুন্মুক্ত কেশস্রজাম্।
ছিন্নাত্মীয়-শিরঃ সমুল্লসদসৃগ্ ধারাং পিবন্তীং পরাম্
বালাদিত্য সম প্রকাশ বিলসন্নেত্র ত্রয়োদভাসিনীম্ ॥
বামাদন্যত্র (দক্ষিণতঃ) নালং বহুবহুলগলদ্রক্তধারাভিরুচ্চৈঃ
পায়ন্তিমস্থিভূষাং করকমললসৎ কর্ত্তৃকামুগ্ররূপা।
সিতাং স্বর্ণকেশীমপগতবসনাং বর্ণিনীমাত্মশক্তিং
প্রত্যালীঢ়োরুপাদামরুণিতনয়নাং যোগিনীং যোগনিদ্রাম্ ॥

দিগ্‌বস্ত্রাং মুক্তকেশীং প্রলয় ঘনঘটা ঘোররূপাং প্রচণ্ডাং
দংষ্ট্রাদুপ্রেক্ষ্য বক্ত্রোদর বিবরলসল্লোল জিহ্বা প্রভাসাম্।
বিদ্যুল্লোলাক্ষি যুগ্মাং হৃদয়তট লসদ্ভোগিভীমাং সুমূর্ত্তিং
সদ্যশ্ছিন্নাত্মকণ্ঠ-প্রগলিতরুধিরৈর্ডাকিনীং বর্দ্ধয়ন্তীম্॥"

—তন্ত্রসার॥ ২৪।১।৫২

॥ বগলামুখী ॥

"চলৎ কনক-কুণ্ডলোল্লসিতচারু-গণ্ডস্থলীং
লসৎ কনক-চম্পক-দ্যুতিমদিন্দু বিম্বাননাম্।
গদাহতবিপক্ষকাং কলিত লোল জিহ্বাঞ্চলাং
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখ সন্মনঃ স্তম্ভিনীম্॥
পীযুষোদধি-মধ্যচারু-বিলসদ্ রক্তোৎপলে মণ্ডলে
সৎসিংহাসনমৌলিপাতিতরিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীম্।
স্বর্ণাভাং করপীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদ্ গদাবিভ্রমাং
ইত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য সহসা সদ্যোঽথসর্বাপদঃ॥
"মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে
শ্রীবিদ্যে সময়ে মাহেশি কালে কামেশি রামে রমে।
মাতাঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎ পরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে
দাসোঽহং শরণাগতং করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহিমাম্॥
"পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রোকজ্জলাম্।
শিলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেৎ তাং বগলামুখীম্॥"

—শ্রীরুদ্রজামল॥ ২৫।১।৫২

॥ মাতঙ্গী ॥

"তালীদলেনর্পিত কর্ণভূষাং মাধ্বীকমদোদ্‌ঘূর্ণিত নেত্রপদ্মাম্।
ঘনস্তনীং শম্ভু বধূং নমামি তড়িল্লতাকান্ত্যবলক্ষ্য ভূষাম্॥
চিরেণ লক্ষং প্রদদাতু রাজ্যং স্মরামি ভক্ত্যা জগতামধীশে।
বলিত্রয়াঙ্কং তব মধ্যমম্ব, নীলোৎপলং সুশ্রীয়মাবহন্তীম্॥

কান্ত্যা কটাক্ষৈ র্জগতাং ত্রয়াণাং
বিমোহয়ন্তী সকলান্ সুরেশি ।
কদম্বমালাঞ্চিত কেশপাশাং
মতঙ্গকন্যাং হৃদি ভাবয়ামি ॥
ধ্যায়েয়মারক্তকপোলবিম্বং
বিম্বাধরন্যস্তললামবশ্যম্ ।
আলোললীলালকমায়তাক্ষং
মন্দস্মিতং তে বদনং মহেশি ॥" ২৬।৯।৫২

॥ মহালক্ষ্মী কমলা ॥

"মাণিক্য প্রতিম প্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভি-
র্গজৈর্হস্তগ্রাহিতরত্নকুম্ভসলিলৈরাসিচ্যমানং সদা ।
হস্তাব্জৈর্বরদানমম্বুজযুগাভীতির্দধানং হরেঃ
কান্তাং কাংক্ষিতপারিজাতলতিকাং বন্দে সরোজাননাম্ ॥
পদ্মাসনস্থিতে দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
পরমেশি জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোহস্তুতে ॥
শ্বেতাম্বর ধরে দেবি নানালঙ্কার ভূষিতে ।
জগৎস্থিতে জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোহস্তুতে ॥
ত্বং সিদ্ধি স্ত্বং স্বধা স্বাহা সুধা ত্বং লোকপাবনী ।
সন্ধ্যারাত্রিঃ প্রভামূর্ত্তির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনা ।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্ত ফল দায়িনী ॥
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতি স্ত্বমেব চ ।
সৌম্যা সৌম্যৈর্জগদ্রূপৈস্ত্বয়ৈতদ্দেবিপূরিতম্ ॥" ২৭।৯।৫২

॥ বাণী সরস্বতী ॥

"ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী ।
সর্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ

যয়া বিনা জগৎ সর্বং শশ্বৎ জীবন্মৃতং ভবেৎ।
জ্ঞানাধি দেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ॥

যয়া বিনা জগৎ সর্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥

হিমচন্দনকুন্দেন্দু কুমুদাম্ভোজ সন্নিভঃ।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমঃ নমঃ॥

বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ।
তদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥

যয়া বিনাত্র সংখ্যাকৃৎ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে।
কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥

ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥

স্মৃতিশক্তি-জ্ঞানশক্তি-বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী।
প্রতিভা কল্পনাশক্তি র্যা চ তস্যৈ নমো নমঃ॥"

—শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য॥ ২৮।৯।৫২

॥ শ্রীচৈতন্য শিক্ষাষ্টক ॥

"চেতোদর্পণমার্জনং ভব মহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ ১

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি
তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ॥ ২

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিবসহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ॥ ৩

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪

*　　　*　　　*

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥" ২৯।৯।৫২

॥ বিরহ ॥

(শ্রীশ্রীঠাকুর স্বধামে গমন করলে মহাপুরুষ মহারাজ বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত গানটী গাইতে গাইতে কেঁদেছিলেন)—

"হরি গেও মধুপুর হাম কুল বালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছন বঞ্চব ইহ দিন যামিনী॥
নযনক নিদ গেও বযানক হাস।
সুখ গেও পিযা সঙ্গ দুঃখ মঝু পাশ॥
ভণযে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥"

—শ্রীবিদ্যাপতি॥ ৩০।৯।৫২

॥ শ্রীদুর্গাপরাধক্ষমাপন ॥

"শিশৌ নাসীদ্ বাক্যং জননি তব মন্ত্রং প্রজপিতুং
কিশোরে বিদ্যায়াং বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতিমনঃ।
ইদানীং ভীতোঽহং মহিষগলঘণ্টাধনরবাৎ
নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণম্॥

হরিঃ শেতে শেষে নন্থ কমলজো নাভিকমলে
সমাধৌ সংলীনঃ পুরমথনদেবঃ প্রতিদিনম্ ।
ভবাদ্‌ভীতো মাতঃ পদকমলযুগ্মং তব বিনা
নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণম্ ॥
"পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তিকৃতিনঃ
পরং ক্ষীণোঽয়ং তে নিরতিশয়-দীনাধমসুতঃ ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতকৃতির্নো তব শিবে
কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥
জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া ।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে
কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥"—শ্রীশঙ্কর ॥

১।১০।৫২

॥ দ্বাদশশুদ্ধি ॥

"গৃহোপলেপনঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ ।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ ॥
পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্তৈবোচ্চয়নং হরেঃ ।
করয়োঃ সর্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনম্ ।
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে ॥
তৎ কথা শ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসবনিরীক্ষণম্ ।
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে ॥
পাদোদকঞ্চ নির্মাল্য-মালানামপি ধারণম্ ।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুরঃ ॥
আঘ্রাণং তস্য পুষ্পাদেনির্মাল্যস্য তথা প্রিয়ে ।
বিশুদ্ধিস্যাদন্তরস্য প্রাণস্যাপি বিধীয়তে ॥"

—(শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৭ম অধ্যায়ে ৩—৮) ॥

২।১০।৫২

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ॥

বিবেকানন্দ বলতেন, "তাঁর চোখের মাত্র একটী চাহনি একটা মানুষের সমস্ত জীবনকে বদলিয়ে দিতে পারত।" রামকৃষ্ণ কখনও কাকেও তিরস্কার করেন নি। কেবল একটী মাত্র কথা, একটু মাত্র হাসি, হাতের একটু স্পর্শ মানুষকে তার বহু বাঞ্ছিত আনন্দ, বর্ণনাতীত শান্তি এনে দিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ কিরূপ, তা গান গেয়ে এবং কেঁদে কেঁদে বোঝাতেন—

"বাঁশী বাজে বিপিনে (আমার তো না গেলে নয়)
(শ্যাম পথে দাঁড়িয়ে আছে)
তোরা যাবি কি না যাবি বল গো ?
তোদের শ্যাম কথার কথা।
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যাথা (সই রে) ॥
তোদের বাঁশী বাজে কানের কাছে।
আমার বাঁশী বাজে হৃদয় মাঝে ॥
শ্যামের বাঁশী বাজে, বেরাও রাই।
তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাই ॥" ৩।১০।৫২

॥ সদ্‌গুরু ॥

"দৃষ্টান্তো নৈব দৃষ্টস্ত্রিভুবনজঠরে সদ্‌গুরোর্জ্ঞানদাতুঃ
স্পর্শশ্চেত্তত্র কল্প্যঃ স নয়তি যদহো স্বর্ণতামশ্মসারম্।
ন স্পর্শত্বং তথাপি শ্রিতচরণযুগে সদ্‌গুরুঃ স্বীয় শিষ্যে
স্বীয়ং সাম্যং বিধত্তে ভবতি নিরুপমস্তেন বাঽলৌকিকোঽপি ॥"

স্বর্গ মর্ত পাতালে এমন কোন বস্তু দেখা যায় না যা জ্ঞানদাতা সদ্‌গুরুর দৃষ্টান্ত হতে পারে। যদি বল স্পর্শমণি তাঁর দৃষ্টান্ত, কারণ স্পর্শমণি লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করে। না—স্পর্শমণিও গুরুর দৃষ্টান্ত হয় না, কারণ স্পর্শমণি লোহাকে সোনা করে বটে, কিন্তু সেই সোনা আর দ্বিতীয় স্পর্শমণি সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু সদ্‌গুরু শিষ্যকে নিজের তুল্য করেন, সেইজন্য তিনি নিরুপম অথবা অলৌকিক।—(বেদান্তকেশরী, শ্রীশঙ্কর) ॥ ৪।১০।৫২

।। সদ্‌গুরু ।।

"যদ্বৎ শ্রীখণ্ডবৃক্ষ প্রসৃত পরিমলেনাভিতোঽন্যোপি-বৃক্ষাঃ
শশ্বৎ সৌগন্ধ্য ভাজোঽপ্যতনুতনুভৃতাং তাপমুন্মূলয়ন্তি।
আচার্য্যাল্লব্ধবোধা অপি বিধিবশতঃ সন্নিধৌ সংস্থিতানাং
ত্রেধা তাপং চ পাপং সকরুণ-হৃদয়াঃ স্বোক্তিভিঃ ক্ষালয়ন্তি ॥"

সদ্‌গুরুর নিকট অবস্থান করলেই শিষ্য কৃতার্থ হয়, উপদেশের কথা আর কি বলব। যথার্থ চন্দন বৃক্ষ হতে যে সুগন্ধ নির্গত হয় তার দ্বারা চারি পার্শ্বের অন্য বৃক্ষও সুগন্ধিত হয়, এবং অনেক লোকের ক্লেশ দূর করে। সেইরূপ করুণ-হৃদয় শিষ্যগণ সৌভাগ্য বশতঃ আচার্য হতে জ্ঞান লাভ কোরে নিজের কথার দ্বারা নিকটস্থ লোকদের ত্রিতাপ ও পাপ উন্মূলিত করে।

—(বেদান্তকেশরী, শ্রীশঙ্কর)॥ ৫।১০।৫২

।। মন ভ্রমর ।।

নব সজল জলধর কায়।
শ্যামারূপ হেরিলে, কালীরূপ হেরিলে
প্রাণ গলে যায়॥
কপালে সিঁন্দুর কটিতে ঘুঁঙ্গুঁর
রতন নূপুর পায় (মায়ের)॥
চরণযুগল অতি সুশীতল
প্রফুল্ল কমল প্রায় (আমরি)।
কমলাকান্তের মন নিরন্তর
ভ্রমর হইতে চায় (ও পদে)॥—শ্রীকমলাকান্ত॥ ৬।১০।৫২

।। দেবী স্তুতি ।।

হে দেবি! শরণাগত আর্তিহরা
অখিল জগন্মাত! প্রসীদ প্রসীদ!
হে বিশ্বেশ্বরি! বিশ্ব আজি রক্ষা কর
প্রসন্ন হইয়ে মাগো তুমি,
তুমি যে দেবী, চরাচর অখিল ঈশ্বরী।

জগতের একমাত্র আধার ভূতা তুমিই যে মাতা
মহী ও জলরূপে তুমিই যে ধারয়ত্রী সদা।
হে অলঙ্ঘ্যবীর্যে! মহামায়ে! জগতের যাহা কিছু আছে
তোমারে আশ্রয় করি সব, জনমিয়া বর্দ্ধিত হয়েছে।
তুমি মা অনন্তবীর্যা বিষ্ণুশক্তি মহা!
অখিলবিশ্বের বীজ পরমাসি মায়া!
"সংমোহিত হয়ে আছে তোমাতেই সব
প্রসন্না হইলে হও তুমি মুক্তিরূপা।
সর্ববিদ্যা তোমারই প্রকট ভেদ
তুমিই স্ত্রী সর্বজগতের
একা তুমি পূর্ণ হয়ে আছ বিশ্ব মাঝে
আর স্তুতি কার লাগি?
পর বা অপর স্তব্যা আর কেবা আছে?—(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।২—৫)॥

—০—

"এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জন চিত্ত সমাধান কর রে।
আদি সত্য তিনি কারণ কারণ প্রাণরূপে ব্যপ্ত চরাচরে॥···"

৭।১০।৫২

॥ দেবী স্তুতি ॥

জেনে শুনে মোরা, মোহগর্ত্তে নিপতিত হই!
হে মহামায়ে! এমনি প্রভাব তব, সংসারের স্থিতি ইচ্ছাকারী।
এতে আর বিস্ময় কিবা বল!
তুমি হও বিশ্বপতি শ্রীহরির যোগনিদ্রা
জগন্মোহিনী মহামায়া।
জ্ঞানীদের চিত্তগুলি, সেই দেবী ভগবতী তুমি
বলেতে গ্রহণ করি, মোহেতে নিক্ষেপ সদা তুমি
অনির্বাচ্যা অচিন্ত্য-মহিম-মহামায়ে!

এ ত্রৈলোক্য চরাচর সর্ববিশ্ব স্রষ্টা, মহাভাগে !
প্রসন্ন হও মা যদি কভু, মুক্তিরূপা হওগো বরদে !
তুমি মা বিদ্যা পরমা, সনাতনী মুক্তি-হেতু-ভূতা ।
এ সংসার-বন্ধন-হেতুও তুমি মহাবলে !
তুমিই মা ! সকল ঈশ্বর-ঈশ্বরী নিরূপমা !
—(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৪০—৪৪) ॥ ৮।১০।৫২

।। দেবী স্তুতি ।।

মুক্তি-হেতু অবিচিন্ত্য-মহাব্রতরূপা যিনি হন
সুসংযত তত্ত্বসার মুনিগণ যাঁরে সদা করেন সেবন ।
যাঁহারে আশ্রয় করি মোক্ষকামী যতিগণ সবে
সর্বদোষ বিনির্মুক্ত হয়ে বিমল পবিত্রভূত যবে
তুমি সেই ব্রহ্মবিদ্যা ভগবতী পরমা হি মায়া,
শব্দাত্মিকা সুবিমল ঋগ্‌ যজুঃ মন্ত্রের আশ্রয়,
তথা উদ্গীথ রম্যপদ-পাঠকারী সামনের ।
হে দেবি ! সৃষ্টি রক্ষা হেতু ত্রয়ী-স্বরূপা মা তুমি
পরমার্তি হন্ত্রী হও সর্বজগতের ।
হে মায়ে ! বিদিত-অখিল-শাস্ত্র-সার-মেধারূপা
তুমি দুর্গা দুর্গ-ভবসাগরে অদ্বিতীয়া নৌকা
শ্রীহরির হৃদয়ে কৃতবাসা শ্রীঃ, তুমিই অসঙ্গা ;
তুমিই হয়েছ গৌরী শশী মৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা
মাগো ! জগৎ তারিণী তুমি গঙ্গা ।
ঈষৎ সহাস অমল পরিপূর্ণ চন্দ্র বিম্বানুকারি
কনকোত্তম কান্তি শান্ত রূপ দেখেও, কিরূপে হায় !
ক্রোধ রুষ্ট হয়ে দুষ্ট প্রহারিল মহিষ অসুর তব কায় ?
—(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।৮—১১) ॥ ৯।১০।৫২

॥ দেবী স্তুতি ॥

ভ্রুকুটী করালসম তোমার ও মুখ বিভীষণ
দেখেও জীবিত রোল ক্ষীণ প্রাণ মহিষ কেমনে !
কুপিত অন্তকমুখ হেরি
কবে বল বাঁচে কোন জনে ?
কিন্তু তবুও বেঁচেছে, শুধু সুধাসিক্ত হয়ে,
উদ্যচ্ছশাংক সদৃশ ছবিক্ষরা
তব মুখ পদ্ম হতে মাগো !
জনপদে তারাই সম্মত হয়ে থাকে
তাদেরই ঐশ্বর্যযশঃ অফুরন্ত ধর্মবর্গঘটে
ধন্য তারা হয় দারা সুবিনীত পুত্র ভৃত্য পেয়ে
সুপ্রসন্না যাহাদের প্রতি হও তুমি সদাভ্যুদয়দা ॥
তোমারই প্রসাদে মাগো ধর্মকর্ম লোকে সব করে।
তোমারই প্রসাদে স্বর্গে যায় ;
ইহ, স্বর্গ, মোক্ষ লোকত্রয়ে
একমাত্র তুমি মা ফলদা !
—(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।১২,১৪,১৫) ॥ ১০।১০।৫২

॥ উপহার ॥

অর্জুনে কহেন ভগবান—
"পত্রপুষ্প ফল জল ভক্তি সহকারে
যে দেয় আমারে পার্থ ভক্তি উপহার
সামান্য হলেও তাহা গ্রাহ্য হয় মোর।
যাহা কর, যাহা খাও, হবন করিবে যাহা তুমি
যাহা কর দান, তপস্যা করিবে যেই ভাবে
তাহা মোরে কর সমর্পণ।

শুভাশুভ ফল ত্যাগ হেতু কর্মের বন্ধন মুক্ত হবে
সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা হয়ে অবশেষে আমাকেই পাবে।
সর্বভূতে সম আমি দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই
ভক্তিতে ভজনা করে যেবা, তাতে স্থিত আমি সদা রই
তাহারাও স্থির রহে মোতে।
যদি কোন দুরাচার সর্বত্যাগী হয়ে
আমার ভজনা যদি করে,
সাধুই বলিয়া তারে করিবে গ্রহণ ;
যে হেতু সম্যগ্ ব্যবসিত, স্থিরবুদ্ধি হয়েছে সে জন ॥”
—(শ্রীগীতা, ৯।২৬—৩০) ॥ ১১।১০।৫২

॥ শ্রীহরি শরণাষ্টকম্ ॥

“দুর্বাসনা মম সদা পরিকর্ষয়ন্তি
চিত্তং শরীরমাদি রোগগণাদহন্তি।
সঞ্জীবনঞ্চ পরহস্তগতঞ্চ সদৈব
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৪
পূর্বং কৃতানি দুরিতানি ময়া তু যানি
স্মৃত্বাখিলানি হৃদয়ং পরিকম্পতে মে।
খ্যাতা চ তে পতিত-পাবনতা তু যস্মাৎ
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৫
“নীচোঽপি পাপবলিতোঽপি বিনিন্দিতোঽপি
ব্রূয়াৎ তবাহমিতি যস্তু কিলৈকবারম্।
তস্মৈদদাসি নিজলোকমিতি ব্রতং তে
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥” ৭
—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ॥ ১২।১০।৫২

॥ মুকুন্দমালা ॥

"অপরাধসহস্র সংকুলে পতিতং ভীমভাবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে! কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥ ১৩
মামে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎকুভাবো
মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।
মিথ্যাদৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ
জাতৌ জাতৌ বিষ্ণু ভক্তো ভবেয়ম্ ॥ ১৪
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোমিযদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥ ১৫
যৎকৃতং যৎ করিষ্যামি তৎসর্বংময়া ন কৃতম্।
ত্বয়া কৃতন্তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥" ১৬
—শ্রীরাজকুলশেখর ॥ ১৩।১০।৫২

॥ অবধুতাষ্টকম্ ॥

"ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ।
ন শৈবো ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবো বা
হ্বধূতশ্চিদানন্দরূপো মহেশঃ ॥১
"শ্মশানে গৃহে বা হিরণ্যে তৃণে বা
তনুজে রিপৌ বা হুতাশে জলে বা
স্বকীয়ে পরে বা সমত্বেন বুদ্ধা
বিরাজেঽবধুতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥৪
ন বা তীর্থশৌচং ন বৃত্ত্যর্থধর্মো
ন পাপং ন পুণ্যং ন মৃত্যুর্ন জন্ম।
ন তীর্থং ন যজ্ঞো ন পূজা ন মন্ত্রো
বিরাজেঽবধুতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥৫
চিতাভস্মভূষোজ্জলোদ্ভাসিলক্ষ্মী-
রহিংসা ক্ষমাশান্তি ধামোন্নতশ্রীঃ।

প্রচণ্ডো দয়ালুঃ সদা হৃষ্ট চেতা
বিরাজেৎবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥৬
অভেদেন পশ্যন্ জগৎ সর্বমেতদ্
বনে বা গৃহে বা সমানানুরাগঃ ।
দধানঃ সমস্তং স্বকর্ম প্রপঞ্চং
বিরাজেৎবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥"৭॥ ১৪।১০।৫২

॥ বিজ্ঞান নৌকা ॥

"তপোযজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধি-
বিরক্তো নৃপাদৌ পদে তুচ্ছ বুদ্ধ্যা ।
পরিত্যজ্য সর্বং যদাপ্নোতি তত্ত্বং
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥১
দয়ালুং গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং
সমারাধ্য মত্যা বিচার্য্য স্বরূপম্ ।
যদাপ্নোতি তত্ত্বং নিদিধ্যাস্য বিদ্বান্
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥২
যদানন্দরূপং প্রকাশস্বরূপং
নিরস্ত প্রপঞ্চং পরিচ্ছেদশূন্যম্
অহং ব্রহ্মবৃত্ত্যৈকগম্যং তুরীয়ং
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥৩
যদজ্ঞানতো ভাতি বিশ্বং সমস্তং
বিনষ্টং চ সদ্যো যদাত্মপ্রবোধে ।
মনোবাগতীতং বিশুদ্ধং বিমুক্তং
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥"৪—শ্রীশঙ্কর ॥

১৫।১০।৫২

।। দেবী স্তুতি ।।

"বিষ্ণুমায়া নামে খ্যাতা যিনি সর্বভূতে
নমস্কার ! নমস্কার ! নমস্কার তাঁরে !
করি পুনঃ নমস্কার !
চেতনাখ্যা রূপে খ্যাতা যিনি সর্বভূতে
নমস্কার ! নমস্কার ! নমস্কার তাঁরে !
করি পুনঃ নমস্কার !
যে দেবী সর্বভূতে রন বুদ্ধি রূপে
নমস্কার ! নমস্কার ! নমস্কার তাঁরে !
করি পুনঃ নমস্কার !
যে দেবী সর্বভূতে ধরেন নিদ্রারূপ
নমস্কার ! নমস্কার ! নমস্কার তাঁরে !
করি পুনঃ নমস্কার !
যে দেবী সর্বভূতে ধরেন ক্ষুধারূপ
নমস্কার ! নমস্কার ! নমস্কার তাঁরে !
করি পুনঃ নমস্কার !"

—(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।১২—১৬) ॥ ১৬।১০।৫২

।। আনন্দ লহরী ।।

"ঘৃতক্ষীরদ্রাক্ষামধুরিমা কৈরপি পদৈ-
বিশিষ্যানাখ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্র বিষয়ঃ।
তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্‌মাত্রবিষয়ং
কথঙ্কারং ব্রূমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে ॥ ২
মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কজ্জল কলা
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা।
স্ফুরৎ কাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী
ভজামস্বাং গৌরীং নগপতিকিশোরীমবিরতাম্ ॥

দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি

বিরজন্মন্দারদ্রুমকুসুমহারস্তনতটী
নদদ্বীণানাদ শ্রবণবিলসৎকুণ্ডলগুণা।
নতাঙ্গী মাতঙ্গী রুচির গতিভঙ্গী ভগবতী
সতী শম্ভোরম্ভোরুহচটুলচক্ষুর্বিজয়তে ॥
নবীনার্কভ্রাজন্মণিকনকভূষা পরিকরৈ-
র্বৃতাঙ্গী সারঙ্গী রুচির নয়নাঙ্গী কৃত শিবা।
তড়িৎ পীতা পীতাম্বর ললিত মঞ্জরী সুভগা
মমাঽপর্ণা পূর্ণা নিরবধি সুখৈরস্তুসুমুখী ॥"—শ্রীশঙ্কর ॥

১৭।১০।৫২

।। মায়া ও মায়ী ।।

"মায়াই প্রকৃতি, মহেশ্বর মায়াবী। এঁদের পরস্পর সম্বন্ধে সম্বন্ধিত কার্য কারণ সংঘাতে এই সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত।

"যিনি এক হয়েও সকলের উৎপত্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা, যাঁতে সর্ববস্তুই লীন হয়, সেই ঈশান, বরদ, পূজ্য দেবের সাক্ষাৎকারের দ্বারা লোকে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।

"যিনি দেবতাদেরও উৎপত্তি ও অভ্যুদয়ের হেতু, জগতের স্বামী এবং সর্বজ্ঞ, যিনি সর্বপ্রথম নিজ হোতে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি দর্শন করেছেন, সেই রুদ্র মহর্ষি আমাদের বুদ্ধিকে শুভ কর্মে নিযুক্ত করুন।

"যিনি দেবতাদিগের অধীশ্বর, যাঁকে আশ্রয় কোরে লোক সকল বর্তমান, যিনি দ্বিপদ চতুষ্পদের শাসক, সেই ক (সুখস্বরূপ) দেবতাকে আমরা হবির্বিধান করি।" —(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৪।১১—১৩) ॥ ১৮।১০।৫২

।। কালী—'মা' ।।

"নিঃশেষে নিভিছে তারাদল মেঘ এসে আবরিছে মেঘ!
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার গরজিছে ঘূর্ণ্য বায়ু বেগ!

* * *

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায় মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।”

(‘বীরবাণী’—শ্রীবিবেকানন্দ)

—০—

রণে নেমেছে রে কার বামা ওকে দেখতে যাবি
(তোরা) দেখতে যাবি, দেখতে যাবি রূপ দেখিলে অবাক হবি ॥
(মায়ের) মাথার মুকুট গগন ঠেকে গলায় নর শিরহার
পদভর সইতে নারে ধরা হলো ভার ॥
(মায়ের) রূপত নয় আ'মোরে যাই, কাজল জিনেও কাল
(আবার) কী অদ্ভুত মূর্তি ধরে ভুবন কোরেছে আলো ॥

১৯।১০।৫২

।। ইচ্ছাময়ী ।।

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি ॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারেও দাও মা ব্রহ্মপদ কারেও কর অধোগামী ॥
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি ঘর তুমি ঘরনী।
আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি ॥

—রাজা নবচন্দ্র ॥

—০—

“তোমা লাগি নাথ, জাগি জাগি হে—
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।……”—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥

২০।১০।৫২

।। “পদ-তরণী” ।।

দেহি পদ তরণী, জননি।
দিন দিন যায় দিন, আসে মাগো সেই দিন
দিনে রাতে তাই তোরে ডাকি দীনতারিণি ॥

জানি না কি বলে আমি ডাকিব গো মা তোমায়
শিখায়েছ মা বলিতে মা বলিয়ে ডাকি তাই,
কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়
চরণে শরণ তাই লয়েছি নিস্তারিণি ॥
সংসার প্রান্তরে শ্মশানবাহিনী কূলে
এ দীন পথিক বসে বিষয় পাদপ মূলে।
আসে ঐ কাল ফণী দংশিতে মোরে জননি
ত্রাসিত পরাণে তাই ডাকি মা ত্রিনয়নি ॥
মায়া মায়াবিনী মোরে কুপথেতে লয়ে যায়,
দেখাও সুপথ মোরে সদা জ্বলি সে জ্বালায়,
যায় যায় প্রাণ যায়, তাই ডাকি মা তোমায়
অকূলে কর মা কোলে ওমা কূলদায়িণি ॥

—০—

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যাথা তোমারে সেথা নিবিড় কোরে ধরিব হে ॥"
—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥ ২১।১০।৫২

॥ শ্রীদুর্গাপরাধক্ষমাপণ ॥

"নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ
কিং ব্রহ্মচিন্তনপরৈর্নকৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব ॥ ১৪
আপৎসুমগ্নং স্মরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ
ক্ষুধাতৃষ্ণার্ত্তা জননীং স্মরন্তি ॥ ১৫

জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধ-শতৈঃ পরাবৃতং নহি মাতা
সমুপেক্ষতে সুতম্॥ ১৭
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা নহি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু॥"

—শ্রীশঙ্কর॥ ২২।১০।৫২

॥ "সর্বভূতময়ং হরিম্" ॥

প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলেছিলেন—

"ন মন্ত্রাদিকৃতস্তাত ন চ নৈসর্গিকো মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতো হৃদি॥
অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগমস্তাত হেত্বাভাবান্ন বিদ্যতে॥
কর্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।
তদ্বীজং জন্ম ফলতি প্রভূতং তস্য চাশুভম্॥
"সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা।
চিন্তয়ন্ সর্বভূতস্থমাত্মন্যপি চ কেশবম্॥
শারীরং মানসং বাগজং দৈবং ভূত ভবং তথা।
সর্বত্র সমচিত্তস্য তস্য মে জায়তে কুতঃ॥
এবং সর্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্বভূতময়ং হরিম্॥

—(শ্রীবিষ্ণু পুরাণে ১।১৯।৪—৯)॥ ২৩।১০।৫২

॥ শিবপ্রাতঃ স্মরণ ॥

"প্রাতঃস্মরামি ভবভীতি হরং সুরেশং
গঙ্গাধরং বৃষভবাহনমম্বিকেশম্।
খট্বাঙ্গ শূলবরদাভয়হস্তমীশং
সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥১

প্রাতর্নমামি গিরিশং গিরিজার্দ্ধদেহং
সর্গস্থিতিপ্রলয়কারণমাদিদেবম্।
বিশ্বেশ্বরং বিজিতবিশ্বমনোভিরামং
সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥২
প্রাতর্ভজামি শিবমেকমনন্তমাদ্যং
বেদান্তবেদ্যমনঘং পুরুষং মহান্তম্।
নামাদি ভেদ রহিতং যড়ভাবশূন্যং
সংসাররোগ হরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥" ২৪।১০।৫২

॥ শ্রেষ্ঠ যোগী ॥

"শ্রূয়তাং ধর্ম সর্বস্বং
শ্রুত্বাচৈবাবধার্য্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি
পরেষাং ন সমাচরেৎ॥"—(বিষ্ণু ধর্মোত্তর ২৫৫।৪৪)

সর্ব ধর্মের সার শোন, শুনে অবধারণ কর—যে কার্য নিজের প্রতিকূল, তা কখনও অপরের প্রতি আচরণ করা উচিত নয়।

"আত্মৌপম্যেন সর্বত্র
সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং
স যোগী পরমো মতঃ॥"—শ্রীগীতা ৬।৩২

যে যোগী নিজের সুখদুঃখের মত অপরেরও সুখ দুঃখ সমভাব দেখেন, আমার মতে সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ। ২৫।১০।৫২

॥ যোগী ॥

প্রেম গিরি কন্দরে, যোগী হয়ে রহিব।
আনন্দ নির্ঝর পাশে যোগধ্যানে থাকিব॥

তত্ত্বফল আহরিয়া জ্ঞানক্ষুধা নিবারিয়ে।
বৈরাগ্যকুসুম দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম পূজিব॥
মিটাতে বিরহতৃষ্ণা কূপ জলে আর যাব না।
হৃদয় করঙ্গ ভরে শান্তিবারি তুলিব॥
কভু গাব শৃঙ্গপরে, পদামৃত পান কোরে।
হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইব॥

[১৮৮৪ খৃঃব্দেঃ ২৩শে মার্চ্চ ঠাকুরদা নামে এক ২৭।২৮ বৎসরের যুবক শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট এই গানটী গান।] ২৬।১০।৫২

॥ কালী ব্রহ্ম ॥

এবার আমি ভাল ভেবেছি
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।
নূপুরে মিশাযে তাল সেই তালের এক গীত শিখেছি
তাধ্রিম তাধ্রিম বাজছে তাল নিমিরে ওস্তাদ রেখেছি।
ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।
সোহাগা গন্ধক দিয়ে খাসা রং চড়ায়েছি
মণি-মন্দির মেজে লব অক্ষদুটী কোরে কুচি।
প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

—শ্রীরামপ্রসাদ॥

[১৮৮৫, ২২শে ফেবরুয়ারী শ্রীশ্রীপ্রভু গিরীশের গায়ে হাত দিয়ে গেয়ে-ছিলেন।] ২৭।১০।৫২

॥ "শ্যামা যদি ফিরে চায়" ॥

শ্যামা ধন কি সবাই পায় রে
কালী ধন কি সবাই পায়
অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥—শ্রীকমলাকান্ত॥

নরেন্দ্রনাথ প্রভুকে গান শোনাচ্ছেন (২৫।২।৮৫)—
"চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দ লহরী
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।" ইত্যাদি॥ ২৮।১০।৫২

॥ নরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা ॥

নরেন্দ্রনাথ রাখালকে লিখছেন (২০।১১।৯৯)—"তোমাদের আশীর্বাদ করছি। মা কালীর এই পবিত্র দিনে, আজই রাত্রে যেন মা তোমাদের হৃদয়ে নৃত্য করেন, তোমাদের বাহুতে যেন অনন্ত শক্তির প্রবাহ আসে। জয় কালী! জয় মা কালী! মা নিশ্চয়ই আবির্ভূত হবেন এবং সর্বশক্তি সমন্বিত হয়ে বিশ্বজয় আমাদের নিকট উপস্থিত করবেন। মা আসছেন! ভয় কি? কার ভয়? জয় কালী! তোমাদের প্রত্যেকের পদবিক্ষেপে ধরণী কেঁপে উঠবে। জয় মা কালী! আগাও ভাই সব, এগিয়ে চল! জয় গুরু! জয় গুরু! জয় মা! কালী! কালী! কালী! ব্যাধি, শোক, বিপদ, দুর্বলতা —সব তোমাদের ছেড়ে পালিয়েছে। তোমাদের সামনে কেবল জয়! সৌভাগ্য! আর সম্পদ! ভয় নেই! কোন ভয় নেই! দুর্বিপাকের ভীতি মুখ অন্তর্ধান হচ্ছে, ভয় নেই! জয় মা কালী! জয় মা কালী!"

২৯।১০।৫২

॥ "যেমন ভাব তেমনি লাভ" ॥

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেম্নি লাভ মূল সে প্রত্যয়।
কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময় ॥
কালী পদ সুধা হ্রদে যদি চিত্ত ডুবে রয়।
যাগ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয় ॥—শ্রীরামপ্রসাদ ॥

—০—

"আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ ধূলার ধূলায় ধূসর হব ॥……"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥

৩০।১০।৫২

॥ "মন গরীবের কি দোষ আছে" ॥

(ওমা) মন গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচে ॥
তুমি কর্ম ধর্মাধর্ম মর্মকথা বুঝা গেছে,
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল ফল ফলাচ্ছ কলা গাছে ॥
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে,
ওমা তুমি দুঃখ, তুমি সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে কর্মসূত্র সে সূতার কাটনা কেটেছে
ওমা মায়া সূত্রে বেঁধে জীব ক্ষ্যাপা ক্ষ্যেপি খেল খেলিছে ॥

—শ্রীরামপ্রসাদ ॥ ৩১।১০।৫২

॥ "পুরুষ কি নারী" ॥

একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে।
তোমার ভুবন ভরা রূপটী একবার দেখে লই মা নয়নে।
তুমি অন্নপূর্ণা মা, শ্মশানে শ্যামা
কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা
ধর বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণুরূপ সৃজন লয় পালনে।

তুমি পুরুষ কি নারী, আমি বুঝিতে নারি !
স্বয়ং না বুঝালে তা কি বুঝিতে পারি,
তুমি আধারাধা আধাকৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে ॥
তুমি জগতের মাতা যোগিজনানুগতা
অনুগতজনে কৃপাকল্পলতা ;
তোমায় মা বলে ডাকিলে নাকি কোলে লও ভক্তজনে ॥
দুঃখদৈন্যহারিণী, চৈতন্যকারিণী
অন্য কিছু চাই না বিনা চরণ দুখানি.
আমি প্রেমসরজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে ॥
পরিব্রাজক ভিখারী সাধ মনেতে ভারি
মধু হাসিমাখা মার মুখখানি হেরি
বসে মায়ের কোলে মা মা বলে
মাতিব যোগ ধ্যানে ॥—স্বামী কৃষ্ণানন্দ ॥

—•—

"আমার মাথা নত কোরে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥… …"
—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ॥ ১।১।৫২

॥ "মাস্তুলের পাখী" ॥

"পাখী তুই ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে
(ওরে) বৃথা ওড়া নড়া চড়া কূল পাবিনে অকূলে ॥
ও তুই যেদিক যাবি দেখতে পাবি জলে জলাকার।
(ও তোর) নাহি অন্ত দিগ্‌দিগন্ত অপার পাথার ;
(ও তোর) ধরবে ডানা ঘোর যাতনা পড়বি মহা মুস্কিলে ॥
(ও সে) অনন্ত অনন্তভাবে অন্তকে করে,
প্রধান গ্রন্থ বেদ বেদান্ত গেল চুপ মেরে ;
পুরাণেরা দিশেহারা সার কৈল নাম শেষ কালে !

এদিকে অবিদ্যামায়া পিশাচী করাল
পাতিয়াছে মনমোহিনী রূপরসাদির জাল।
পাখী তুই পড়বি ফাঁদে মরবি কেঁদে
প্রাণ হারাবি বেহালে ;
(ঐ মাস্তুল ছেড়ে চলে এলে) ॥—শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন ॥

২।১১।৫২

॥ আত্মসমর্পণ ॥

হে প্রভু! প্রহ্লাদ যেমন আত্মসমর্পণ করেছিল, তেমনি কোরে আমি তোমার চরণ তলে নিজেকে ফেলে দিই। তোমার শক্তি সমুদ্রে আমি নিজেকে আজ ভাসিয়ে দিচ্ছি—তারপর যা কর তুমি। আমার ইচ্ছাকে বিদায় দিলাম, আমার দেহ মন আত্মাকে যেমন চালাবে তেমনি চলুক, আমি কেবল তোমার অচিন্তনীয়া খেলা দেখে আনন্দ করি। আমার নিজস্ব কোন শক্তি নেই, কোথায় যেতে চাই তাও জানি না, চেষ্টা আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে, কেবল এইটুকু জানি সর্বশক্তি সচ্চিদানন্দ সাগরে আমি ভাসছি ; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভো! আমি জানি তোমার ইঙ্গিত ছাড়া গাছের শুষ্ক পত্রটীও পড়ে না, তখন আমার 'আমি' আর কি করবে! আমার আমিটীও তোমার ক্রীড়নক ছাড়া আর কি? ৩।১১।৫২

॥ সংগ্রাম ॥

প্রভুর বাণী—বৎস! আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হতে গেলে সামাজিক জীবনের মতই সংগ্রাম চাই। কৃপণের ঐশ্বর্য সংগ্রহ করতে যে অধ্যবসায় ও সংযম দরকার, যোদ্ধাকে অগ্রসর হতে গেলে যে সাহসের দরকার, সেইরূপ ধৈর্য ও সাহস দরকার দৈবী-সম্পদের জন্য। সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করা, মিথ্যাকে নির্মমভাবে ত্যাগ, এ অসীম সাহসের দরকার। দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করা চাই, ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা চিন্তা করতে গেলেই আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হতে হবে। জীবনে মিথ্যার সঙ্গে কোন রকম আপোষ থাকবে না, সত্য পালনের জন্য—এই হলো

রামচন্দ্র, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও রামকৃষ্ণের পথ। একটা ক্ষুদ্র জীবন তোমায় ধরে রাখতে পারে না, সামনে তোমার অনন্ত জীবন পড়ে আছে সত্য সন্ধানের জন্য। সত্য অভিজ্ঞানের জন্য নাহয় তুচ্ছ একটা জীবন যাক, তাতে ক্ষতি কি! ৪।১১।৫২

।। সান্নিধ্য ।।

প্রভু বলছেন, "বৎস! আমি তোমার সঙ্গেই আছি, যেখানেই যাও তার পূর্বেই আমি সেখানে তোমার অপেক্ষায় থাকি। আমি তো তোমারই জন্য। আমার অনুভূতি সে তো তোমারই সম্পত্তি। তুমি আমার হৃদয়-রত্ন, চক্ষের-মণি। সেই অনাম, অরূপ অব্যয়ে আমরা একই বৎস! আমি তোমার অবিনাশী স্বরূপ এত ভাল কোরে জানি যে তোমাকে বিপদসংকুল সংসারারণ্যে ফেলে দিতে আমার একটুও ভয় হয় না। আমি তোমার শক্তি বাড়াই, আবার তোমার শক্তি পরীক্ষা করি, কিন্তু আমি তোমার সদারক্ষী, পাশেই দাঁড়িয়ে। জান কি বৎস! তুমি ভুল কর আমার সমক্ষেই, তুমি পুণ্য কর তাও আমার সামনে। আমি সর্বসাক্ষী। আমি তোমার মনের এতটুকুও ফেঁসো রাখব না, যতক্ষণ না তুমি অবাধে সর্ব সূক্ষ্মতম চিন্তাপথে অবলীলাক্রমে ভ্রমণ না করতে পার।" ৫।১১।৫২

।। নিকটে অন্তরে বাহিরে ।।

অন্তর গুরু শিষ্যকে ডেকে বল্লেন, "বৎস! তোমার শান্তি হোক। ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তোমার ভয়ের কারণ নেই। প্রেমতত্ত্ব বিশ্বের সর্ববস্তু ভেদ কোরে তার সত্তাকে আত্মস্থ করে। সে প্রেমতত্ত্ব আর কিছু নয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। তিনি তোমার নিকটে, অন্তরে, বাহিরে, তাঁতে তুমি ওতপ্রোত হয়ে আছ। অরূপ বস্তু কি দেশের দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে? তিনি যে সকলকে অন্তরে ধারণ কোরে আছেন, আধেয় কি আধারকে অতিক্রম করতে পারে? তোমার ভাল মন্দ সব তাঁতে ফেলে দাও, কিছু গোপন রেখ না? এই সর্বস্ব ত্যাগই তোমার আত্মার সর্বোপাধি মুক্ত কোরে তাকে নির্মল বিশুদ্ধ স্বভাব করবে। তখনই তুমি সেই অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করতে পারবে, যা জীবন হতেও বৃহৎ এবং মৃত্যু হতেও বলবান।" ৬।১১।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

প্রভু হে! সংসার বন্ধন বড় ভীষণ। মায়াজাল কি কোরে ছিন্ন করি প্রভু! জীবনবেদ শিক্ষা দেয়, সত্য জীবন যাপন করতে গেলে জীবনকে পেরিয়ে যেতে হবে, মৃত্যুকে পরাভূত করতে হবে। এই হলো বর্তমানের প্রধান কর্তব্য। এ জয় আসবে কি কোরে? দৈহিক ও মানসিক পশুবৃত্তিগুলিকে নিরোধের দ্বারা; এরাইতো আমাদের মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। হে প্রভু! আমাকে সদা জাগ্রত রাখ, তুমি আমার অভিভাবক থাকতে যেন 'আমার জাগা ঘরে না চুরি যায়'। প্রলোভনের মৃদু তরঙ্গও যেন আমার বিবেকের মানদণ্ডে ধরা পড়ে। হে মন! সর্বদা হিংসাদি রিপুর প্রতিপক্ষ ভাবনা কর। প্রলোভন যখন আসে, তখন এত তাড়াতাড়ি যে হুসিয়ার হওয়ারও সময় থাকে না। "হে রঘুবীর! তুমি আমার হাল ধর।" ৭।১১।৫২

॥ অভিমান ॥

"Narcissism" or "Autoerotism".

"ন মান্নুঙ্গী ন মান্নুঙ্গী ন মান্নুঙ্গী
মৈ তো উন্‌কীকে মানাবে বিনা।
জাওজি জাওজি সখি বে তো
আপনে রসকে রসিয়া;
না মান্নুঙ্গী ন মান্নুঙ্গী ন মান্নুঙ্গী
মৈ তো উন্‌কীকো মানাবে বিনা।"—রত্ন ঝঙ্কার॥
"আমি মানব না, মানব না, তারে মানব না
যদি সে না মানায় মোরে।
যাও, যাও জী! সখি, (তার কথা আর কি বুঝাবে?)
সে যে আপন রসে রসিক হয়ে
ডুবে আছে আপন রসে
(তাকায় নাকো কারুর দিকে
আপন ভোলা আত্মসুখে)

তারে মানব না, মানব না, আমি মানব না
যদি সে না নিজে এসে মানায় মোরে।" ৮।১১।৫২

॥ গভীর নীরবতা ॥

ধ্যানলোকে গুরু বলছেন, "বৎস! প্রেম হলো গভীর নীরবতা—সকল বিবাদ ও সমালোচনার অবসান। যখন সসীমতার সকল গোল মিটে গিয়ে পরমানন্দের মিলন হলো, সে অবস্থা হলো মহামৌন, কেবল বোধে বোধ থাকে—মূকাস্বাদনবৎ। বাইরের সকল গোলযোগ মিটিয়ে ফেল, দেখবে আমাতে তুমি, তোমাতে আমি। আমি যেখানে থাকি, তুমিও সেখানে থাক; আমি যেখানে যাই, তুমিও আমার পার্ষদরূপে সেখানে চল, আমিও যা হই, তুমিও তাই হয়ে যাও; আমি যে "কুমুরিয়া পোকা", ভক্তেতে আমি আমার রঙ লাগাই, ভক্তের মুখে লোকে আমার ছবি দেখে। হে বৎস! পবিত্র হও, আমি যে পবিত্র মন্দিরে বাস করি। মন্দিরে কোলাহল তুলো না, মন্দিরের গভীর হতে গভীরতম প্রদেশেই গুরু শিষ্যের মিলন ভূমি।" ৯।১১।৫২

॥ ওঠো, জাগো ॥

হে মন! তুমি সত্য পথে চল না, তুমি নিজেকে নিজে অপবিত্র কর। তুমি দুর্বল, চারি পাশে তোমার শত্রু। কিন্তু তোমার গুরু—শুদ্ধ-সত্ত্ব ও পবিত্র। তাঁর শক্তি তোমার দুর্বলতাকে জয় করার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করবে। তাঁতে আত্মসমর্পণ এবং বিশ্বাসের দ্বারা তুমি ইন্দ্রিয়বিজয়ীর সম্মান লাভ করবে, তিনি কত তোমায় ভালবাসেন। জীবনান্তে তুমি তোমার ধ্বংস কল্পনা করছ, কিন্তু তুমি কি জান না, যে তিনি তাঁর নিজের কঠোর তপস্যা দ্বারা ভক্তদের মুক্তি ক্রয় করেছেন। ভাব! কি দুর্বিষহ গলরোগ! তিনি বলছেন, "একি যেসে সাপে ধরেছে?—তিন ডাকে শেষ, নইলে বাড়ী গিয়ে মরে থাকবে।" সংসারের সাধ্য কি যে প্রভুর ভক্তকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। হে মন! ওঠো, জাগো, তাঁর কীর্তনে যোগ দাও, তাঁর প্রেম অনুভব কর, তাঁর ক্ষমার মহিমা দর্শন কর। ১০।১১।৫২

।। গণত্ব ।।

হে প্রভু! চারিপাশে অনন্ত কৃপার প্রবাহ তোমা থেকে ছুটছে। কিন্তু তবুও তুমি ভালবাস সোত্তর জনকে, একুত্রিশ জনকে, চৌদ্দ জনকে, বার জনকে, সাত জনকে, তিন জনকে, এক জনকে। পুনঃপুনঃ তুমি প্রকাশ করেছ, তুমি নরেন, রাখাল ও বাবুরামকে ভালবাস, তুমি নরেনকে সব চাইতে ভালবাস। কিন্তু যে কৃপাপ্রার্থী হয়ে তোমার দিকে তাকায়, তাকেই তো তুমি কৃপা কর; তোমার কৃপাপ্রার্থী চিরকালই তো কৃতার্থ হয়—নাই বা হলো তারা সত্তর জনের মধ্যে, তাঁর একজন নগণ্য সেবক হওয়া, একি কম সৌভাগ্যের কথা! তাঁর কৃপোজ্জ্বল তারকাটী কী সুন্দর! তা সে খুব বড় না হতে পারে। তাঁর সেবক! একি চালাকি ব্যাপার! হয়ত সাতজনের মধ্যে না হতে পারে। তারাই ধন্য যাদের দীক্ষায় নবজন্ম লাভ হয়েছে; তারা ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে একদিন তারা তাঁরই মত হবে, কারণ তারা যে শ্রীরামকৃষ্ণের গণত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ১১।১১।৫২

।। গায়ত্রি ।।

হে জগন্মাতঃ গায়ত্রি! তোমাকে নমস্কার। ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-লোক, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান তোমার অঙ্গীভূত। ব্রহ্মদেবের ধ্যানরূপ যে ভর্গ-আলোক অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সামরূপ ত্রৈবিদ্যা তোমার অপর অঙ্গ। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে যিনি ক্রমবিকশিত করেন সেই প্রাণরূপীও তুমি। এই লোকত্রয়, বিদ্যাত্রয় এবং পঞ্চ প্রাণের সার বা রস হলেন তোমার অপর রূপ, বরণীয় সবিতা। সূর্য হতে প্রাণ, সূর্যে লোক প্রতিষ্ঠিত, সূর্য হতেই ঋষি বিদ্যা লাভ করেন, সূর্য হতেই কালের জ্ঞান, সূর্য হতেই অবস্থাত্রয়। এই সূর্যের অন্তর্বর্তী পুরুষ তুরীয় সাক্ষী,—হে মাতঃ গায়ত্রি! তাও তোমারই রূপ। এই সূর্য প্রতিষ্ঠিত চক্ষুতে। চক্ষুই সত্য দর্শনের প্রতীক। শ্রবণ অপেক্ষা দর্শনই গ্রহণীয়। পরো রজঃ = রজোগুণের পারে দর্শত পদই তোমার শ্রেষ্ঠ পদ। জগতের আপ = শুক্রবীজ, জ্যোতিঃ = জ্ঞান, রস = আনন্দ, অমৃত = অমরত্ব, ব্রহ্ম = বেদ, ভূঃ ভুবঃ সুবঃ = ত্রিলোক সবই ওঁ-কাররূপিনী তোমার শিরঃ।—ইতি বৃহদারণ্যকে ৫।১৪॥

১২।১১।৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে ব্রহ্মণ্‌ ! তুমি অব্যয়, অনন্ত, নিস্তল, নিঃসীম ! তুমি মহতো মহীয়ান্‌, গভীর হতেও গভীরতম। তুমি সত্যের আলো ! প্রেমের উৎস ! আনন্দধাম ! এই জগৎ বৈচিত্র্য ও যা কিছু সৌন্দর্য তোমারই অফুরন্ত চিন্তার মোহনীয় কাব্য—চারিপাশে দেখি, তোমার গোপন মাধুর্য উপছে পড়ছে। হে কবি ! হে মহান ! হে আদি ! হে অনাদি ! তোমার চিন্তার ছন্দেছন্দে চন্দ্র সূর্য তারা ওঠে, আবার অস্তমিত হয়। কৃষ্ণনভের শুভ্র তারকারাজি তোমার কাব্যের বর্ণরেখা, তোমার সংগীতের অর্থ তারা বহন করে, পর্দার পর পর্দার মত তোমার কণ্ঠ-মাধুরীর তারা দ্যোতক। ষড়্‌ঋতু প্রতিবর্ষে তোমারই অপূর্ব শিল্প, তোমারই আজ্ঞাবহ কালের ইঙ্গিতেইঙ্গিতে নিজ গর্ভ হতে পরিস্ফুট করে। ঐ পুষ্প তোমার সৌন্দর্য, জল তোমার স্বচ্ছতা, সমুদ্র তোমার গাম্ভীর্য, বজ্র তোমার আদেশ। হে প্রভু ! ১৩।১১।৫২

।। প্রার্থনা ।।

হে পরমহংস ! মূর্খ মন কী করে তোমায় বুঝবে, যুগান্তেও তোমার ধ্যানের সীমা হবে না। লক্ষকোটি চন্দ্র তারা অবাক হয়ে আছে তোমার কাছে মাথা নত কোরে। হে সরল ! এই জটিল সৃষ্টির তুমিই মূল। সকল নরনারীকে তুমিই সৃষ্টির আনন্দে বিহ্বল কর, আবার ধ্বংসের খেলায় ভীতিগ্রস্ত কর ; দেবতা ও সিদ্ধপুরুষেরা তোমার উপাসক, তোমার মহিমা গান করেন ; তুমি আমাদের জ্ঞান, ভক্তি, আশ্রয় ও শান্তি দান কর। এখানে আমার ভয় দূর হোক, শুভাশুভ কর্মের অবসান হোক, আমার গর্ব, জাতি, কুল, ধ্বংস হোক। এই তো আমি আমাকে তোমার পাদপদ্মে নিবেদন করছি, হে রামকৃষ্ণ ! আমাকে দয়া কোরে গ্রহণ কর প্রভু ! ১৪।১১।৫২

।। বৈরাগ্যের প্রথম উন্মেষ ।।

রামতারণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে গিরীশ ঘোষের এই গানটী শোনালেন—

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই ?
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই ?

ফিরে ফিরে আসি কত হাসি কাঁদি
কোথা যায় সদা ভাবি গো তাই !
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন !
এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর
অধীর অধীর যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই !
জানি না কেবা এসেছি কোথায়
কেন বা এসেছি, কেবা নিয়ে যায়।
যাই ভেসে ভেসে, কত শত দেশে
চারিদিকে গোল, ওঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়
এই আছে আর তখনই নাই !
কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল, কে জানে কেমন, কি খেলা হলো ;—
প্রবাহের বারি রোধিতে কি পারি
যাই—যাই—কোথা ?—কূল কি নাই ?
কর হে চেতন,—কে আছ চেতন
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?—
যে আছ চেতন, ঘুমাইও না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার
কর তমোনাশ হও হে প্রকাশ,—
তোমা বিনা আর নাহিকো উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই।" ১৫।১১।৫২

।। অন্তর ধ্বনি ।।

"ওঁ তোমার আত্মা আমিই আমিই !
ওঁ তোমার শক্তি অনন্ত অনন্ত !
ওঁ ওঠো জাগো সত্য লাভ কর !
ওঁ তুমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম ! ওঁ ওঁ ওঁ।। ১৬।১১।৫২

।। বিরহ ।।

ঠাকুর বলছেন, 'আর শরীর থাকবে না।' নরেন শুনে সুর কোরে বলছেন,—

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেখা
ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা।"—

প্রভু বল্লেন, 'আরে, ও সব ভক্তির প্রথম স্তর।' তখন নরেন গাইলেন—

"কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান!
ব্রজকি কিশোর সই কাঁহা গেল ভাগই
ব্রজজন টুটাল পরাণ॥
মিলি সব নাগরী ভুলি গেই মাধব
রূপবিহীন গোপ কুমারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক
হেন বঁধু রূপ কি ভিখারী॥
আগে নাহি বুঝিনু রূপ হেরি ভুলিনু
হৃদি কইনু চরণ যুগল।
যমুনা সলিলে সই অব তনু ডারব
আন সখি ভখিব গরল॥
(কিবা) কানন বল্লরী গলবেড়ি বাঁধব
নবীন তমালে দিব ফাঁস
নহে শ্যাম শ্যাম, শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপই
এ ছার তনু করব বিনাশ॥" ১৭।১১।৫২

।। "শ্যাম চন্দন মাখি শীতল হব" ।।

নরেন গাইলেন, "কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান"—গান শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও রাখাল কাঁদছেন। নরেন মাতোয়ারা হয়ে আবার গাইছেন—

"তুমি আমার, আমার বঁধু ; কি বলি—
(কি বলি তোমায় বলি নাথ)।
(কি জানি, কি বলি আমি অভাগিনী নারী জাতি)।
তুমি হাতকি দর্পণ মাথকি ফুল
(তোমায় ফুল কোরে কেশে পরব বঁধু)।
(তোমায় কবরীর সনে লুকায়ে লুকায়ে রাখব বঁধু)
(শ্যামফুল পরিলে কেউ নখতে নারবে)।
তুমি নয়নের অঞ্জন, বয়ানের তাম্বুল
(তোমায় শ্যাম অঞ্জন কোরে এঁকে পরব বঁধু)
(শ্যাম অঞ্জন পরেছি বলে কেউ নখতে নারবে)॥
তুমি অঙ্গকি মৃগমদ গীমকি হার
(শ্যাম চন্দন মাখি শীতল হব বঁধু)
(তোমার হার কণ্ঠে পরব বঁধু)।
তুমি দেহকি সর্বস্ব গেহকি সার॥
পাখীকো পাখ, মীনকো পানি।
তেমতি হাম বঁধু তুয়া মানি॥" ১৮।১১।৫২

॥ প্রার্থনা ॥

হে প্রভু! আমাকে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে তোমার কৃপার আলোকে নিয়ে এসেছো। একটা ধূলিকণাকে তুমি এতটা বিকশিত করলে, আমি যে আমার ভেতর ও অন্তর ঐশ্বর্যের আর সীমা দেখতে পাই না! হে প্রভু! অফুরন্ত মণিরত্নে যে আমার চিত্ত-ভাণ্ডার পূর্ণ কোরে রেখেছ। প্রভু হে! কোন্ নিঃসীম, নিভৃত গম্ভীরতা হতে তোমার সঙ্গীত ভেসে এসে আমাকে পাগল কোরে তোলে। কোথা হতে আসে? এমন তো কখন শুনিনি। আমার কৃতজ্ঞতার ধ্বনিও সেথায় রূঢ় হয়ে ওঠে, আমি লজ্জায় অধোবদন হই। তোমার দানে, তোমার সৌন্দর্যে যে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়ে উপছে পড়ছে। আমি কি এসব বৃথা নষ্ট করছি প্রভু! আমি কি তোমার এই বিশুদ্ধ প্রেম এবং আশীর্বাদের উপযুক্ত! ১৯।১১।৫২

।। গড়ো গড়ো প্রভু ।।

গড়ো গড়ো প্রভু! চিরদিন গড়ো, আমাকে পরিপূর্ণ কোরে তোল হে কুম্ভকার! কোন খুঁত রেখ না। অনন্ত তোমার ক্ষমা, অনন্ত তোমার করুণা, আমার পাত্রটী পূর্ণ করে দাও প্রভু! কী অদ্ভুত তোমার ভালবাসা! কোথায় মায়ের স্নেহধারা, তার সঙ্গে কি তোমার স্নেহের তুলনা করা চলে প্রভু! আর সব কা কথা? তোমার নির্মল নিঃশ্রেয়সকরী প্রেমের সহিত তাদের উল্লেখ করা চলে কি? কী অদ্ভুত! অশরীরীকে কি এরূপ ভাবে স্পর্শ করা যায়! কেউ তো কখন ভাবে নি, কী স্নেহের শাসন। হে কুম্ভকার! যতদিন না তোমার মনের মত হয়, ততদিন আমায় একবার ভাঙ, আবার নূতন কোরে গড়। চিত্তে আমার অনুরাগের আগুন জ্বেলে দাও, গড়নে আমার তোমার আদর্শ গ্রহণ করুক। আমাকে পবিত্র কর, পূর্ণ কর, প্রভু! ২০।১১।৫২

।। প্রত্যুত্তর ।।

ধ্যানলোকে গুরু বলছেন, "বৎস! যদি জগৎ কিরূপে চলছে দেখতে চাও তো জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত নিজের জীবন পর্যালোচনা কর। দেখবে হঠাৎ একদিন এক অজানা থেকে তুমি শিশুর অস্পষ্ট সংস্কার নিয়ে ভূমিষ্ট হয়ে রয়েছ। বাহিরের রূপ রসাদি ক্রমাগত তোমার চিত্তে বিচিত্র সুখদুঃখের আঘাত কোরে তোমার চিত্তকে সদসৎ যা হোক একটা কিছুতে বিকশিত কোরে তুলছে। মৃত্যু-কালেও জীব বোধ করে আমার গড়া এখনও শেষ হয় নি। ঠিক এমনি সকলের বেলাই বুঝবে। তোমার দেহ, চিত্ত, গতি যেমন এক অজানা শক্তি দিয়ে সর্বদা নিয়মিত হচ্ছে, তুমি যেমন তার হাতের ক্রীড়ণক, সব জীবই তেমনি এই নিয়তির করতলস্থ এক একটী ক্রীড়া পুত্তল। কিন্তু সকলের সাক্ষী একমাত্র তোমার অসঙ্গ . চৈতন্য—এইটী ধারণা কর। এই সৃষ্টির প্রহেলিকা থেকে মুক্ত হবে।"
২১।১১।৫২

॥ "কোটী মদন হারে" ॥

গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারে
চন্দ্রকোটী ভানুকোটী কোটি মদন হারে ॥
সুন্দর কপোল লোল পঙ্কজ দল নয়না।
অধর বিম্ব মধুর হাস কুন্দ কলি দশনা ॥
মণি কুণ্ডল মকরাকৃতি ললিত ভৃঙ্গভুজা।
কেশরকো তিলক ভাল নাকে মণি মুক্তা ॥
নবজলধর তড়িতাম্বর বনমালা গলে সোহে।
নটনীল সুরকে প্রভু জগজনমন মোহে ॥—শ্রীসুরদাস ॥

—০—

"জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি অগম্য
পরাৎ পর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর তুমি
মঙ্গলের তুমি মূলাধার ॥……"
—শ্রীশ্রীকথামৃতে গীত গান ॥ ২২।১১।৫২

॥ "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ" ॥

মা ! গুরু ! সর্বস্ব আমার—এইতো এতদিন ধরে শেখালে—গুরু, ইষ্ট, মন্ত্র, আত্মা এক। "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু, মদাত্মাসর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" গুরু সচ্চিদানন্দ-অপার-সাগরে একাকার হয়ে রয়েছেন, আবার জীব মুক্তির জন্য মূর্তিময়ী হয়ে পাশে পাশে ঘুরে বেড়ান। কী অদ্ভুত প্রেম ! এর কাছে মৃত্যু ছায়ার মত মিশে যায়, জীবন হয় চির বর্তমান ! জন্ম-মৃত্যু কি কোরে আমাকে তাঁ থেকে পৃথক করবে, মা ও আমি যে পরস্পরের আত্মা। আমার উপাধির বাধা সরিয়ে ফেল মা, আমি তোমার নামে তোমার পদতরীতে এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, বিরহ, অপ্রিয়সংযোগরূপ তরঙ্গসংকুল অজ্ঞানসমুদ্র পার হয়ে আলোর দেশে কূর্ল পাব। এ প্রলোভনের জঙ্গল পার হতে চলেছি, ভয় কি মা আমার, আমি তো তোমার চোখেচোখে আছি।
২৩।১১।৫২

// অভয় ! অভয় ! //

মাগো ! এ জীবনে তব শিষ্য আত্মায় বিশ্রাম
লভেছে, হয়েছে তার সংসার বিরাম।
জয় মা ! সারদে দেবি ! জয় ! তব জয় !
উপাধির গন্ধ নাই স্বরূপে আমার
দেহেন্দ্রিয়াদি মন পঞ্চভূতের বিকার
আমাতে থাকিবে কেন ? নিরঞ্জন আমি !
নৈরাশ্য থাকিবে কেন ? নিরাশীঃ যে আমি !
কোথা শাস্ত্র ? কোথা বা বিজ্ঞান ? মন নির্বিষয় !
কোথা তৃপ্তি ? কোথা তৃষ্ণা ? চিত্তবৃত্তিলয় ?
জয় মা ! সারদে দেবি ! জয় ! তব জয় !
কোথা বিদ্যা ? কোথাবিদ্যা ? অহম্বা ইদং কোথায় ?
কোথা বন্ধ ? কোথা মোক্ষ ? নির্ধর্মক স্বরূপে আমার ?
প্রারব্ধ বা কিবা তথা, জীবন্মুক্তি হয় বা কোথায ?
কে করে বিদেহ লাভ ? নির্বিশেষ কৈবল্য যথায ?
জয় মা ! সারদে দেবি ! জয় ! তব জয় !
শান্তি মম ধ্বনিয়া ওঠে, অভয় ! অভয় ! ২৪।১১।৫২

// অভয় ! অভয় ! //

মাগো ! বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মতি ছিনু অনুক্ষণ
চিত্তে ছিলো সদা গতিভোগ্যের সন্ধান।
আজি কিন্তু, কদাপি প্রমাদ বশে
শূন্য চিত্তে তাহা উঠে ভাসি—
যথা চমকিত চিত্ত, হেরে ভঙ্গ সুষুপ্তির পরে
ভুলে যাওয়া সুদূরের কল্পকথারাশি।
আজি তাই ভাবি দেবি ! দুঃখ মোর হলো অবসান
আজি বুঝি চাহিলে ফিরে, আমি ভাগ্যবান !

কোথায় কর্তব্যজ্ঞান, কোথা মিত্রজন
কোথায় সংগ্রামদস্যু, শাস্ত্র আলোড়ন
কোথা দৃশ্য শব্দবিদ্ধ সমাধি এখন
কোথায় রহিল পড়ে শ্রবণ মনন।
হৃদিগুহা আলোকিছে, কৃপা দৃষ্টি তব
'আমি ব্রহ্ম' 'তুমি সেই' হলো অনুভব!
জয় মা! সারদে দেবি! জয়! তব জয়!
শান্তিসিন্ধু উথলিছে, 'অভয়! অভয়!' ২৫।১১।৫২

।। "ন প্রবচনেন" ।।

ধ্যানলোকে গুরু বলছেন, "বৎস! অনেকে মনে করে বুঝি তাদের দিব্য-দৃষ্টি খুলেছে। ইভ্ নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ঠিক এমনিই মনে করেছিলেন। ঐ কামরূপ ফলটী খেয়ে আদম ও ইভের অনাদি বাসনা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠলো; তারা উভয়ে শিশুর সরলতা ও পবিত্রতা হারিয়ে ফেল্লে। যারা ঈশ্বরের দুরাবগাহী গম্ভীর শব্দরাশি তাঁর প্রতি প্রেমের আলোক দিয়ে না পাঠ করে, তারা কি কোরে মাত্র প্রবচনের দ্বারা সত্য লাভ করবে। যারা কেবল সেই চরম সত্য যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায়, যাদের প্রার্থনা ও বিশ্বাস ভুল হয়ে গেছে, তারা তো অন্ধ এখনও। একটী শয়তানী প্রলোভনই যথেষ্ট তাদের বুদ্ধির দৃঢ় শৃঙ্খল ছিন্নভিন্ন করতে। কারণ ঈশ্বরানুরাগ ও বিশ্বাসই একমাত্র এ যুদ্ধে জয়ী হয়ে থাকে।" ২৬।১১।৫২

।। "অন্যং বাচং বিমুঞ্চথ" ।।

"মানুষ যা কিছু বৃথা বাক্য-ব্যয় করবে তার জন্য তাদের মহাবিচারের দিন জবাব দিহি হতে হবে।"—ম্যাথু ১২।৩৬॥ হে প্রভু! এই ভিক্ষা দাও যেন বৃথা বাক্য ব্যয় না করি। যদি কারুর সঙ্গে কথা বলতেই হয়, তা হলে যেন আগেই তোমার সঙ্গে সে কথাবার্তা হয়, এই দয়া আমার প্রতি রেখ। সকল সভায় যেন তোমায় আমি দেখি, সকলের সঙ্গে কথা বলবার আগে তার মুখে

যেন তোমার প্রতিবিম্ব পড়ে এবং সেই ভাবে যেন নিজের ও অপরের হিতকরী কথাই বলি। তোমার নির্দেশ স্পর্শ যেন আমার সমস্ত চিন্তা ও কথা স্পর্শ কোরে থাকে।

হে বাক্! কোন স্বর্গীয় কথা বল, অনন্তের গুণ গরীমা ঘোষণা কর; বিরাট কর্ম যাঁর, অনন্ত নাম-মাহাত্ম্য যাঁর, সেই রাজাধিরাজের কথা বল। তাঁর অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা, কামকাঞ্চন ত্যাগ, দীন দুঃখীর প্রতি সহানুভুতি, তাঁর ভক্তের প্রতি প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। ২৭।১১।৫২

।। এক পুরাতন ।।

হে প্রভু! আমাকে তোমার প্রাচীন বাণীতেই স্থির থাকতে দাও। নতুন নতুন ব্যাখ্যা শুনে আর কি করব বল? কেবল তো মন চঞ্চল করা। বরং যাতে তোমাতে ভক্তি বিশ্বাস আসে, জীবনে পবিত্রতা আসে, তারই জন্য যেন চেষ্টা করি। কেবল নতুন নতুন যুক্তি, চিত্র ও মতবাদ শুনে আর সময় নষ্ট করবার ইচ্ছা নেই। প্রাচীন অনাদি সত্যই আমার জীবন আলোকিত করুক—চিত্তবিভ্রম যেন আর না হয়। আমার চিত্ত যেন তোমাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। সত্যিকার বিশ্রাম কোথায় পাওয়া যায়; নব নব মতবাদের পেছুনে ছুটে আর হয়রাণ হব না। যা জানবার তা তুমিই আমায় জানিয়ে দাও প্রভু! আমায় আর অপরের দারস্থ করো না। ২৮।১১।৫২

।। জ্যোতির জ্যোতিঃ ।।

লোকের উপরে লোক, জ্যোতির ঊর্ধ্বে জ্যোতিঃ। কিন্তু প্রত্যেক জ্যোতির কোরকে কোরকে আবার "জ্যোতির জ্যোতিঃ উজ্জ্বল হৃদি কন্দর"। তিনিই আমার বুদ্ধি চিদাভাসের সার বস্তু। তিনিই আমার চিত্ত-গ্রন্থের সকল কাহিনীর পাঠক। তিনি অতি গোপন, অতি বিবিক্ত, অতি গম্ভীর কিন্তু হাস্যময়; তিনি মৌনী কিন্তু সর্বজ্ঞ, তিনি রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দাতীত হয়েও অপরূপ রূপ, "রসো বৈ সঃ", বোধে বোধ স্পর্শ, যশোগন্ধ, অকথিত বাণী। হে মন! তুমি তোমার সর্বস্ব তাঁতে সমর্পণ কর, সর্বোপাধি মুক্ত হয়ে শিশুর

মত হও। তোমার সেবা স্বাভাবিক হোক, তোমার ভালবাসা হৃদয় পূর্ণ করুক। নিস্তব্ধতার মন্দির-গর্ভে আত্মস্বরূপ দর্শন কর, আত্মার বিশুদ্ধ রসে আমি-হারা হয়ে নিমজ্জিত থাক। বল ধন্য গুরু! ধন্য গুরু! তোমার জয় হোক! ২৯।১১।৫২

॥ গুরু গুরু ॥

হৃদয় আমার গুরু গুরু করে—চারিদিকে দেখি শুনি সন্দ্রানন্দ মেঘের গভীর ধ্বনি গুরু, গুরু, গুরু। "গুকারশ্চন্ধকার স্যাৎ রুকারস্তেজ উচ্যতে। অজ্ঞান ধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥" হে গুরু! চারিপাশে যে জ্যোতির্ময়, আলোক সমুদ্র! আমি কোথায়? জন্ম কোথায়? মৃত্যু কোথায়? সুখ কোথায়? দুঃখ কোথায়? মুক্তি কার? বন্ধন কার? সবই যে তুমি, তুমি, তুমি। নাহং নাহং নাহং! তুঁহু তুঁহু তুঁহু!

আবার সেই আমি যে প্রভু—তুমি ও আমি! "হাঁ বৎস! কিন্তু আর বাসনা-মূল ঐন্দ্রিক জগৎ নেই। ও অনেক নীচের কথা—শূকর যেমন কাদা-মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। এখানে কামনার স্পর্শ নেই, ইন্দ্রিয়ের আস্বাদ নেই। দেখ আত্মা সচ্চিদানন্দময়, সাধন, উদ্দেশ্য উপায় একই কেন্দ্রে চিরবর্তমান।" ৩০।১১।৫২

॥ প্রণতি ॥

হে প্রেমিক! কোটী কোটী নমস্কার তোমাকে। কত ভালবেসেছ আমাদের, কত শুভ কামনা নিয়েই না তোমার জগতে আবির্ভাব। সঙ্গে তোমার প্রেমিক সহকারী দল। তাদের নেতাকে তুমি আকর্ষণ করলে দেবলোকেরও পরপারে এক জ্যোতির্ঘন মণ্ডল হতে। হে অরূপ! তুমি নিজে রূপঘন হলে, ডাকলে, "আমি এসেছি তুই আয়।" হে শিশু পরমহংসদ্বয়! তোমাদের নমস্কার। আবার শুনি দক্ষিণেশ্বরের সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার মধ্যে তোমার ব্যাকুল আর্তনাদ, "ওরে, কে কোথায় আছিস আয়, আমি যে আর তোদের ছাড়া থাকতে পারি না।" সে আর্তনাদ ধূমের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে

পাকিয়ে সারা বিশ্বে পড়ল ছড়িয়ে। সমগ্র বিশ্বের গোপন ভক্তেরা যেন কোন অজানা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তোমার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। হে জগদাকর্ষণকারী! রামকৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার! নমস্কার! ১।১২।৫২

॥ দরজায় আঘাত ॥

"দেখ, আমি তোমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে আঘাত করছি। যদি কেউ আমার বাণী শুনে দরজা খোলে, তাহলে আমি তার অন্দরে যাই এবং তার সহিত আমি আহার করি এবং আমার সহিত সেও আহার করে।" —রেভেলেস্‌ন, ৩।২০ ॥

হে প্রভু! কতবার তুমি এসে হৃদয় দুয়ারে আমার আঘাত কর। আমি থাকি ঘুমিয়ে সুখ স্বপ্নে। কতবার তোমার বাণী এসে হৃদয়ে প্রবেশ করে, কিন্তু চিত্ত থাকে বাসনার সহিত খেলায় মত্ত। কতবার স্বপ্নে এসে কথা বল, আমি কিন্তু উঠেই যাই ভুলে। তুমি সর্বক্ষণ বিবেকরূপে সঙ্গে ফের, কে-ই বা তোমার কথা শোনে? তুমি তো আমাদের কষ্ট দিতে আস না, শান্তি ও আনন্দ দিতে আস, কিন্তু ওসব খুঁজি আমরা বহির্জগতে অনিত্যতার মধ্যে। কবে তোমার বাণীর নিকট আমার অজ্ঞান, আমার অহংকার পরাজিত হবে? ২।১২।৫২

॥ "সান্দ্রানন্দ পয়োধ" ॥

মা! এই বিশ্বজগৎ তোমারই শক্তির খেলা। শক্তিই তোমার রূপ। সপ্ত ভুবন, সপ্তসুর, সপ্ত রং সব তোমার শক্তিরূপের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। যা কিছু দেখছি তোমাকেই দেখছি, ইন্দ্রিয় তোমাকে অতিক্রম কোরে যেতে পারে না। তোমার শক্তিরূপের অন্তর্দেশে তোমার সচ্চিদানন্দরূপ চির অচঞ্চল, অখণ্ড, পরম শান্তিময়। সমুদ্রের উপরই যত বীচি তরঙ্গ, ফেন বুদ্‌বুদ্‌—তলদেশ গভীর নিস্তব্ধ অচঞ্চল। তোমার বিশ্বরূপেই যত ঝড় ঝাপ্‌টা, তুমি "ভীষণং ভীষণানাং", কিন্তু তোমার অন্তররূপ নির্বিকল্প—"সান্দ্রানন্দ পয়োধসৌভগতনুম্‌, নির্বাণশান্তিপ্রদম্‌।" তোমার দৈহিকরূপ অতি ভয়ংকর, কিন্তু তোমার আত্মিকরূপ অতীব শুভঙ্কর। মা তুমিই জগতে জয়যুক্ত! ৩।১২।৫২

॥ যাতে আর না আসতে হয় ॥

হে মন! সত্য—সর্বমান রহিত, সত্য—জ্ঞানানন্দ সমুদ্র। সে কোন বন্ধন, কোন বাধা মানে না। সসীম স্থষ্টির গুণাবলী সে নিঃসীম দৈবসমুদ্রে বাঁধের কার্য সিদ্ধ করতে পারে না। তার সকল চেষ্টা তোমাকে একেবারে গ্রাস কোরে ফেলা—তোমার সসীম ব্যক্তিত্বটী গলিয়ে দিয়ে নিঃশেষে একেবারে আত্মস্থ কোরে ফেলা। তাই দিন রাত সে তোমার কৃত্রিম সীমাটীর উপর আছড়ে আছড়ে পোড়ে নিজেকে বিস্তার করছে। জগতের দুঃখ ঠিক বাসনার সমমানে থাকবেই। তাই বলি হে মন! আর অন্ধ বন্ধনে রেথ না, কোন অনিত্যের নিকট আর নতি স্বীকার কোরো না। ব্রহ্মপদ আকাঙ্ক্ষা কর। অনিত্য সম্পদের আর আকাঙ্ক্ষা রেথ না। স্থষ্টির এমন কি সম্পদ আছে, যা দৈবী সম্পদকে অতিক্রম করতে পারে? উলঙ্গ হয়ে এসেছিলে, এবার কিন্তু সত্যিকারের উলঙ্গ হয়ে যেতে হবে, যাতে আর না আসতে হয়। ৪।১২।৫২

॥ অভয়পদ ॥

অভয়ার অভয় পদ কর মন সার
ভব ভয় সব দূরে যাবে রে তোমার ॥
অকর্মজনিত ভয় যদি ভোগাধীন হয়
ভয় হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার ॥
ভ্রান্তিযুক্ত শান্তিহীন
হেলায় হারালে দিন
এখনো কর বিধান মনরে আমার;
আদিভূতা সনাতনী চরণ কররে ধ্যান
না হইও আকিঞ্চন অকিঞ্চনে বদ্ধ আর ॥

—রায় রঘুনাথ দেওয়ান ॥ ৫।১২।৫২

—•—

।। "রাধাকৃষ্ণ এক তনু" ।।

সুন্দর লালা নন্দ দুলালা নাচত শ্রীবৃন্দাবন মে
ভালে চন্দন তিলক মনোহর অলকা শোভে কপোলন মে ॥
শিরে চূড়া নয়ন বিশালা কুন্দ মালা হিয়া পর দোলে।
পহিরণ পীত পটাম্বর বোলে রুণুঝুণু নূপুর চরণ মে ॥
কোই গাওয়ত পঞ্চম তাল, বংশী পুকারো রাধা নাম।
মঙ্গল তাল মৃদঙ্গ রসাল বাজাবত কোই রঙ্গন মে ॥
রাধাকৃষ্ণ এক তনু হোয়ে, নিধুবন মে যো রঙ্গ মচাই।
বিশ্বরূপ যো ভগবান সোহি লীলা করত বৃন্দাবন মে ॥

—বিশ্বরূপ গোস্বামী ॥ ৬।১২।৫২

।। নিগূঢ়া ।।

নীল বরণী নবীনা রমণী নাগিনী জড়িত জটা বিভূষিণী ;
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়ণী নিরখিলাম নিশানাথ নিভাননী ॥
নিরমল নিশাকর কপালিণী নিরুপমা ভালে পঙ্করেখা শ্রেণী,
নৃকর চারু কর সুশোভিণী, লোলরসনা করালবদণী ॥
নিতম্বে বেষ্টিত শার্দ্দুল ছাল, নীল পদ্ম করে করে করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকরে লম্বোদরী লম্বোদর প্রসবিণী ;
নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায় ;
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়, নিত্য সিদ্ধা তারা নগেন্দ্র-নন্দিণী ॥

—মহারাজ শিবচন্দ্র ॥ ৭।১২।৫২

।। ত্রিতাপহারিণী ।।

আহা মরি মরিরে কিরূপ মাধুরী
ও বামা কে আসে হাসিতে হাসিতে ঘন বরণী ॥
বিবসনা নবীনা রমণী এলায়ে পড়েছে বেণী
চরণে নূপুর কটিতে কিঙ্কিনী
আসব আবেশে লোহিত লোচনী।

(বামার) ভালে শিশুশশী সীমন্তে সিন্দুর
পীযূষপূর্ণ পীন পয়োধর
অসি মুণ্ড ধরা বরাভয়া মুণ্ডমালিনী ;
সাধক হৃদয় ভাবেতে ধন্য
নিরুপমা নারী নহে সামান্য
(ওযে) ত্রিতাপহারিণী শিবের কামিনী
বিশ্ব প্রসবিনী ভুবনমোহিনী ॥—সাধক ॥ ৮।১২।৫২

॥ সিংহচারী ॥

সিংহচারী খপথ ধাবে
অসুর সুরগণ গগন ছাবে।
রক্তবীজ মারী কারে রুধির ধারে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র ধরত ধ্যান ভীতা ধরণী কম্পমান
আবে হরি শংখ শান সকল চরণ পাবে ।
ব্রহ্মাহরিহর ধরণী অম্বর
সিদ্ধ কিন্নর সজল জলধর জ্যোতিঃ সঞ্চারে ॥ ৯।১২।৫২

॥ ভৈরব রাগ ॥

পীত জটা শিরে গঙ্গা উমঙ্গত।
ভাল বিশাল শশাঙ্ক বিরাজত ॥
লোচন তিন লসত দুঃখ মোচন
কানন কুণ্ডল আনন শোভিত ॥
অঙ্গে বভূত ধারে অহিভূষণ
শূল কর পর ডমরু বাজত ;
রূপ অনুপ সদাশিব মূরত
ভৈরব রাগ মহাছব ছাজত ॥—শ্রীহরবল্লভ রায় ॥ ১০।১২।৫২

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা ॥

'আমি মার কাছে কেবল প্রেমভক্তি প্রার্থনা করেছিলাম। আমি মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাত জোড় কোরে বল্লুম, "মা এই নাও তোমার অজ্ঞান,

এই নাও তোমার জ্ঞান—আমায় শুদ্ধা-ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি—আমায় শুদ্ধা-ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম—আমায় শুদ্ধা-ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ—আমায় শুদ্ধা-ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য—আমায় শুদ্ধা-ভক্তি দাও। ধর্ম থাকলে অধর্মও থাকবে, জ্ঞান থাকলেই অজ্ঞান থাকবে, ভাল থাকলেই মন্দ থাকবে; যেমন আলো থাকলেই অন্ধকার, এক থাকলেই দুই। শূকর মাংস খেয়ে যদি ভক্তি হয় সেও ভাল, কিন্তু নিরামিষ খেয়ে ভক্তি না হলে আর কি হলো।" ১১।১২।৫২

॥ ধন্য নির্জনতা ॥

হে মন! শান্তি বাস করে নির্জনে। "ধন্য নির্জনতা, একমাত্র ধন্য আশীর্বাদ!" যদি নির্জন চাও, তা হলে ইন্দ্রিয়দের হট্টোগোল নিস্তব্ধ কর। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া ইন্দ্রিয়েরা বশীভূত হবে না। হে মন! তুমি সংসার মরুভূমির পথিক। এখানে দাঁড়িয়ে থেক না, দস্যুরা সব কেড়ে নেবে। শুভ চিন্তা তোমার সহায় হোক। মরীচিকায় ভুলো না, সেখানে পথের সন্ধান পাবে না। চারুতা ও প্রিয়তার মায়া-উদ্যান যেন তোমাকে মোহিত না করে, ওসব রাস্তা ছাড়, স্পষ্ট নির্জন পথ ধর, অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন হও—শীঘ্র শান্তিধামে পৌঁছবে। কোন সাধু কোন বহুর পাল্লায় পড়েন না। তাঁরা বিবিক্ত, একমনে একলা এক পথে চলেন, কারুর দিকে তাকান না। আর একটু চল, সম্মুখে শান্তি ও আনন্দ-সমুদ্র। একেবারে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়। অমর হবে। ১২।১২।৫২

॥ ঈশ্বরের দান ॥

ঈশ্বরই অবতার হয়ে আসেন। এতে যারা বিশ্বাসী তারা অবতারের সঙ্গোপাঙ্গদের ভালবাসেন। কারণ তাঁরা যে আমাদের নিকট ঈশ্বরের দান। আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি, তাঁর বাণী অনুসরণ করবার চেষ্টা করি, সেইজন্য আমরা অবতার পুত্রদের শ্রদ্ধা ভক্তি করি, তাঁরা সর্বদেশে সর্বকালে আবির্ভূত হয়েছেন, জগতের কল্যাণের জন্য কত আত্মবলিদানই না করেছেন, ঈশ্বরের এই দান আমরা মস্তকে ধারণ করি। আমরা তাঁর বাণী হৃদয়ে ধারণ করি, তাঁর বাণী মধুর, সহজ, সরল। কিন্তু বিপথগামীদের পক্ষে তা তিক্ত, জটিল ও

দুর্গম। ঈশ্বরই জগজ্জয় কোরেছেন, সেইজন্য তাঁর কৃপায় আমরাও এই জগৎ হতে মুক্তি লাভ করব। জয় প্রভু! ১৩।১২।৫২

॥ "কাশী কাঞ্চি কেবা চায়" ॥

"গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
জপ যজ্ঞ পূজা হোম আর কিছু না মনে লয়।
মদনের জপ যজ্ঞ ঐ ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়॥"—শ্রীমদন॥

প্রভু বল্লেন, 'আমার সকল সন্ধ্যা ডুবে গেল গায়ত্রীর মাঝে, গায়ত্রীরও আজ বিসর্জন হলো ঐ কালো মায়ের চরণ তলে। হৃষীকেশের এক সাধুর সাধন ছিল, একটা ঝরণা দেখা। বলত, "কী সুন্দর! কী সুন্দর!" ঈশ্বর সাকার না নিরাকার—এ সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে? নির্জনে, হে মন! কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর, "মা দেখা দাও, তুমি কী তা জানিয়ে দাও। তুমি যে অন্তরে বাহিরে মা! ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ।" ১৪।১২।৫২

॥ প্রেমাস্বাদ ॥

প্রভু বলেছেন, 'প্রেমিক প্রেম আস্বাদ করে কত রকমে। সে কখন বলে, "হে সুন্দর! তুমি পদ্ম আমি ভ্রমর।" কখন বলে, "হে সচ্চিদানন্দ সাগর! আমি তোমাতে মীনের মত ভেসে বেড়াই।" কখন বলে, "হে প্রিয়! আমি তোমার নর্তকী।" সে তাঁর সামনে নাচ গান কোরে বেড়ায়। কখন বলে, "বন্ধু! তুমি আমার প্রিয় সখা।" কখন বলে, "হে প্রিয়তম! আমি তোমার সেবিকা সখি।" কখন সে নিজেকে মনে করে কৌশল্যা, যশোদা। ভগবানকে তারা রামলালা, গোপাল রূপে সেবা করে। কখন তারা নিজেকে মনে করে স্ত্রী, শ্রীভগবান তাদের স্বামী, যেমন গোপীরা মনে করত। বলরাম মনে করতেন, "আমি কৃষ্ণের অভিভাবক, বন্ধু, সজ্জা, ছত্র।" ১৫।১২।৫২

॥ "অক্ষর" কোরে দেবেন ॥

হে নূতন ভক্তেরা ! শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরাতন ভক্তদের অনুসরণ কর। নিজে দীন হয়ে অপরের সঙ্গে মেশ। গর্বিতদের সব কাজে ভগবান বাধা দেন, দীনেদের তিনি কৃপা করেন। শ্রীভগবানের শক্তিশালী বাহুর নিকট নিজেকে নত কর, যেন সাক্ষাৎ হলে তিনি তোমাকে আনন্দে স্ফীত করেন। তোমার সমস্ত চিন্তা উদ্বেগ তাঁতে সমর্পণ কর, তিনি তোমার ভার নেবেন। স্থির হয়ে অপেক্ষা কর, কামাদি শত্রুরা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত তোমাদের চার পাশে ঘুরছে, 'কাকে খাবো' বলে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ পালনের জন্য কিছু শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার কর, তিনি তোমাকে পূর্ণ করে দেবেন, সত্যে প্রতিষ্ঠিত কোরবেন এবং "অক্ষর" কোরে দেবেন। ওঁ স্বস্তি ! স্বস্তি ! স্বস্তি ! ১৬।১২।৫২

॥ শিব ॥

ডমরু হর কর বাজে বাজে
ত্রিশূল ধর অঙ্গ ভসম ভূষণ
ব্যালমালা গলে বিরাজে ॥
পঞ্চ বদন পিনাক ধর শিব
বৃষভবাহন ভুত নাথ,
রুণ্ড মুণ্ড গলে বিরাজিত
অজর অমর দিগম্বর রে ॥—শ্রীবিহারীলাল দুবে ॥ ১৭।১২।৫২

॥ শম্ভু ॥

আজু শম্ভো হর নাচত ডমরু করে
বাজাবত গজবদন লম্বোদর মৃদঙ্গ আনন্দ ভরে
পঞ্চবদন অনাদি নাদ আলাপ করে
গাবত সুরগণ সমবেত ভইরী
ব্রজনাথ নিরক্ষ মোহন বিগলিত রূপমে বিরাজে ॥

—শ্রীযদুনাথ ভট্ট ॥ ১৮।১২।৫২

॥ স্বামীর নিভৃত-চিন্তা ॥

যতই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, ততই বিশ্ব ছায়ার ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখছি—এ যে স্বপ্ন। জগৎটা অর্থহীন স্বপ্ন বলেই আজ পর্যন্ত কেউ এর পারমার্থিক মূল্য বের করতে পারলে না। বালকই সাবানের ফেনার গোলক সৃষ্টি কোরে আনন্দ পায়। সব ক্ষণস্থায়ী, সব পরিবর্তনশীল। বুদ্ধিমান তাই সুখদুঃখ ত্যাগ কোরে সাক্ষিস্বরূপ হয়ে যান। যে সমদর্শী সেই যথার্থ স্বর্গ স্পর্শ করেছে। আত্মা সর্বত্র ও বিশুদ্ধ। বাসনা, অজ্ঞান ও অসাম্য হলো বন্ধনের ত্রিত্ব। অনাশীঃ, জ্ঞান এবং ঐক্য হলো মুক্তির ত্রিত্ব। স্বাধীনতাই জগতের উদ্দেশ্য। প্রিয় নয়, অপ্রিয় নয়, সুখ নয়, দুঃখ নয়, মৃত্যু নয়, জীবন নয়, ধর্ম নয়, অধর্ম নয়—সে হচ্ছে নেতি! নেতি! নেতি! শিবঃ কেবলোঽহম্! ১৯।১২।৫২

॥ স্বামীর নিভৃত-চিন্তা ॥

আজ খাওয়া নেই—আছে কিন্তু চিন্তা, কথা ও স্বাধ্যায়। জীবনে এক অপূর্ব গাম্ভীর্য ঘনিয়ে আসছে। রোজ বুঝছি জগতে কর্তব্য কারও কিছু নেই—ভালমন্দ সব প্রকৃতির খেয়াল। আত্মা এক অনাদি অনন্ত বিশ্রাম ও শান্তি। জগৎ জগদম্বার খেলা—ব্যক্তিত্ব কেবল দাবাবড়ে—চালেন তিনি। ধন্য তিনি! ধন্য তিনি! কাম কাঞ্চন যশঃ—এ বন্ধনত্রয়—এই মুহূর্তে আমার নেই। অনেক সময় এটা অনুভব করেছি, আবার এই মুহূর্তে এটা অনুভব করছি। আমি এখন "নিগুর্ণ পথে বিচরণ করছি", এখন ভেদ বুদ্ধি কোথায়? ভাল মন্দ কোথায়? ভ্রান্তি বা অজ্ঞান কোথায়? কার! বিধি নিষেধ কোথায়? কিসের জন্য, কার জন্য সে সব মানতে হবে? ওঁ রামকৃষ্ণ! তিনিই আছেন, আর কিছু নেই। আমার 'আমি' তিনিই। শান্তিঃ! স্বস্তি! ২০।১২।৫২

॥ স্বামীর নিভৃত-চিন্তা ॥

আজ এক অপূর্ব দৃশ্য দেখছি! বিশ্বমনে ধর্মের মদ চুঁইয়ে উঠছে—সব শিক্ষিত মনে তার ক্রিয়া উপস্থিত হয়েছে—এক একটা নেশার জগৎ।—কিন্তু একটা মূল পদার্থকে আশ্রয় কোরে। নানা চিন্তার বুদ্‌বুদ্ উঠছে—নানা

আধ্যাত্মিক জগৎ প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে—কিন্তু উদ্দেশ্য সকলেরই এক—বাহ্য-জগৎ ও আন্তর-মনের মূল ঐক্যের অনুসন্ধান। দৈহিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক—সব জাতির পরিধির উত্তরোত্তর বিবৃদ্ধি—আর সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসছে এক অনাদি ঐক্যের এক জ্যোতির্ময় স্ফোট—ওঁ-কার। কিন্তু তারও পশ্চাতে রয়েছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত এক সর্বোচ্চ দর্শন, অকথিত সচ্চিদানন্দ—অদ্বৈত বেদান্ত। ২১।১২।৫২

।। স্বামীর নিভৃত-চিন্তা ।।

ঈর্ষা করবার জিনিষ না থাকলে কি কেউ ঈর্ষা করে? ঈর্ষা দুর্বলতা থেকে ওঠে—শেষে দল বেঁধে দাবাবার চেষ্টা। অনিষ্ট করবার লোক অক্ষৌহিনী প্রমাণ—বন্ধু মাত্র এক ভগবান। কিছু আছে বলেই তো লোক কেড়ে নিতে চায়। বাধা এলেই তো আত্মা শক্তি প্রক্ষেপ করে। কত প্রশংসা, কত নিন্দা—কোথায় তারা গেল, এলই বা কোথা থেকে? মহাপুরুষ ও কাপুরুষ সকলেই নিজের নিজের কথা বলে চলে গেছেন—তাঁদের নমস্কার করি—সবই যে প্রিয়তমের ছদ্মবেশী খেলা। আর বাক্যবীরদের ভয় করি না, আর যারা কর্মবীর তাঁরা কখনও কারুর অনিষ্টাচরণ করেন না। বাক্যবীররা বকতে থাক্—তারা কখনও ঈশ্বরের ন্যায় সর্বজ্ঞ নয়—লক্ষ অনুমানের একটা হয়ত সত্য হয়। এস আমরা সত্যকে ধরে থাকি। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করুন। ২২।১২।৫২

।। নগ্ন পরমহংস ।।

হে মন! যদি নিজের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ নগ্ন পরমহংসটীকে দেখতে চাও, তা হলে তোমার ঐন্দ্রিক চাদরখানি খুলে ফেল, তারপর বুদ্ধির পোষাকও দূর কোরে ফেলে দিতে হবে। ভাস্কর প্রস্তরের অন্তর্নিহিত নগ্ন সৌন্দর্যটি অনুভব করবার জন্য নিন্ ও হাতুড়ীর সাহায্যে নেতি নেতি করতে করতে প্রস্তরের মিথ্যাবরণগুলি খুলতে থাকে। তার ঐ নিন্ ও হাতুড়ী, তার ঐ নেতি নেতির অক্লান্ত অফুরন্ত পরিশ্রম অবশেষে মুক্ত করে দেয় শৃঙ্খলিত, কারারুদ্ধ অনাদি অনন্ত আন্তর সৌন্দর্যকে। মরমিয়া তান্ত্রিক ডেনিস্ তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন, "সত্য অহম্ নয়, মন নয়, কল্পনা নয়, মত নয়, যুক্তি নয়, ধারণা নয়—সত্য অনভিব্যক্তি ও অভিব্যক্তির বাইরে।" ২৩।১২।৫২

।। অকথিত আনন্দ ।।

মা! কল্পনায় তোমায় বেশ নামরূপের মধ্যে বুঝতে পারি। কিন্তু যখন তুমি সত্যিকার আস, তখন তো তোমার কোন নামরূপ দেখতে পাই না। অকথিত আনন্দে বুদ্ধির আবরণ বস্ত্রও খুলে যায়। বন্ধু! একদিন সে তাঁকে দেখেছিল—মা ও ছেলের কিন্তু বোধ ছিল না। ফিরে বুদ্ধির কাপড়-চোপড় খুঁজতে গেল, কিন্তু খুঁজে যেন আর পায় না। কি করে ফিরবে! হাত পা তো আর কিছুতেই খুঁজে পায় না। এ আনন্দ কী, তা তোমায় কি বলব! যে আনন্দের কল্পনা নিয়ে সংসার হতে মহাপ্রস্থান করেছিল, এ আনন্দ সে সব আনন্দের কালিমাশূন্য। প্লটিনাসের কথা থেকে থেকে মনে পড়তে লাগলো, "এ মিলনের আনন্দ যেমন নিস্তল! কিন্তু এর বিচ্ছেদের দুঃখও তেমনি নিঃসীম!" ২৪।১২।৫২

।। স্বামীর একবার মৃত্যু ভয় ।।

মৃত্যু ভয় বিবেকানন্দেরও একবার ছেলেবেলায় এসেছিল, "ওগো! আমার তুমি একি করলে?" গভীর অন্ধকার—"সে যে কালো হতেও অধিক কালো" —(রামপ্রসাদ)। "তাতে সব ডুবছে, ধীরে মন্থর গতিতে, কিন্তু অতি নিশ্চিত ও অভ্রান্তরূপে—দেশ, কাল, অনুভূতি, বিচিত্র অভিজ্ঞান, সব।" (সাইমণ্ড)। কিন্তু তথাপি সেখানে সে অপরূপ রূপ "যে দেখেছে সেই মজেছে, অন্যরূপ লাগে না ভাল।" (রামপ্রসাদ)। তখন মা বিশুদ্ধা সম্বিৎরূপা, অভেদ্যা কিন্তু সর্বধ্বংসী তীক্ষ্ণ খড়্গের মত অতি নিষ্ঠুরা, আণবিক্ সন্দেহ-গুলোকেও খুঁজে বার কোরে ছেদন করছেন এবং জাগতিক সত্যগুলোকে বুদ্‌বুদের মত ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছেন।—তারপর? আগত নির্বাণের প্রাক্‌ক্ষণ—অহং শিখার শেষ দীপ্তি—তার পরেই "অন্ধকারে অন্ধকার লুক্কাইত", "অস্পন্দিত প্রাণ", "গম্ভীর নির্বাণ", "নিরুপাধিক বেদান্ত", আছে কি নেই এর বাইরে, "ওগো! তুমি আমার একি করলে?" বন্ধু হে! তোমার অকথিত বাণী অনুভূত হলো—'ফিরে এসো' 'ফিরে এসো'।—স্পর্শ জ্ঞান ফিরে এলো—রুদ্ধ প্রাণ গতি ফিরে পেল। হে গুরু! তোমার জয় হোক! জয় হোক! ২৫।১২।৫২

।। অহমিকার দণ্ড ।।

হে মন! তোমাকে তোমার সকল প্রকার ভেদ সৃষ্টিকারী অহমিকার দন্ডটা ত্যাগ করতে হবে—শান্তশিষ্ট যথার্থ সন্ন্যাসীর মত হতে হবে, অর্থাৎ বিবেকের পরিশুদ্ধি তোমার একান্ত দরকার। "তোমার হৃদয়-দরবারে এমন দানছত্র খোল যে যার প্রেমের প্রবাহে তুমি সর্ব অনিত্যহারা হয়ে যাও", (এডওয়ার্ড ডি. রে), আমার আমিত্ব বলে যেন আর কিছু না থাকে, আপনার কথা আর যেন একেবারেই মনে না পড়ে। এ কলেবর পরিত্যাগ, এ দধিচীর অস্থিদান মাংসাসুরের হাত হতে অব্যাহতির জন্য। প্রথম সাধারণ জাগতিক ভাষা ভোল; দ্বিতীয় যে "ব্যক্তি"কে নিয়ে তীর্থযাত্রা করেছিলে তাকে "জ্ঞান-সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও"; তৃতীয় ইন্দ্রিয়াতীত গভীরতম দেশে তরঙ্গায়িত বহুকে ত্যাগ কোরে এক নিঃস্যন্দ নিস্পন্দ মৌনকে আশ্রয় কর। এই হলো শ্রেষ্ঠ সম্পদ—এ ত্যাগে দারিদ্র্য নেই। ২৬।১২।৫২

।। বীণাবাদ্য বিনোদিনী ।।

"ভুবন ভুলাইলি মা ভব মোহিনী
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য বিনোদিনী॥
শরীর শারীর যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে
গুণ ভেদে মহামন্ত্রে তিনগ্রাম সঞ্চারিণী॥
আধার ভৈরবাকার ষড় দলে শ্রীরাগ আর
মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃদ্ প্রকাশিনী॥
বিশুদ্ধ হিন্দোল সুরে কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে
তাল মান লয় সুরে ত্রিসপ্ত সুর ভেদিনী॥
মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ কর অনায়াসে
তত্ত্বলয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী॥
শ্রীনন্দকুমার কয় তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়
তব তত্ত্বগুণত্রয় কাকীমুখ আচ্ছাদিনী॥

—মহারাজ নন্দকুমার রায়॥ ২৭।১২।৫২

॥ "হৃদি বৃন্দাবনে" ॥

হৃদি বৃন্দাবনে, আমার কারণে, সর্বনাশা বাঁশী
বেজেছে এবার।
(তারে) জানি না তবু যে, ভুলি লোক লাজে
পাগলিনী ধাই অভিসারে তার ॥
প্রমত্ত উজান মন যমুনায় লুকাইয়া বাঁশী
ডাকে 'সখি আয়';
প্রাণের কালিয়া বোলে দে কোথায়
বড় যে সাধেরি শ্যামলী রাধার ॥
প্রতি অঙ্গ মোর কানু ক্ষুধাতুর
সে কানু কেনলো দূর এতদূর ?
প্রেমের রাজা সে তো ছিল না নিঠুর,
কোটী কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার।
যত ছিল রাস, যত বৃন্দাবন, যতলো কদম্ব, নিকুঞ্জ কানন
(সেথা) জনমে জনমে মোর কানুধন
প্রেম ভিখারিণী আমি রাধা তার ॥

—শ্রীদাশরথি রায় ॥ ২৮।১২।৫২

॥ কবির ধ্যান ॥

ধূলিকে আজ ধূলি বলে কেউ অবজ্ঞা করতে পারে না, তৃণকে তৃণজ্ঞান করা মূর্খতা। কারও ইচ্ছা এই সামান্য ধূলিকে পৃথিবী হতে মুছে ফেলতে পারে না, কারণ তার অস্তিত্ব ঈশ্বরের ইচ্ছায়। ইচ্ছা করলেই তুমি ঐ ক্ষুদ্র তৃণটীকে অবমানিত করতে পার না, কারণ তার ঐ শ্যামলিমায় ঈশ্বরেরই আনন্দ মূর্তিমান। তাঁরই আনন্দ প্রবাহ ভূলোকে দ্যুলোকে উচ্ছ্বসিত। অতি দূর দূরান্তে তাঁরই আনন্দ নবজাগরণের দেবদূতরূপে সকলের সুপ্তির মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাঁকে সশ্রদ্ধ হৃদয়ে অন্তরে গ্রহণ করো। সেই আনন্দ স্পর্শে আপনাকে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত করে দাও। ২৯।১২।৫২

।। কবির ধ্যান ।।

আজ এই সুপ্রভাতের শুভ মুহূর্তে অর্দ্ধ জগতের নব জাগ্রত সংসারে কর্ম শক্তির কী তরঙ্গই না লীলায়িত হয়ে উঠেছে। কি বিপুল প্রয়াস, কি বিপুল উদ্‌যোগ—পুঞ্জ পুঞ্জ সুখ দুঃখ বিপৎ সম্পৎ, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দূরে দূরান্তরে হিল্লোলিত। এ সবই তাঁর লীলা, এ সবই তাঁর আনন্দ। পৃথিবীর সমস্ত কলরবের মধ্যে আত্মাকে সংযত কোরে অধ্যাত্মকর্ণে ঐ সংগীত শ্রবণ কর। তারপর সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কর—"সুখে দুঃখে তাঁরই আনন্দ, লাভে ক্ষতিতে তাঁরই আনন্দ, জন্মে মরণে তাঁরই আনন্দ।" সেই "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।"

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥"

—ইতি ঐতরেয় উপনিষৎ ॥ ৩০।১২।৫২

।। ব্রহ্ম বিহার ।।

ভগবান শ্রীবুদ্ধ বলছেন,—

"মাতা যথা নিজ পুত্রকে নিজ আয়ুর দ্বারা রক্ষা করেন, সেইরূপ সবভূতের প্রতি অপরিমাণ দয়া ভাব রাখবে।

"ঊর্দ্ধ অধঃ চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি অসম্বাধিত, হিংসাশূন্য, শত্রুতা-শূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব রাখবে।

"কি দাঁড়িয়ে, কি চল্‌তে, ফিরতে, বসতে, শুতে—নিদ্রা পর্যন্ত ওই মৈত্রী ভাবে অবস্থান করবে।

"এতং সতিং অধিট্‌ঠেয়ং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু ॥"—এইরূপ অধিষ্ঠানকে ব্রহ্মবিহার বলে। ৩১।১২।৫২

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

হরি ওঁ তৎসৎ ॥
